স্মৃতি-কথা

শ্রীতারকনাথ সাধু

শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত এম-এ, এল-এল-বি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা ৪৩নং পার্ব্বতী ঘোষ লেন,
এ্যালান প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসোমেন্দ্র নাথ সাধু কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ভদ্রে,

তুমি ও আমি দু'জনে মিলিয়া ঘর বাঁধিলাম। সে ঘর অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমাকে একা ফেলিয়া তুমি চলিয়া গেলে। তোমার আরদ্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করিতেছি। অনেক অসুবিধা, কষ্ট, নির্য্যাতন—নিরুপায়। এরূপ অবস্থায় সাহিত্য-সেবা। তাহার একটি ফুল,—এই পুস্তকখানি,—তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

দেবীপক্ষ
দ্বিতীয়া তিথি,
আশ্বিন, ১৩৪০

তোমার স্বামী

উপসংহার

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু সি, আই. ই মহোদয় ব্যবহারজীবি হিসাবে যে দীর্ঘ বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহার স্মৃতি-কথায় প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা পুণর্মুদ্রন করিলাম। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি হিসাবে ফৌজদারী আদালতের মামলার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র এবং অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ সাময়িক সুবিধা লাভ করিলেও শেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অন্যায় লোভ, অন্যায় হিংসা, মানসিক নীচতা সর্ব্ব সময়ে পরিহার্য্য ও নিন্দনীয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ সাল।

ইতি—

শ্রীজলধিনাথ সাধু

স্মৃতি-কথা

প্রথম কথা

আমার বাল্যাবস্থা

গন্ধবণিক্-কুলে আমার জন্ম। যে কুলে সতী বেহুলা, সতী খুল্লনা, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর জন্মিয়াছিলেন, সেই কুলেই আমার জন্ম। আমাদের জাতি ব্যবসাদারের জাতি ; চাকৃরীর বড় ধার ধারে না। চাকৃরী না করিয়া আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অবশ্য আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তাহা না ঘটিলেও আমার সহধর্ম্মিণী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা পরেবলিব।

দশ পুরুষ পূর্ব্বে, আমার পূর্ব্বপুরুষরা হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে. দাবড়া গোপাল নগরে বাস করিতেন। তথায় এখনও যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চাননের ঘট ও নারায়ণ বিগ্রহ আছেন, তিনি গোপাল-মূর্ত্তি নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দিরের সম্মুখে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বেণেপুকুর আজও বর্ত্তমান। আমার

পূর্ব্বপুরুষগণ অপরাপর গন্ধবণিকের ন্যায় কর্ম্মশীল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তথায় বাস করিয়া ধর্ম্মাচরণে ও ক্রিয়াকলাপাদি সুসম্পন্ন করিতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তখন তাঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পুরাতন দলিলপত্র দেখিয়া জানা যায় যে, আমার পিতামহের পিতামহ স্বর্গীয় কালীপ্রসাদ সাধু মহাশয়, চোরবাগানস্থ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ এক অপ্রশস্ত রাস্তায়, যাহাকে এখন সকলে ভুবন ব্যানার্জ্জি লেন বলিয়া জানেন, সেই স্থানে বত্রিশ টাকা কাঠা হিসাবে, ১২০৪ সালে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন; —বাটী অপেক্ষা পূজার দালান বড় করিয়া প্রস্তুত করেন এবং সেইখানেই দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে থাকেন।

পাণ্ডুয়া ছাড়িবার বিশেষ কারণ যে ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন হওয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা ব্যবসাদারের জাতি, ব্যবসাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমার পূর্ব্বপুরুষরা কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসা করিতে লাগিলেন। বড় বাজার সাজুস্বাপীরের দরগার উত্তর ধারে সুনপটিতে আমার পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবসার স্থান ছিল। সেই স্থানে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কবিরাজী, হকিমী, ডাক্তারীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় গাছ-গাছড়ার ব্যবসা ছিল। পাঠকপাঠিকাগণ এই ব্যবসার কথায় যেন মনে করবেন না যে, ইহা বাজারের সামান্য বেদের গাছপালার দোকান। এই দোকানে পনর ষোল জন লোক খাটিত। দূর দেশ হইতে মাল আনান হইত, আর সেই সব মাল বেচিয়া দশ গুণ লাভ হইত। এই সব মালকে সাধারণতঃ 'লটকান্' বলা হইত। এক এক রকম দ্রব্যের আট রকম দশ রকম নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। ভারতবর্ষের

বাহিরের লোকরা বিভিন্ন নামে এই সমস্ত দ্রব্যকে অভিহিত করিত। কাজেই এইরূপ ব্যবসায়ে একটু বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এইরূপ ব্যবসায়ে কিরূপ আয় ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার পূজ্যপাদ পিতামহ ও পিতা দুই জনেই পাল্কী করিয়া দোকানে যাইতেন—পাল্কী করিয়া দোকান হইতে আসিতেন। উত্তম উত্তম ঘরওয়ানের ঘরে তাঁহারা নিজ নিজ পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং অনেক নিকট ও দূর আত্মীয়গণকে অকাতরে ভরণ-পোষণ করিতেন।

আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় রমানাথ সাধু মহাশয় চুঁচুড়ানিবাসী স্বর্গীয় পীতাম্বর সাহা মহাশয়ের চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন। পুত্র হিসাবে আমি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বটে, কিন্তু আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন। আমার পিতার অপর দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যদুনাথ সাধু মহাশয়ের এক মাত্র কন্যা ছিল। আমার খুল্লতাত অল্প বয়সেই বিধবা পত্নী রাখিয়া মারা যান; তাঁহার পুত্র-কন্যা কিছুই ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যখন আমি জন্মগ্রহণ করিলাম, তখন আমাদের বংশে অন্য পুত্র সন্তান ছিল না। কাজেই আমি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। আমাদের সংসারে বিধবা জ্যাঠাই মাতা, বিধবা খুড়ী মাতা ও এক বিধবা পিসীমাতা ছিলেন। অপুত্রক স্নেহময়ী পিসীমা বাটীতে থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্রের যে কি আদর, তাহা যে ভ্রাতুষ্পুত্র জীবনে উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমার পিসীমাতা পিতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। আমার পিতা ঠাকুর তাঁহার নিকট ভয়ে ত্রস্ত, কাহারও ঘাড়ে একটার অধিক মাথা ছিল না যে, পিসীমার কথার উপর কথা কহেন। তিনি এই সংসারে একচ্ছত্র রাজা ছিলেন।

পাঠকগণ রাজা বলার দরুণ ভুল ধরিবেন না। রাণী বলিলে বুঝায় তাঁহার উপর রাজা আছেন, কিন্তু রাজা শব্দ ব্যবহার করায় বুঝায় যে, তাঁহার উপর কেহই ছিলেন না। তিনি ব্যতীত আমার আরও দুই জন পিসীমাতা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামি-গৃহেই বাস করিতেন।

মোটের উপর আমাদের সংসার সুখের সংসারই ছিল। খুব ধনী না হইলেও সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল না। পটল যখন বাজারে প্রথম আসিত, তখন আমাদের সংসারেই আসিত। কাঁচা আম, সজিনার ডাঁটা—এই সব জিনিস প্রথম উৎপন্ন হইলে আমাদের সংসারে প্রথম আসিত। কই মাছ আনিয়া তাহার ডিম কাটিয়া লইয়া সংসারে ব্যবহৃত হইত। আর মাছগুলি চাকর-বাকরকেই দেওয়া হইত। আমার ঠাকুরদাদার 'ব্যাঙ্ক ব্যালান্স' খুব বেশী না থাকিলেও অর্থের জন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। হিন্দুর ঘরে বারো মাসে যে তেরো পার্ব্বণ, তাহা আমাদের বাটীতে হইত। তবে কেবল মাত্র দুইটী ক্ষীরের গুজিয়া রূপার থালায় দিয়া, পূজা-পার্ব্বণে অর্থসংগ্রহের উপায়বিধান হইত না। প্রণামী আদায় করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হইত না। আমাদের পল্লীতেই এক ঘর বিশেষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহারা প্রণামী হিসাবে লোকদিগকে খাতির যত্ন করিতেন। দু আনা প্রণামী দিলে এক খানা গজা ; চার আনা দিলে একখানা গজা, একটা মিঠাই ; আট আনা দিলে দু খানা লুচি, একটি মিষ্টি, একটু তরকারী ; আর এক টাকা দিলে তাহাকে পেট পুরিয়া লুচি, মিষ্টি, দধি ইত্যাদি খাওয়ান হইত। কাযেই আহ্বান করিয়া নিমন্ত্রিতগণকে একস্থানে বসান হইত না। কতকগুলিকে বাহিরের ঘরে রোয়াকে, আর অন্যগুলিকে ভিতরের ঘরে বসান হইত। ঐ

পল্লীর একটি লোক – যাহার অবস্থা এক সময় খুব ভাল ছিল, পরে তাঁহা অবস্থান্তর ঘটে—সেই ভদ্রলোক প্রতিবাসী হিসাবে উক্ত গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া একটি দু আনি প্রণামী দিয়া বসিয়াছিলেন। যাঁহারা এখন ঐ বাটীর কর্ত্তা, তিনি এক সময়ে তাঁহাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে একখানা গজা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি গজাখানা খাইয়া এক গেলাস জল খাইয়া, সেইখানেই বসিয়াছিলেন, চলিয়া যান নাই। অবশ্য এখানে বলা অবশ্যক, যখন তিনি দুয়ানিটি প্রণামী দেন ও তাঁহাকে একখানি গজা দেওয়া হয়, তখন বাড়ীর বাবুরা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। খানিক ক্ষণ পরে বাড়ীর মেজবাবু সেইখানে আসিলেন। এমন সময়ে কোন এক অবস্থাপন্ন লোক ঠাকুরের সামনে ঝনাৎ করিয়া একটি টাকা প্রণামী ফেলিয়া দিলেন। 'আসুন আসুন' বলিয়া তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর দিকে লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় গরীব শ্রীনাথের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। শ্রীনাথ বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার করিলেন। এক সময়ে যখন শ্রীনাথের সময় ভাল ছিল, মেজবাবুর সহিত ঠাট্টা, তামাসা চলিত। শ্রীনাথ তখন বলিলেন, 'আজ্ঞে মেজবাবু, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি, কি প্রণামী দিলে আপনাদের অন্দর মহল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।'

মেজবাবু মহা অপ্রস্তুতে পড়িলেন। বিশেষ শ্রীনাথ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সম্মুখেই এই সব কথা বলিলেন, কাজেই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টায় শ্রীনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এস শ্রীনাথ এস, এখনও তুমি প্রসাদগ্রহণ কর নাই!' নিমন্ত্রিত আগন্তককে সম্বোধন করিয়া মেজবাবু বলিলন, 'মাধব বাবু, শ্রীনাথ বাবু আমাদের খুব রসিক মজলিসি লোক। উনি ঠাট্টা না করিয়া কোনও সময়েই

জলগ্রহণ করেন না।' এই বলিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া, মাধব বাবু ও শ্রীনাথ বাবুর দুইখানি পাত করিয়া দিলেন। মাধব বাবু বলিতে লাগিলেন, 'মেজবাবু, আমি কিছুই খাইতে পারিব না।' আর শ্রীনাথ বাবুর সে দিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাঁহাকে জোর করিতে হইল না। বসিবার পরক্ষণেই আহার আরম্ভ করিলেন, ভদ্রতার খাতিরে মাধব বাবুকে আধঘণ্টা কাল সেই স্থানেই বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

আমার জন্মদিনে আত্মীয়-স্বজনগণের মহা আনন্দ। কারণ, পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলকেই আমার পিতা শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাই দলে দলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিগণ আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সকলেই প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, 'আমি যেন দীর্ঘজীবন লাভ করি ও সুপুত্র হই।' কায়মনোবাক্যে প্রার্থনার একটি ফল আছে। কাযেই পাড়াপ্রতিবাসী, আত্মীয়-স্বজনের প্রার্থনায় আমি শ্রীভগবানের করুণার অধিকারী হইয়াছি।

আমার অন্নপ্রাশনের সময়ও খুব ধুম হইয়াছিল। বাটিতে কয়দিন ধরিয়া ভূরি ভোজন হইয়াছিল এবং দূরদেশস্থ আত্মীয়রা আমাদের বাটিতে আসিয়াছিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষরা যে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সে বিষয়ে একটি ঘটনা বলিলেই বুঝা যাইবে। আমার যখন দুই বৎসর বয়স, তখন আমি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই। আশ্বিন মাস, বাটিতে মহামায়ার আগমন হইয়াছে, অনেক দূর আত্মীয় আত্মীয়ারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। মহা অষ্টমীর দিনে অতি প্রত্যুষে আমার পীড়ার অবস্থা এইরূপ হইল যে, আমার বাঁচিবার আশা একরূপ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দূরদেশস্থ আত্মীয়রা বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। নিকটস্থ আত্মীয়েরা তখনও

আসিয়া পৌঁছান নাই। তাঁহারা সকালে আসেন, সন্ধ্যায় যান। আমার মা ও পিসীমা দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নহে যে, আমন্ত্রিত মহিলাদের আমাদের বাটীতে আনা হয় ; কিন্তু আমার পিতাঠাকুর বলিলেন, 'মহামায়া আমার বাটীতে আসিয়াছেন। নিমন্ত্রিত মহামায়াদের বাটীতে আনিতে পশ্চাৎপদ হইবার কোনও কারণ নাই। যদি মহামায়াদের সম্মুখে আমার পুত্রের অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে নাচার। আমার বিশ্বাস, এতগুলি মহামায়ার পদরজঃ ও আশীর্ব্বাদে আমার পুত্র নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবে।' দালানস্থিত মহামায়া পিতার আবেগপূর্ণ নিবেদন ও প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন ; আমি সে যাত্রা সারিয়া উঠিলাম।

কৌলিক প্রথানুসারে পাঁচ বৎসর বয়সে আমার হাতে খড়ি হইল। সে সময় খড়ি আজকালকার সফেদ ফুলখড়ির ন্যায় নহে, সেগুলি কতকটা পাথরের। মাতা, খুড়ীমা, জ্যাঠাইমা, পিসীমা সকলেই গলবস্ত্র হইয়া সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ছেলে উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, 'হবে গো হবে গো, তোমাদের ধর্ম্মের সংসার, এখানে সরস্বতী-লক্ষ্মী দুই জনকেই আসিতে হইবে।' আমার পিসী-মা (তাঁহার নাম ছিল বিমলা) বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুর! আমাদের বংশে তর্কালঙ্কার বিদ্যালঙ্কারের প্রয়োজন নাই। যেমন তেমন করিয়া কার্য্য চালাইতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলেও ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হওয়া যায়।'

এক বৎসর পরে, মা নিজেই আমাকে লইয়া পড়াইতে বসিতেন, চাপ পড়িলেই আমি কাঁদিতাম, অমনি ভয়ত্রাতা পিসীমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং মাকে শাসন করিতেন। পিসীমা

বলিতেন, 'পাঁচটা নয়, দশটা নয়, বংশে একটি মাত্র পুত্র, এই অল্প বয়সে লেখাপড়ার জন্য এত জুলুম কেন? সে ত' আর আফিসে চাকুরী করিতে যাইবে না। পৈতৃক ব্যবসা করিয়া খাইবে।' পিসীমা চলিয়া গেলে মা খুব আস্তে আস্তে বলিতেন, 'এইরূপ আদর দিলে ছেলের লেখা পড়া হবে কি ক'রে?' তাঁহার সাহসে কুলাইত না যে, পিসীমার সম্মুখে এ কথা বলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাড়ার ধনী ভদ্রলোকগণের বাটীতে প্রায়ই একটি করিয়া পাঠশালা ছিল। পাঠশালার জন্য গুরুমহাশয়কে ভাড়া দিতে হইত না, বরং বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে তাঁহার কিছু প্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় বিপিনবিহারী মল্লিকের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধানাথ মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেণ্ট্রাল এভিনিউতে যে বাটী আছে, তাহার দক্ষিণে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে এখন যেখানে এক মারোয়াড়ীর বাটী;—সেই খানে পূর্ব্বে পালেদের বাটী ছিল। ঐ বাটীতেই আমাদের পাঠশালা ছিল। স্বর্গীয় রমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় আমাদের গুরুমহাশয় ছিলেন। যখন আমার বয়স ৭ বৎসর তখন তাল পাতা বগলে করিয়া সেই পাঠশালায় যাইতাম। পাঠশালা কামাই করিলেই গুরুমহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণী গুরুমহাশয় পাঠশালায় ধরিয়া লইবার জন্য ছেলেদের বাটীতে আসিতেন। তারিণী গুরুমহাশয় মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন আমাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। আমি উত্ত্যক্ত, গুরুমহাশয় ত' বটেই। এক দিন আমি পাঠশালায় যাই নাই, অছিলার ত' কখনও অভাব হয় না, কোনও একটা হইলেই হইল। সে দিন পেট কামড়ান অছিলা ছিল। অছিলা ত' করিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ত' যায় না। বাড়ীর সম্মুখে খেলা করিতেছি, এমন সময় তারিণী মহাশয়ের আগমন!

সুস্থ মানুষ বাঘ দেখলে যেমন আঁতকাইয়া উঠে, আমারও সেই অবস্থা হইল! আমি দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতরে পলাইলাম; পিসীমার কোলে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

সে স্থান হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করে, এমন পুরুষ কি নারী দেখি নাই। তারিণী গুরুমহাশয়ও খুব চটিয়াছেন। আমাকে বাড়ীর ভিতরে পলাইতে দেখিয়া পিছু পিছু ধাওয়া করিলেন। বাড়ীর ভিতর আসিয়া চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন। তখন পিসীমা বাহিরে আসিলেন। তিনি আমাকে রান্নাঘরে রাখিয়া আসিয়া, তারিণী গুরুমহাশয়কে একটা দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, ওর আজ পেট কামড়াইতেছে ও আজ পাঠশালায় যাইবে না।" তারিণী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'এই মাসের মধ্যে আমি উহাকে সাত দিন লইয়া গিয়াছি। এইরূপ করিলে কি আর লেখা পড়া হয়। অত আদর দিবেন না, আমি আজ উহাকে পাঠশালায় লইয়া যাইব।'

পিসীমা। ছোট ছেলে, তার উপর এত জুলুম করিবার দরকার নাই। তুমি ঠাকুর আজ যাও, কাল আমি সকালে ওকে হরিয়াকে দিয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিব। হরিয়া আমাদের বাড়ীর চাকর।

তারিণী গুরুমহাশয়। পিসীমা, এরূপ আস্কারা দিলে ছেলের লেখাপড়া কিরূপে হইবে?—পরে সংসার চালাইবেই বা কি করিয়া?

পিসীমা। ওরে আমার সংসার চালানেওলা! গন্ধবণিকের ছেলে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলে কিছুই আসিয়া যাইবে না। চাঁদ সদাগর ধনপতি সদাগর এঁরা কত লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন? তাঁরা ভাল করিয়া ব্যবসা শিখিয়াছিলেন, তাই তাঁদের এত নাম। বেণের ছেলের তাহাই যথেষ্ট।

গুরুমহাশয়। তবু পিসীমা, লেখা পড়া ত কিছু শিখা চাই।

পিসীমা। কেন বাপু?—রাগ করো না;—তুমি তোমার দাদা দুইজনেই ত' লেখা পড়া শিখিয়াছ? তোমরা ত' গুরুমহাশয়ের বংশ, তবু পেটের দায়ে ছেলে ঠেঙ্গিয়ে খাও। আর আমরা ব্যবসাদারের জাত; ব্যবসা করিয়া দোল দুর্গোৎসব করিতেছি, পাল্কী চাপিতেছি। যাও ঠাকুর যাও, বেশী গোলমাল করিও না। আমার তরকারী বোধ হয় চুঁইয়া যাইতেছে। এই বলিয়া তিনি রান্নাঘরে চলিয়া আসিলেন।

আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন স্নেহময়ী পিসীমা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হইতে এক আত্মীয়কে ডাকাইয়া তাঁহার মুখাগ্নি করান হইল। খুব ধুমধামে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধ, শান্তি সবই তাঁহার দেওর করিলেন বটে, কিন্তু খরচা আমার বাবার।

পিসীমার মৃত্যুর পর আমি নর্ম্ম্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। চিৎপুর রোডে ঘড়ীওয়ালার বাড়ীর সম্মুখে যে বাটী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল শীল মহাশয়ের বাড়ী, তাহাতেই তখন নর্ম্ম্যাল স্কুল ছিল। সেইখানে লক্ষ্মীনারায়ণ মাষ্টারের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। বাড়ীর সিঁড়ি হইতে প্রথম ঘরে ঢুকিয়া, একটি গ্যালারি ছিল। সেই গ্যালারিতে অনেক বালক বসিয়া, স্কুলের প্রারম্ভে গান গাইত। লক্ষ্মীনারায়ণ মাষ্টারের হাতে ভাঙ্গা শ্লেটের একটি ফ্রেম থাকিত, তাই দিয়া তিনি তালে তালে "একে একে দিবারাতি" গান শিখাইতেন। অন্যমনস্ক হইলেই তিনি সেই শ্লেটের ফ্রেম দ্বারা সজোরে এক ঘা বসাইয়া দিতেন। যাহার মাথায় বসাইতেন, অমনি তাহার মুখ হইতে এক নূতন সুর বাহির হইত। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকো নিবাসী প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর অন্যতম বংশধর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক, উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মাষ্টার মহাশয়ের "একে একে দিবারাতির" ছাত্র। আমরা দুইজনেই শ্লেটের

ফ্রেমের আঘাত খাইয়াছি। এখন হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিতেছি, কিন্তু যে সময় আঘাত খাইয়াছি, বলা বাহুল্য তখন মনের অবস্থা অন্যরূপ ছিল।

আমি দশম বৎসরে পদার্পণ করিলে, আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব রমানাথ সাধু মহাশয় রোগগ্রস্ত হইলেন। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, সেই সময়ে আমার পিতাঠাকুরের ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র কেহই ছিলেন না; অবস্থাপন্না ভগিনীও ছিলেন না। কাযেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবাকে তাঁহার শ্বশুরবাটীতে যাইতে হইল। আমার মাতামহ স্বর্গীয় পীতাম্বর সাহা মহাশয় চুঁচুড়া চৌমাথামধ্যে বিশেষ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার জীবিত অবস্থায় পল্লীস্থ কোনও দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা আদালতে যাইত না। চৌমাথা নিবাসী স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যাহার নামে মাধব বাবুর বাজার ছিল, তিনি ও মাতামহ মহাশয় দুইজনে মিলিয়া সালিস হইয়া, সব মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিতেন। পূর্ব্বে যেখানে মাধব বাবুর বাজার ছিল, এখন সেখানে আশুতোষ বিল্ডিং নামে ইউনিভারসিটি বিল্ডিং হইয়াছে।

আমার পিতাঠাকুর খুব ভাল এস্রাজ বাজাইতে জানিতেন। তিনি যখন আমার মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় আমার মাতুলের বৈঠকখানায় একটি মজলিসে, অনেক ভদ্রলোকের অনুরোধে তিনি শেষবার এস্রাজ বাজাইয়াছিলেন। তাহার অল্পদিন পরেই তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ চুঁচুড়াতেই অকালে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা অনাথ হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের ব্যবসা খুব ভাল ব্যবসা ছিল। উপার্জ্জন খুব হইত। কিন্তু পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছিল। সেই সময় তিনি তাঁহার ব্যবসাস্থানে যাইতে

পারিতেন না। আমাদের দোকানে অনেকগুলি আত্মীয় অনাত্মীয় কর্ম্মচারিরূপে কাজ করিতেন। অবস্থা বিশেষে আত্মীয়রা অনাত্মীয় অপেক্ষাও নির্ম্মম হয়েন। ফলে এই দু'বৎসরের মধ্যে সকল কর্ম্মচারী মিলিয়া, আমাদের ব্যবসাটি নষ্ট করে। মহাজনরা আসিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, 'ব্যবসা চলুক, তাঁহারা তাঁহাদের পাওনা টাকার জন্য সময় দিবেন। ব্যবসা আমার নামেই চলিবে।' পিতাঠাকুর কতকটা নিমরাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতাঠাকুরাণী একদম রাজী হইলেন না। দশ বছরের ছেলের উপর এই গুরুভার দিতে তিনি কোনমতেই সম্মত হইলেন না। কাজেই আদালতের সাহায্যে আমাদের ব্যবসা উঠিয়া গেল। আমার দশ বৎসর হইতে বার বৎসরের ভিতর অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল। সে সকল সবিস্তারে বর্ণনা করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পিতৃহীন, ধনহীন বালকের অভিভাবক একমাত্র ভগবান্ ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। নিজের খুড়া, জ্যাঠা ছিলেন না—মামারা ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত ও উপায়ক্ষম ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা করিবার কোন রূপ প্রয়োজন দেখি না। সামাজিক ও সাংসারিক হিসাবে যাঁহাদিগকে আত্মীয় বলা যায়, তাঁহারা নিজ নিজ বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত যে, পিতৃহীন ধনহীন নাবালকের ভাবনা ভাবিবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন। বরং যেটুকু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা ঐ নাবালককে পেষণ করিয়া পাওয়া যায়, সেইটা পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। চন্দননগর নিবাসী একটি লোকের হিন্দু স্কুল নামে চুঁচড়া ব্যারাকে একটি বিদ্যালয় ছিল। বারো বৎসর বয়সে আমি সেই বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইলাম। সেইখানে ছয়মাস থাকিবার পর, তিনজন শিক্ষিত

মাতুল ও মাতামহীর জীবিতাবস্থায় আমাদিগকে মাতুলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় ভুবন ব্যানার্জ্জি লেনের বাড়তে ফিরিয়া আসিতে হইল। মাতুলদের অন্যায় ব্যবহারই আমাদের মাতুল-আশ্রয় ত্যাগ করিবার প্রধান কারণ। মাতামহীর হাতে যে টাকা ছিল, তাহা কনিষ্ঠ মাতুলের হাতে গিয়া পড়িল। কাযেই, যখন মাতুলরা আমাদের ভরণ-পোষনের ভার লইতে অক্ষম হইলেন, তখন আমাদের মাতামহীর হাতে টাকা নাই, তিনি বাধ্য হইয়া আমাদের কলিকাতায় আসিবার ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা খুব ভালই করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। পিতৃহীন, অর্থহীন অনাথ বালককে পরিত্যক্ত ফুটবলের ন্যায়, যাহার ইচ্ছা 'কিক্' করুক ; এখন তাহার অধিকারী কেহই নাই, বারণ করিবারও কেহ নাই।

কলিকাতায় আসিয়া আমি প্রথমে মতিলাল শীল মহাশয়ের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। এক বৎসর সেখানে থাকিয়া সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। তাহার পর 'জেনারেল্ এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউসানে' গিয়া ভর্ত্তি হইলাম। এই 'ইন্‌ষ্টিটিউসানের' এখন আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই—'স্কটিস্ চার্চ্চের' সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। যে বিল্ডিংএ এখন 'স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ' আছে, সেইটিই পুর্ব্বে 'জেনারল্ এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউসানের' বাড়ী ছিল। সেখান হইতে আমি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, প্রথম শ্রেণীতে এণ্ট্রাস পাশ করি ; গভর্ণমেণ্ট স্কলারসিপও পাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পাশ করি। যখন আমি এফ, এ পড়িতেছি, সেই সময় সহসা আমার জ্যাঠাইমা আমাদের নামে হাইকোর্টে নালিস রুজু করিয়া দিলেন। কলিকাতায় ৩৪ নম্বর ভুবন ব্যানার্জ্জি লেনে আমাদের পৈতৃক বাটী আর ৬০ নম্বর

মনোহর দাস ষ্ট্রীটে আমাদের দোকান ঘর—যাহা আমরা ভাড়া দিয়াছিলাম—তাহার অংশের দাবী করিয়া, জ্যাঠাইমা নালিস করিলেন। আমার পিতামহের জীবদ্দশায় জ্যাঠা মহাশয় মারা যান, কাযেই হিন্দু আইন মতে জ্যাঠইমার খোরাকী মাত্র পাইবার অধিকার ছিল, বিষয়ের অংশ পাইবার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু তিনি বিষয়ের অংশ পাইবার জন্য হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। অজুহাত, আমার জ্যাঠা মহাশয় আমার পিতামহের মৃত্যুর পর মারা গিয়াছেন।

এই আমাদের যৎসামান্য পৈতৃক সম্পত্তি। তাহা হইতে যদি কিছু চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড় অন্যায় হয়, সেই জন্য আমাকে জবাব দিতে হইল। স্বর্গীয় আমীর আলি তখন ব্যারিষ্টারী করেন, তখনও জজ হন নাই। এখন যিনি জজ আমীর আলি, পূর্ব্বোক্ত আমীর আলি ইঁহারই পিতা। আমার স্কলারসিপের টাকা হইতে তাঁহার ফি দিতে হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে এটর্ণী আপিসে ঘুরিয়া, পড়া-শুনার বিশেষ ক্ষতি হইত। যখন 'ফার্ষ্ট আর্টস্' পাশ করিলাম, তখন আমার টাকার বিশেষ অভাব। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম্য স্কুল শিক্ষকের কাজ জোগাড় করিলাম। মাসিক বেতন ২৮৲ টাকা। ইহাই সই করিতে হইবে, কিন্তু পাইব ২২৲ টাকা। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিলে মাসে ৪৲ টাকা রেল ভাড়া যাইবে। অতএব থাকিবে ১৮৲ টাকা। মনে করিলাম, তাহাই করা যাক্। এই ভাবিয়া স্কুল কমিটীর কাছে যাইলাম। তাঁহারা আমাকে মনোনীত করিলেন। আমি শিক্ষকের কার্য্য সানন্দে গ্রহণ করিলাম। 'জেনারল এসেমব্লী ইন্‌সটিটিউসানের' গণিত অধ্যাপক স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইতে

যাইলাম। আমি তাহাকে বলিলাম যে, 'আমি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছি।' তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, 'তারক! তোমার উদ্দেশ্যটা কি?' আমি উত্তরে বলিলাম, 'বেঁচে থাকা আর সুবিধা হইলে বি এ পাশ করা।' তিনি মাথা হেলাইয়া বলিলেন, 'উঁহু, প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতা, করিয়া বেঁচে থাকাও অসুবিধা, আর বি এ পাশ করা ত' অসুবিধা বটেই।' আমি বলিলাম, 'কেন স্যার, আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত চার ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হইবে। বাকী সব সময়ই আমার নিজের থাকিবে। ট্রেণে যখন যাইব তখনও পড়িব, ট্রেণে আসিবার সময়ও পড়িব। তবে কেন বি এ পাশ করিতে পারিব না?' তিনি বলিলেন, 'বাপ্ হে, প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করা যে কি কাজ, তাহা তোমার জানা নাই। চার ঘণ্টা পড়াবার কথা ভুলিয়া যাও। ছ'ঘণ্টা ত' পড়াতে হইবেই, তা ছাড়া সময় থাকিলে সেক্রেটারীর ছেলে লইতে হইবে। যদি বি এ পাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এ কার্য্য কখনও করিও না।' এই কথা শুনিয়া আমি ত' একেবারে হতভম্ব।

স্কুল কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট ট্রেণ ভাড়া করিয়া যাইলাম এবং বলিলাম, 'আমার এ চাকুরী করিবার সুবিধা হইবে না। অতএব আমার সার্টিফিকেটগুলি ফেরত দিন।' তিনি ত' আমার কথা শুনিয়া একেবারে চটিয়া লাল। অনেক সময় মনে হয়, মানুষের রাগটা গরীব ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদের উপরেই খর বেগে পড়ে। তিনি বলিলেন, 'আমরা মিটিং বসাইয়া তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, এখন তুমি না লইলে ফের মিটিং বসাইতে হইবে। আমরা তাহা করিতে রাজী নই।' ফলে আমার চাকুরী করা হইল না, লাভের মধ্যে সার্টিফিকেট-গুলি হস্তান্তরিত হইয়া গেল।

অতঃপর উক্ত কলেজ হইতে বি এ পাশ করিবার পরও 'এডুকেসান

গেজেট' দেখিয়া 'সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টার অফ্ স্কুলের' নামে প্রায় দুই শত দরখাস্ত করিয়াছিলাম। চাকুরী ত' হইলই না ষ্ট্যাম্পগুলিও বাজেয়াপ্ত হইল। চাকুরী হওয়া দূরের কথা কোন পত্রের একটা জবাবও পাইলাম না। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, 'জেনারল এসেম্‌ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসানের' প্রিন্সিপাল ছিলেন রেভারেণ্ড এ, বি, ওয়ান। তাঁহাকে আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। চাকুরী করা যে সুবিধার কাজ নয়, এ কথা প্রায়ই তাঁহার সহিত হইত। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি ত' চাকুরী পছন্দ কর না। যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমি তাহা হইলে একটি চাকুরী জোগাড় করিয়া দি।' সেই সময়ে একাউন্‌টেণ্ট জেনারল আফিসে তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি একখানি চিঠি দিয়া আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন আমি বি এ পাশ করিয়াছি। চিঠিখানি পাইয়া তিনি আমাকে ৬০৲—৮৫৲ বেতনের একটি চাকুরী দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আমাদের প্রতিবাসী ও শুভানুধ্যায়ী স্বর্গীয় গোবিনলাল রায় মহাশয় একাউন্‌টেণ্ট জেনারলের আফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি আমায় বলিয়া দিলেন যে, যদি ৮৫৲—১২৫৲এর গ্রেডে একটি চাকুরী পাও, তাহা হইলে গ্রহণ করিবে। নচেৎ ঐ ৬০৲—৮৫৲ গ্রেড পার হইতে প্রায় ৭।৮ বছর লাগিয়া যাইবে। কাজেই ভবিষ্যতের আশা বিশেষ নাই। সেইজন্য আমি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলকে বলিলাম যে, আমি ৮৫৲—১২৫৲ পাইলে গ্রহণ করিব, নতুবা নয়। তিনি বলিলেন, এরূপ চাকুরীর সুবিধা নাই; সুবিধা হইলে আমাকে জানাইবেন। বলা বাহুল্য, আমি আর খবর পাই নাই, আমার চাকুরী করা আর হইল না।

যত দিন 'জনারেল এসেম্‌ব্লী ইন্‌স্‌টিটিউসানের' স্কুল বিভাগে ছিলাম,

বাইবেলের সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া, প্রত্যেক মাসেই 'স্কলারসিপ' পাইতাম, আর কলেজে পড়িবার সময় জোড়াসাঁকো লাইব্রেরীতে এসিস্‌টেণ্ট লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিয়া কিছু কিছু উপায় করিতাম। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমি বি-এ পাশ করি। তখন প্রাইভেট টিউটারের কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমি বি-এল পাশ করি।

১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে 'এ্যাপিলেট সাইডে' উকিল অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'আর্টিকেল ক্লার্ক' ছিলাম। অমরেন্দ্র বাবু দৈর্ঘ্যে সাত ফুট ও প্রস্থে মাপসই সাইজ ছিলেন। লোক তাহাকে 'ম্যান মাউন্‌টেন্‌' বলিত। বি-এল পাশ করিবার পর সমস্যা উঠিল, কোথায় ওকালতি করিব। হাইকোর্টে 'এনরোল হইতে গেলে ৫০০৲ টাকার প্রয়োজন। তখন সে টাকা আমার ছিল না, কারণ, মামলা-মোকদ্দমায় অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কাজেই হাইকোর্টে 'এনরোল' হইবার সুবিধা আমার হইল না। স্বর্গীয় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুধু উকিল ছিলেন না, কলিকাতা সহরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ও ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে একই ব্যক্তি—যাঁহারা ওকালতি করিতে পারিতেন, এবং অনারারী হাকিমি করিতে পারিতেন, অমরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কাজেই অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, আমি পুলিশ কোর্টে ওকালতি করিব বলিয়া মনস্থ করিলাম। কিন্তু মনস্থ ত' করিলাম, 'এনরোলমেণ্ট ফী' পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে একশত টাকার প্রয়োজন। সে টাকাও যে আমার নাই। অতএব কি ব্যবস্থা করা যায়? আমার মধ্যম মাতুল রায় সাহেব ব্রজনাথ সাহা সিভিল সার্জ্জেন

ছিলেন। আমার পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে বি-এল পাশ করা পর্য্যন্ত আমাকে কোনও সাহায্য করিবার সুবিধা তাঁহার ঘটে নাই। আমি মনে করিলাম, হয় ত' এখন তাঁহাকে লিখিলে তিনি সানন্দে আমাকে সাহায্য করিবেন। এই ভাবিয়া, নিজের মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। নিজের মনের সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ, আমি অত্যন্ত অভিমানী। আমি তাঁহার নিকট টাকার দানরূপে চাহি নাই, হাওলাত বলিয়া চাহিতেছি ;—ছ'মাসের মধ্যে দিব লিখিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে চিঠির জবাব আসিল, তাঁহার টাকার সুবিধা নাই, এজন্য তিনি আমাকে টাকা ধার দিতে পারিবেন না।

কি করা যায়, এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার খুল্লতাতের বন্ধু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভগবতী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে পৌত্রের ন্যায় দেখিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ভায়া! তোমার মুখ এমন শুক্‌না দেখিতেছি কেন? বি-এল পাশ করিয়াছ, উকিল হইতে যাইতেছ, এখন তোমার মন প্রফুল্ল হওয়া দরকার। সদাই প্রফুল্ল থাকিবে।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আমতা আমতা করিতে লাগিলাম। কিছু সময় জবাব দিলাম না। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করায়, আমি বলিলাম, "দাদা! আমি নিকট-আত্মীয়দের ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিলাম।" তিনি সকল কথা বলিবার জন্য আমাকে আরও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমিও মনের আবেগে তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ভায়া, মানুষ কি আর এক রকম হয়, রকমারি মানুষ,

তাহার জন্য ভাবনা কি? অভাবেই মনুষ্যকে মানুষ করে। অর্থ-কৃচ্ছ্রতাই মানুষকে অগ্নিমুক্ত সোণার ন্যায় খাঁটি করিয়া প্রস্তুত করে। এমন একটা দিন আসবে, যখন তোমার মাতুল ভাবিবে, ইহাকে আমি কেন সাহায্য করি নাই। ইহার প্রতি কর্ত্তব্যের কেন অবহেলা করিয়াছিলাম।"

আমি তখন ভুবন ব্যানার্জ্জি লেনে থাকিতাম। বামুন দাদা—ভগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় পীতাম্বর সেনের লেনে থাকিতেন। তিনি বাড়ী যাইবার সময় আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমাকে পোঁছিয়া দিয়া আইস।" তিনি বৃদ্ধ মানুষ, পাকা আমটির ন্যায় তাঁহার বর্ণ। তাঁহার এইরূপ মিষ্ট কথায় আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। উপরের দোতলায় লইয়া গিয়া লোহার সিন্দুকের ডালা খুলিয়া আমাকে বলিলেন, "ভায়া হে! তোমার 'কিন্তু' হইবার কোনও কারণ নাই। তুমি দান লইতেছ না, আমার নিকট হইতে ধার লইতেছ। অতএব যতগুলি টাকার প্রায়োজন, তুলিয়া লও। ছয় মাসের মধ্যে আমাকে শোধ দিও।" আমি তাঁহার এই অযাচিত করুণায় বিমুগ্ধ হইলাম এবং তাঁহার লোহার সিন্দুক হইতে একশত টাকা তুলিয়া লইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, ছয় মাসের মধ্যেই আমি সেই টাকা পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলাম। আমাকে এই টাকা ধার দিয়া তাঁহার টাকা ও আমার সহিত তাঁহার আত্মীয়তা দুইটির কোনটি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অনেক সময় আত্মীয়ের অপেক্ষা অনাত্মীয়ের নিকট মানুষ অনেকরূপে ঋণী হয়।

দ্বিতীয় কথা

পেশার সাধনা

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে আমি ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকিলও ছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। যখন আমি তাঁহার কাছে শিক্ষানবিশ কেরাণী (Article Clerk) ছিলাম, তখন হইতেই তাঁহার সহিত কলিকাতার পুলিস আদালাতে যাতায়াত করিতাম। তিনি যখন ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিচার করিতেন, তখন আদালত-গৃহে বসিয়া তাঁহার ও উকিলদের কার্য-প্রণালী দেখিতাম। কাজেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমি ওকালতি আরম্ভ করিলাম, তখন আদালতের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি একেবারে নূতন নহি। দুই বৎসর শিক্ষানবিশি করিয়া কতকটা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সে সময়ে কলকাতার পুলিশ-আদালত লালবাজরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন যেটি পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান হইয়াছে, লালবাজারের পূর্ব্বস্থিত, সেই বাটীতে আদালতের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখন Municipal Court টাউনহলে বসে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মিউনিসিপালটীর মামলাগুলি লালবাজারে অবৈতনিক হাকিমদিগের নিকট শুনানী হইত। ফৌজদারী আদালতের কলিকাতায় দুটি ভাগ ছিল;—উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ। লালবাজার, বৌবাজার রাস্তাকে মধ্যস্থল ধরিয়া সহরের উত্তর ভাগটি Northern

Division ও দক্ষিণ ভাগটি Southern Division Court ছিল। দক্ষিণ অংশের জন্য একজন ইংরাজ হাকিম বসিতেন, উত্তর অংশের জন্য একজন দেশী হাকিম বসিতেন।

সে সময়ে অনেক ভাল ভাল অবৈতনিক হাকিম ছিলেন। সে শ্রেণীর অবৈতনিক হাকিম এখন অনেক কম। বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী একমাত্র সেই শ্রেণীর হাকিম। বিচার-পদ্ধতিতে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ লোক অতি কম। সে সময়ে মিউনিসিপাল আইন ব্যতিক্রমের অভিযোগগুলির বিচার অবৈতনিক বিচারকদের কোর্টে হওয়ায়, নূতন উকিলদের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল। সাধারণে ফৌজদারী ব্যাপারে, অভিজ্ঞ উকিল ব্যতীত ফৌজদারী মামলায় নিযুক্ত করে না। কিন্তু মিউনিসিপাল মামলাগুলি অতি সামান্য সামান্য, সেই কারণে নূতন উকিলদের ওকালতি করিবার সুবিধা হইত। দোকান-সমূহের পর্দ্দা রাস্তার উপর ফেলা ইত্যাদি অভিযোগের ছোট ছোট মামলা মিউনিসিপাল কোর্টে অনেক হইত। আমি প্রথম তিন দিন কোন মামলা পাই নাই। চতুর্থ দিবসে ৪টি পর্দ্দা ফেলার মামলা পাইয়াছিলাম। প্রত্যেক মামলায় ফি ১৲ টাকা হিসাবে, চারটিতে ৪৲ টাকা পাইলাম। মিউনিসিপাল মামলা করিতে একজন করিয়া অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটকে আহ্বান করা হইত, তিনি না আসিলে অপর একজনকে ডাকিয়া আনা হইত। আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন অপূর্ব্বকুমার গাঙ্গুলীর বসিবার কথা। তিনি সে দিন আসিলেন না দেখিয়া, আমি বেঞ্চ কোর্টের প্রধান কেরাণী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বসুকে বলিয়া, আমার শিক্ষাগুরু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হাকিমরূপে বসাইবার চেষ্টা করিলাম। অমরেন্দ্র

বাবু একটি মামলায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি হাকিম হইয়া বসিলেন। আমার ৪টি মামলায় জয় হইল, ফলে মিউনিসিপাল কোর্টে আমার নাম বাহির হইল।

কোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক, পেস্কার প্রভৃতির সহিত আমার জানা-শুনা ছিল; সকলকেই আমার অপেক্ষা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ধরিয়া লইয়া, তাঁহাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতাম, কাজেই সকলেই আমার উপর খুসী ছিলেন। আদালতের পেয়াদা-চাপরাসীরাও বলিতে লাগিল, একজন নূতন উকিল আসিয়াছেন, তিনি খুব তেজী, আমাদের কোর্টের মামলা খুব ভাল বোঝেন। বুঝি আর নাই বুঝি, কেহই আমার নিন্দাবাদ করিত না, সকলেই অল্পবিস্তর সুখ্যাতি করিত। ফলে দুটি একটি করিয়া মোকর্দ্দমা প্রত্যহই পাইতাম। মিউনিসিপাল কোর্ট সপ্তাহে তিন দিন বসিত; সেই তিন দিন আমিও কিছু কিছু পাইতাম। প্রথম এক বৎসরের মধ্যে, আমি কোন ফৌজদারী মামলাই পাই নাই। যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা মিউনিসিপাল কোর্টেরই মামলা। তাহাতেই আমার একরকম চলিয়া যাইত। মিউনিসিপালটির তরফ হইতে মিউনিসিপাল কোর্টের জন্য একজন উকিল নিযুক্ত ছিলেন; তিনি—৺কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। সে সময়ে উত্তর বিভাগীয় আদালত-গুলিতে তাঁহার বিশেষ পসার ছিল। মিউনিসিপালটির তরফ হইতে তিনি একটি ঘর পাইয়াছিলেন। উহা আদালতগৃহের প্রথমেই অবস্থিত।

দিন কতক তাঁহার নিকট কার্য্য-বিষয়ে শিক্ষানবিশি করিতে লাগিলাম। মিউনিসিপালটির কর্ম্মচারীরা সেই ঘরেই বসিতেন। কানাই বাবুর Junior হিসাবে আমিও তাঁহার ঘরে বসিতাম। ফলে মিউনিসিপালটির কর্ম্মচারীদিগের সহিত বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মাইতে

লাগিল। কানাই বাবুর নিকট হইতে একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম। সেটি নূতন উকিলদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আজকাল দেখা যায় যে, নূতন উকিলরা সকাল করিয়া আদালতে আসেন বটে, কিন্তু নিজের হাতের কাজ হইয়া গেলে বা আদালত উঠিয়া গেলে আদালতগৃহ ত্যাগ করেন। কানাই বাবু আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, "দেখ তারক, অন্ততঃ ৫॥০টার ভিতর আদালতগৃহ ত্যাগ করিবে না. কাজ থাকুক বা নাই থাকুক। সে সময়ে অনেক লোক আদালতে আসে, কাহাকেও দেখিলেই তাহার সহিত পরামর্শ করে এবং সময়ে সময়ে নিযুক্তও করে। বড় উকিল হইলে কিম্বা বড় কৌন্সুলী হইলে তোমায় আদালতে না পাইলে মক্কেল তোমার বাড়ী যাইবে; কিন্তু সাধারণতঃ যাহারা একজন উকিল পাইলেই খুসী হইয়া যায়, তাহারা উকিল খুঁজিতে আদালতেই আসে। কাজেই আদালতে ছুটীর পরেও থাকা বিশেষ প্রয়োজন।"

কিছুদিন পরেই এই বাক্যের সার্থকতা আমি বুঝিয়াছিলাম। একদিন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে, আদালতে বসিয়া আছি, এমন সময় দুইটি মুসলমান ভদ্রলোক হন্তদন্ত হইয়া, আদালতগৃহে আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "মশাই, আপনি কি একজন উকিল?" আমি বলিলাম—হাঁ। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদের দোকানে পুলিস তল্লাসী করিতেছে, আমাকে তাঁহাদের সহিত যাইতে হইবে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের সহিত যাইলাম। সিন্দুরিয়াপটির নিকট তাঁহাদের লুঙ্গির দোকান। সেই দোকান তল্লাসী হইতেছিল। অন্য একজন লোক তাহার হাতী-মার্কা লুঙ্গি জাল করিয়াছে, এই অভিযোগে পুলিস-আদালতে নালিস রুজু করিয়াছিল। সেই কারণে পুলিস আসিয়া Search Warrantএর

বলে তল্লাস করিতেছিল। তল্লাসীর সময় আমি উপস্থিত রহিলাম এবং তল্লাসী শেষ হইলে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে Cranenburgh সাহেবের বাটী যাইলাম। তাঁহারা তাঁহাকে সমস্ত মামলা বুঝাইয়া দিয়া নিযুক্ত করিলেন এবং আমিও যে এই মামলায় থাকিব, তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। Cranenburgh সাহেব আমাকে মামলার বিস্তৃত বিবরণী লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি তার পরদিন মক্কেলদিরেগ সাহায্যে মামলার বিস্তৃত বিবরণী লিখিয়া Cranenburgh সাহেবকে দিলাম। তিনি তাহা দেখিয়া সুখী হইলেন; এবং Trade mark আইনের Case Law আমাকে লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি প্রাণপণে খাটিয়া সেইটি লিখিলাম। উহা দিবার পর আমি বুঝিলাম, Cranenburgh সাহেবের চিত্ত আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "Young man, Very good."

ফুরাণ না করিয়াও সেই মামলায় অনেকগুলি টাকা পাইলাম এবং Trade mark Case সম্বন্ধে অনেকটা শিক্ষাও হইল।

Cranenburgh সাহেবের তখন বিশেষ পশার ছিল। বৌ ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড এক বাড়ীও করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, পৃথিবীর অন্যান্য নশ্বর সৃষ্টির ন্যায় সে বাটী আর Cranenburgh সাহের বা তাঁহার কোন বংশধরের নাই। সে বাটী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, ফৌজদারী আদালতের আইন-ব্যবসায়ীরা অভিশপ্ত শ্রেণীর লোক। মিষ্টার সি, এন, ম্যানুয়েল একজন এটর্ণী, এই পুলিস-আদালতে একদিন তাঁহার একচেটিয়া পশার ছিল; তিনি ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে 'হোমল্যাণ্ডস্' নামে একটি বাটী প্রস্তুত করেন, সে বাটী তাঁহার কিম্বা তাঁহার বংশধরের নাই। হাতীবাগানে কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাঁহার বা তাঁহার বংশধরের অধিকার নাই। পুলিসে

চাকরী করিয়া যাঁহারা গণ্যমান্য বা অর্থশালী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধররা অনেক সময়েই নির্ধন।

যাহা হউক, চার বৎসর পেশার পর আমি সি. এন, ম্যানুয়েল সাহেবের সহিত Junior রূপে একটি মোকর্দ্দমা পাইলাম। সেই মোকর্দ্দমায় বহু পরিশ্রম করিয়া, অনেক Note লিখিয়া দিয়াছিলাম। সেই Noteগুলি পাইয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন, আর সেই দিন হইতেই তাঁহার অধিকাংশ মামলাতেই আমাকে Junior লইতে লাগিলেন। সেই সময়ে Manual সাহেবের উকিল হিসাবে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর লোকই অবস্থায় কুলাইলে তাঁহাকেই উকিল নিযুক্ত করিত। তাঁহার একটি এটর্ণী আপিস ছিল, সে আপিসে ধন্নুলাল আগারওয়ালা নামে একজন বখরাদার ছিলেন। ম্যানুয়েল সাহেবের Case প্রস্তুত করিবার সময় ডিনারের পর; রাত্রি সাড়ে নয়টায় মক্কেলরা সেই সময় তাঁহার বাড়ী যাইত, রাত্রি একটা দেড়টা পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে তিন চার জন মক্কেলের Instruction লইয়া আমি রাত্রি একটা, দেড়টা বা দু'টার সময় বাড়ী ফিরিতাম।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। পরিশ্রমের কি মুল্য পান, সে দিকে দৃক্পাত করিবেন না, পেশার খাতিরে প্রত্যেক মামলার বিষয়ে এরূপভাবে কার্য্য করিবেন যে, সেই মামলাটির উপরেই আপনার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। দুটাকা পাইলেও একটি মামলার জন্য এরূপ পরিশ্রম করিবেন, যেন ২০০৲ বা ২০০০৲ টাকা পাইয়াছেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, প্রথম নাম বাহির করিবার জন্য—শিক্ষার সময় অগাধ ও অবাধ পরিশ্রমই একমাত্র সহায়। আমি এই ভাবেই কার্য্য

করিয়াছি এবং জীবনের কোন সময়েই তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয় নাই।

ম্যানুয়েল সাহেবের সঙ্গে কার্য্য করিবার সময় বুঝিতে পারিলাম— তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি ক্রমে কার্য্যদক্ষ হইতেছি, তিনিও সেই সময়ে আমার ঘাড়ে বেশী কার্য্য চাপাইতে লাগিলেন। প্রথম দুই বৎসর পরে বুঝিতে পারিলাম যে, প্রয়োজন হইলেই তিনি আমার ঘাড়ে কার্য্য চাপাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত একসঙ্গে মক্কেলের নিকট হইতে মামলা বুঝিয়া লইলাম, তখন কিছুই বলিলেন না, তার পরদিন আদালতে আসিয়াই বলিলেন, "তারক, আমি হাওড়ায় যাইতেছি কিংবা শিয়ালদহে যাইতেছি বা আলিপুরে যাইতেছি, তুমি মোকর্দ্দমাগুলি দেখিবে।" হরি হরি! অপর পক্ষে যতই যোগ্যতর লোক থাকুন না কেন, আমার হাতে মামলা দিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আমার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু সেই বিশ্বাসের উপযোগী হইবার জন্য আমাকে কত পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি যেন সহসা আমার হাত-পা বাঁধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেন, আমাকে সাঁতরাইয়া উঠিতে হইত। ইহার ফলে কিছুদিন করে আমি Fire proof, Water proof হইয়া উঠিলাম। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যেই থাকুন না কেন, সে দিকে একবারেই লক্ষ্য করিতাম না। এই সময়ের একটি ঘটনা বলিতেছি।

একজন ভদ্রসন্তান অভিযুক্ত, তিনি তাঁহার আত্মীয়কে মারিয়া হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। মামলা প্রমাণ হইলে জেল হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থায় যেদিন অপর পক্ষের সাক্ষীদের জেরা হইবে, সেই দিন ম্যানুয়েল সাহেব সহসা শ্রীরামপুর কোর্টে চলিয়া গেলেন। যে

সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অনেকগুলি উপযুক্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ; রামবাগানের মিষ্টার ও, সি, দত্ত অন্যতম হাকিম ছিলেন। ইনি মিষ্টার জে, সি, দত্ত এটর্ণীর পিতা। তিনি কলিকাতার মিউনিসিপালটির কলেক্টর ছিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার অগাধ অধিকার,—হাকিমি করিবার মত যথেষ্ট আইন-জ্ঞান ছিল। ১২টা বাজিল, মামলার ডাক হইল। ম্যানুয়েল সাহেব চলিয়া গিয়াছেন, আমি আদালতে উপস্থিত হইলাম। মিষ্টার ও, সি, দত্ত আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার আর একটী মামলা আছে ; সেইটি তিনি প্রথম লইবেন। সেই মামলা শেষ হইবার পূর্ব্বে ম্যানুয়েল সাহেব যদি আসিয়া পড়েন, ভালই। যদি না আসিয়া পড়েন, আমাকে জেরা করিতে হইবে। সেই সময় হইতেই আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে Ever ready বলিয়া নাম দিয়াছিলেন,—আমি সব সময়েই প্রস্তুত। একটার সময় মামলার ডাক হইল, আমি জেরা আরম্ভ করিলাম। বেলা ৪টা আন্দাজ ডাক্তার ও দুটি সাক্ষীর জেরা শেষ করিয়াছি এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ম্যানুয়েল সাহেব আদলতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত। হাকিম দত্ত মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "your Honour, আমি পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত।"

মিষ্টার দত্ত বলিলেন, "মিষ্টার ম্যানুয়েল, তোমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তোমার অনুপস্থিতিতে মিঃ সাধু যে ভাবে জেরা করিয়াছেন, তুমি উপস্থিত থাকিলে ইহা অপেক্ষা ভাল জেরা সম্ভব হইত না।"

এই উত্তর পাইয়া ম্যানুয়েল সাহেব আমার প্রতি বিশেষ খুসী

হইলেন কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; তবে জবাবটি এরূপ ভাবে না দিলেও চলিতে পারিত।

ইহার আরও দুই বৎসর পর একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে আমার বিশেষ সুবিধা হয়। এলিস্ সাহেব নামে একজন পুলিস-কর্ম্মচারী কলিকাতা গোয়েন্দাবিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সেই পদটি বর্ত্তমান ডিটেক্‌টিভ বিভাগের ডেপুটী কমিশনারের সমান। তিনি সরকারী একটি মামলা লইয়া আদালতে অসিয়াছিলেন। সেই মামলায় তিনি ফরিয়াদীস্থানীয়, আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। মামলাটি চীফ-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হইতেছিল। আমি মামলাটিতে জয়ী হইলাম। আসামী খালাস পাইল। মামলাটি শেষ হইয়া যাইলে, মিষ্টার এলিস্ আদালতের বাহিরে আসিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, "youngman, I congratulate you"। আমিও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

সেই সময়ে মিষ্টার জে, টি, হিউম সরকারী উকিল ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আইনবিশারদ, হাইকোর্টের মাননীয় উডরফ সাহেবের তিনি মাতুল। সে সময়ে সলিসিটার স্যাণ্ডারসন কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ফৌজদারী দুই রকম মামলারই ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহাদের সহিত সরকারের মাসিক ৪০০০৲ ঠিকা বন্দোবস্ত ছিল। ইহা হইতে তাঁহারা হিউম সাহেবকে মাসিক বৃত্তি দিতেন। হিউম সাহেব পুলিস-আদালতের ফৌজদারী মামলা করিতেন আর যখন সেসন কোর্ট চলিত, তখন তিনি সরকারী কৌন্সিলীকে সাহায্য করিবার জন্য হাইকোর্টে যাইতেন। সেই সময় স্যাণ্ডারসন কোম্পানী জরুরী মামলাগুলির জন্য ম্যানুয়েল

সাহেবকে নিযুক্ত করিতেন। ম্যান্থয়েল সাহেব আসামীর পক্ষ-সমর্থনকারী হইলে, স্যাণ্ডারসন কোম্পানী তাঁহাদের আপিস হইতে কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেন;—কখন কখন কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে নিযুক্ত করিতেন।

সেই সময় একদিন একটি ঘটনা ঘটিল, হিউম সাহেব সেসন কোর্টে আছেন, ম্যান্থয়েল সাহেব ও কানাইবাবু দুইজনেই আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, কাজেই সরকারী তরফ্ হইতে মামলা চালাইবার উকিল কেহই ছিলেন না। এলিস্ সাহেব আমাকে পুলিস-অফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; বলিলেন, "Youngman, I am giving you a chance for your life. এই সরকারী মামলাটিতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতে চাই। কমিশনার সাহেবকে বলিয়া আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। এ মামলায় অপর পক্ষ খুব ধনী ও খুব ক্ষমতাশালী। আমি চাই, তুমি এই মামলায় তোমার দক্ষতা ও যোগ্যতা দেখাইবে।" মামলাটিতে প্রথম তদারক হয় হাওড়া পুলিসের দ্বারা। কাজেই কলকাতার পুলিসের যে ইনেস্পেক্টার এই মামলার ভার পাইয়াছিল, সে সব ঘটনার ওয়াকিবহাল ছিল না। আমি নিজে ইনেস্পেক্টারকে সঙ্গে লইয়া হাওড়ার থানায় যাইলাম। সেখানকার সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া লইলাম। মামলাটি দশ বারো দিন চলিল। পরে আমি জয়ী হইলাম। তাহার পর হইতে এলিস্ সাহেবের কথামত স্যাণ্ডারসন কোম্পানী হিউম সাহেবের সেসন মামলার সময়ে পুলিস-আদালতে অনুপস্থিতকালে, আমাকেই সরকারী মামলায় নিযুক্ত করিতেন। খরচ কম হইত; আমার কার্য্যে ক্রমে সকলে খুসী হইতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে আমি সরকারী কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

তৃতীয় কথা

উন্নতির পথে

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, সরকারী উকিল ও তাঁহার সহযোগিগণকে লইয়া Public prosecutorএর স্বতন্ত্র আফিস হয়। সে আফিস খাস সরকারী। হিউম সাহেব স্যাণ্ডারসন কোম্পানীর বেতনপ্রাপ্ত উকিল না হইয়া, খাস সরকারের বেতনভোগী হইলেন। Public prosecutorএর আফিসটি সরকারের হইয়া গেল, আর হিউম সাহেব সেসন কোর্টে চলিয়া গেলে আমিই তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতে লাগিলাম।

স্মৃতিকথার প্রারম্ভেই বলিয়াছি, আমার স্ত্রীর কথা কিছু বলিব। তিনি কলিকাতা চোরবাগান পল্লীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় বংশীধর সাহা মহাশয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত বংশীধর সাহা মহাশয়ের এক সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ২৫৮ খানি তামাকের আড়ত ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি এক দিকে যেমন ধনোপার্জ্জন করিতেন—তেমনি অন্য দিকে হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুক্তহস্তে ধন ব্যয় করিতেন। তাঁহারই পুত্র স্বনামধন্য রাধামাধব সাহা—যাহার নামে এখনও তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তাটি 'রাধামাধব সাহা রাস্তা' নামে পরিচিত।

উক্ত স্বর্গীয় রাধামাধব সাহার প্রপৌত্রী শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরীর সহিত আমার বিবাহ হয়। তিনি যে কেবল রূপে গুণে অসামান্যা ছিলেন,

তাহা নহে—লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি যখন তাঁহার বাপের বাটীতে কুমারী অবস্থায় ছিলেন—তখন তাঁহার পিতার বাটী উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—পূজাদি উপলক্ষে ঐ বাটী দীয়তাং ভুজ্যতাম্ রবে মুখরিত হইত। আবার যখন তিনি আমার বাটীতে পদার্পণ করিলেন—তখন হইতেই কমলাদেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন।

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে এই চোরবাগান পল্লীতে বহুসংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু গন্ধবণিকের বাস ছিল। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নামে কোন কোন গলি ও রাস্তা পরিচিত—জগমোহন সাহার গলি, সাহা লেন তন্মধ্যে অন্যতম। কলিকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীতেও আমার কয়েকজন পরমাত্মীয়ের বাস ছিল—তন্মধ্যে স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র সাধু মহাশয় অন্যতম। তাঁহার নিবাস ছিল ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। আমি যে সময়ে (স্বর্গীয়) অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক (Article Clerk) ছিলাম, তখন তিনি প্রায় বলিতেন—চোরবাগান ও জোড়াসাঁকোর গন্ধবণিকেরা খুব বনেদি ঘরের লোক। সে সময় ঠাকুরবাড়ীর সহিত বেণেদের খুব সৌহৃদ্য ছিল।

১৯১২ খৃঃ যখন রাজা ভারতবর্ষে আসেন, তখন কলিকাতার অনেক কৃতী লোককে টাউনহলে সভা করিয়া Certificate of Honour দেওয়া হয়। কৈলাসচন্দ্র বসু তখন Sir হন নাই; C. I. E. উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনিও সেই সময় Certificate of Honour পান। আমার Certificate of Honour পাইবার কারণ এই দেওয়া হইয়াছিল, 'For loyal and devoted assistance to the legal works of Government.' সার কৈলাসকে সার্টিফিকেট

দেওয়া হয় হাকিমি করার জন্য। তিনি আমার Certificate দেখিয়া বিশেষ খুসী হইয়াছিলেন। তার পরেই একটি রৌপ্য মেডেল পাই, যাহাকে দরবার মেডেল বলে। তাহার কিছুদিন পরেই রায় সাহেব পাই। ১৯১৬ খৃষ্টব্দে রায় বাহাদুর খেতাব পাই;—১৯২৪ খৃষ্টব্দে C. I. E. খেতাব পাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমার সুখদুঃখের জীবনসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিলে আমি গুণবতী সাধ্বীর বিয়োগ-ব্যথায় অধীর হইয়া পড়ি। সেই সময়ে আমি কার্য্য হইতে অবসর লইব মনস্থ করি। ১৯১০ হইতে ১৯১৯ অবধি ভোর ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, আমার শরীরও বিশেষ খারাপ হইয়াছিল, তাহার উপর স্ত্রী-বিয়োগের শোকে শরীর এলাইয়া পড়িল; স্নায়ু-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। ক্যালভার্ট সাহেব তখন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তিন জনে আমাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন। ক্যালভার্ট সাহেব যখন শুনিলেন যে, ২৩ বৎসরের মধ্যে দুই দিনের বেশী আমার আদালতে কামাই হয় নাই, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Rai Bahadur, do you think yourself to be a money making machine? তোমার শরীর বিশেষ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকে আমি একটি কথা বলিয়া যাই, হয় যেমন পরিশ্রম করিয়া যাইতেছ, সেইরূপ পরিশ্রম করিয়া যাও, ছয় মাসের মধ্যে তোমার শরীর কার্য্যে অপটু হইয়া পড়িবে, আর না হয় কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, এখনও বিশ বৎসর বাঁচিবে।"

তদুত্তরে আমি ক্যালভাট সাহেবকে বলিলাম, "জীবনে আমাকে

এরূপ ঠাট্টা কেহ করে নাই। আমি সেই দিনই স্থির করিলাম, কার্য্য হইতে অবসর লইব এবং সেইরূপ মনস্থ করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া মধুপুরে আমার "সাধুসঙ্ঘ" নামে পরিচিত যে বিশ্রাম-কুটীর আছে, সেই বাটীতে গেলাম। চার মাস সে বাটীতে থাকিবার পর সহসা টেলিগ্রাম পাইয়া, আবার আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম, তৎকালীন পুলিশ কমিশনার স্যার রেজিন্যাল্ড ক্লার্ক ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এক্‌জিকিউটিভ মেম্বার সার হেনেরী হুইলার স্থির করিয়াছেন যে, সরকারী উকিল হিউম সাহেবের কার্য্য আমাকে করিতে হইবে। বেতনের আধিক্য হেতু ভারত সরকারের মারফত ভারত-সচিবকে লেখা হইল। সেখান হইতে মঞ্জুরী টেলিগ্রাম আসিল; আমি কলিকাতার পাকা সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত হইলাম।

পত্নীবিয়োগের পর আমি এমন একটি খেয়াল খুঁজিতে লাগিলাম, যাহাতে পেশার কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য করিয়া কতকটা সময় কাটে। সঙ্গীতবিদ্যার দিকে নজর দিলাম, সুবিধা হইল না। ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতে বিফলমনোরথ হইলাম। শেষে সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিলাম। ছেলেবেলা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা লিখিবার অভ্যাস ছিল। অবসর-বিনোদনের জন্য সাহিত্যচর্চ্চায় মন দিলাম; দেখিলাম, বেশ ভাল লাগিল। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় সুখ হইতে পারে না। ভগবানের দয়া ভিন্ন সুখ শান্তি হয় না। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'ভোলানাথের ভুল,' ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে "মেনকারাণী," ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'ঋণমোক্ষ," ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে "মহামায়ার মহাদান" উপন্যাস এবং ১৯৩০ "হুদ্দাদার" ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করি।

প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব নর্টন সাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। তাঁহাতে আমাতে দুই জনে মিলিয়া অনেক মামলা একত্র করিয়াছি; দুই জনে দুই পক্ষও সমর্থন করিয়াছি। ডক্টর থর্ণহিল—যিনি এক সময়ে পুলিস আদালতের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং পরে কলিকাতার ছোট আদালতের প্রধান জজ হন; তৎপরে পাটনা ও কলিকাতা হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতি হন, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে এত বিশ্বাস করিতেন যে, অন্যান্য উকিল প্রায়ই বলিতেন, "আপনি থর্ণহিল সাহেবের নিকট সমন বা ওয়ারেন্টের জন্য দরখাস্ত করেন কেন? আপনি পেশ করিলে, তিনি অনায়াসে হ্যাণ্ডনোটও সই করিয়া দিবেন।"

এক সময়ে ডক্টর থর্ণহিল ও নর্টন সাহেব একই বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহারা দুই জনেই প্রায় আমাকে বলিতেন, "দেখ তারক, ফৌজদারী আদালতে পেশা করিয়া, মনুষ্য-হৃদয়ে বিশ্লেষণ করিবার তোমার যেরূপ সুবিধা, ভারতবর্ষের অতি অল্প লোকেরই সেরূপ সুবিধা আছে। বিলাতে Sergeant Balentyne মনুষ্য-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের যেরূপ সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন, তোমারও সেই সুবিধা আছে। Sergeant Balentyne তাহার Memoirs লিখিয়া গিয়াছেন, তুমি তোমার অভিজ্ঞতাটা কেন লিপিবদ্ধ করিবেনা? তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয্যে ও অনুরোধে আমি আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি লিখিব, মনস্থ করিয়াছিলাম। তবে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ইংরাজিতে লিখতে, আমি তাহা না করিয়া বাঙ্গালাতে লিখিলাম। ফৌজদারী আদালতে দীর্ঘকাল পেশা করিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি—'পূর্ব্ব-স্মৃতির' পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহা বিবৃত করিতেছি।

চতুর্থ কথা

উন্নতির প্রধান সোপান মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা

অনভিজ্ঞ অলসপ্রকৃতির লোক—যাঁহারা জীবনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা, জীবনে যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সব লোককে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া থাকেন—ভাগ্যই মূলাধার, বিদ্যাই বল, বুদ্ধিই বল, কোন উপকারে আসে না। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পৃথিবীতে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে জীবনব্যাপী পরিশ্রমই মানুষের প্রধান পুঁজি। দৈব ও পুরুষকার দুইয়ের সমন্বয় না হইলে মানুষ সচারাচর উন্নতি করতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা মানুষের কৃতিত্ব উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহেন যে, সেই সব লোকের সৌভাগ্যের কারণ তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী, সে ধারণাটি একেবারেই ভ্রমাত্মক। পাঠক-পাঠিকারা এমন একটি কোন লোকের নাম করিতে পারিবেন না—যিনি বিনা পরিশ্রমে নিজের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে জীবনে কোন লোকই উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। অগাধ পরিশ্রম, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। জীবনে সফলকাম হইতে হইলে—কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। অনেক সময়ে শোনা যায়, লোকে সফলকাম লোককে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, ঐ ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান্ পুরুষ। ভাগ্যবান্ অর্থে যদি মনে করিয়া থাকেন

যে, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা সফলকাম হইয়াছেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই, ইহা ধ্রুব সত্য কথা। কিন্তু যদি তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই হয় যে, ঐ ব্যক্তি বিশেষ যোগ্য না হইলেও ভাগ্যলক্ষ্মীর কটাক্ষে বড় হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অনেক সময় শুনা যায়, লোকে বলিয়া থাকেন, এই লোকটি 'Born genius' অর্থাৎ জন্ম হইতে মেধা লইয়া জন্মিয়াছেন। মেধা জন্মগত হইতে পারে আর মানুষ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় মেধা না লইয়া জন্মিয়াও মেধাবী হইতে পারেন অর্থাৎ মেধা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। মেধা লইয়া জন্মাইতে পারেন অথবা মেধা জন্মাইতে পারেন—অনেক সময়ে যাহাকে আমরা Plodding বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহারা ঘষে মেজে গুণী। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বনামধন্য ব্যক্তি অগাধ পরিশ্রমের দ্বারাই উন্নত হইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যবসায়তেই উন্নতি করিতে হইতে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। অগাধ পরিশ্রম, যাহাকে সাদা বাঙ্গালায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি বলে।

২। প্রভূত অধ্যবসায় (Perseverance)

৩। মনঃসংযোগ (Application)

৪। ভগবানে অগাধ বিশ্বাস।

৫। নিজে যদি ফাঁকিতে না পড়িতে হয়, পরকে ফাঁকি দিবে না।

মিথ্যাবাদ সর্ব্বসময়েই বর্জ্জনীয়। সব ব্যবসায়েই এই উক্তিগুলি প্রযোজ্য। ওকালতী ব্যবসাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। জীবনের প্রারম্ভে হয় ত' আপনি সামান্য ফি'য়ে একটি মকদ্দামা পাইয়াছেন, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সেই মকদ্দমায় যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে

পারেন, তাহা করিতে হইবে যে, সেই মকদ্দমাটির সাফল্যের উপর আপনার পেশা ও জীবনের সমস্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ঐ মকদ্দমাটিতে আপনি কৃতকার্য্য হইলে আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে, অকৃতকার্য্য হইলে তাহা উন্নতির অন্তরায় হইবে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, যে মকদ্দমায় কিছু করিবার নাই, তাহাতেও অন্যায় উপায়ে আপনাকে কৃতকার্য্য হইতেই হইবে। তবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে আপনাকে সেই মকদ্দমাতেও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আপনার মনোযোগের অভাবে—পরিশ্রমের কার্পণ্যে যেন মকদ্দমাটি আরও খারাপ না হয়।

আমি পেশার প্রারম্ভে ছোট আদালতে ও পুলিশ কোর্টে দুই জায়গায় মকদ্দমা লইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। শেষ এক দিন দেখা গেল, আমি ছোট আদালতে মামলা করিতেছি, আমার অনুপস্থিতে ফৌজদারী মামলায় আমার আসামীটির জেল হইয়া গেল। আসিয়া যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন আর আক্ষেপের সীমা রহিল না। সেই দিনই ভগবানের নিকট শপথ করিলাম, আর দু নৌকায় পা দিব না। সেই দিন হইতেই পুলিস কোর্টেই ভর দিলাম। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমি উপস্থিত থাকিলে এই লোকটির জেল হইত না। হয় ত' আমি উপস্থিত থাকিলে তাহার কতকটা উপকার করিতে পারিতাম। ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস উন্নতির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান স্তর। এ সম্বন্ধে আমি দুই তিনটি ঘটনার উল্লেখ করি।

প্রথম।—অবৈধভাবে অন্যের স্ত্রীকে তাহার স্বামীর কাছ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি অবস্থাপন্ন মুসলমান ভদ্রলোক বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন। আমি সেই ভদ্রলোকের অপর পক্ষের

তরফ হইতে অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির স্বামীর তরফ হইতে উকিল নিযুক্ত হই। যে লোকটির তরফ হইতে নিযুক্ত হই, সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত, গরীব মানুষ। ভগবান্ যদিও তাহাকে ধন-সম্পত্তি দেন নাই, কিন্তু তাহাকে একটি সুন্দরী রমণীর স্বামী করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে ঐ লোকের অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিলেও সে স্ত্রীভাগ্যে ভাগ্যবান্ ছিল। অপর পক্ষের লোকটি ধনসম্পত্তিশালী ব্যবসাদার। সমাজে তাহার প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। ঐ রাজমিস্ত্রীর স্ত্রীর উপর তাহার নজর পড়িল এবং তাহার ও তাহার বন্ধুবর্গের ভাষায় এই সুন্দরীকে রাজমিস্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেক সময় স্বামীর নিকট হইতে অপর পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীর উদ্ধার এইরূপ ভাষাতেই অভিহিত হইয়া থাকে। আমি তখন জুনিয়ার উকিল। এই রাজমিস্ত্রীটি যোগাড়যন্ত্র করিয়া মকদ্দমার দিন আমাকে যৎসামান্য ফী দিতে লাগিল। আমি মকদ্দমা করিতে লাগিলাম। এই "উদ্ধারকারীর" নাম, লেখার হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাক্, সেখ রহমতুল্লা। রহমতুল্লার সম্পত্তি আছে, অতএব বন্ধুর অভাব ছিল না, আর তাহার ও তাহার বন্ধুদের নজর—শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বদাই সকলের উপরই রহিয়াছে।

আমাদের যে ব্যবসা অর্থাৎ ওকালতীর ব্যবসা, ইহাতে আমরা অনেক সময় মন্দও করিতে পারি, ভালও করিতে পারি। লোকের সর্ব্বনাশও করিতে পারি আর লোকের 'মুস্কিলে' 'আসানের' জন্য সাহায্যও করিতে পারি। ধর্ম্মপথে থাকিলে লোকের উপকারে লাগি, অবশ্য কমবেশী—ভাল, মন্দ করা হিসাবে আমাদের ক্ষমতা অনেক। মনে করিলে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারি অথবা কতকটা উপকারও করিতে পারি। কারণ, লোককে সরল বিশ্বাসে অনন্যোপায় হইয়া

আমাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা গলায় ছুরি দিলে এক ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না।

কয়েক দিন মকদ্দমার পর যখন রহমতুল্লা ও তাহার লোকজন দেখিল, মকদ্দমাটিতে তাহাদের সুবিধা হইতেছে না, তখন সেই পক্ষের এক জন কারপরদাজ আমার বাটীতে আসিয়া হাজির। তখন আমার মাত্র তিন বৎসরের পসার। সে আসিয়া বলিল, "মহাশয়, গ্যাঁড়াতলার আমার ও বন্ধু রহমতুল্লার প্রবল পরাক্রম, অনেক লোকজন আমাদের হাতে। আমরা জানিতে পারিয়াছি, আপনি একজন উদীয়মান উকিল; এমন সময় আসিবে—যখন আপনি একজন বিখ্যাত বড় উকিল হইবেন; আমরা আপনার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে চাই, সেই জন্য আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য এইখানে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"আমি তোমাদের এই সদিচ্ছার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। সর্ব্বপ্রকার পরাক্রমশালী লোকের সহিতই আমি সৌহৃদ্য করিতে প্রস্তুত ও ব্যস্ত। তবে আমার এ সৌহৃদ্য অধর্ম্মের উপর স্থাপিত হইবে না, ন্যায়ের উপর স্থাপিত করিতে হইবে। সেখ রহমতুল্লার নামে স্ত্রী বাহির করিবার অজুহাতে একটি মকদ্দমা চলিতেছে না?"

সে লোকটি বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, সেই লোকটিই বটে, একটি মিথ্যা মকদ্দমা তাহার নামে রুজু হইয়াছে। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা একটা রাজমিস্ত্রীকে খাড়া করিয়া এই মানী লোকের অবমাননা করিবার জন্য একটি মিথ্যা মকদ্দমার সূত্রপাত করিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"বটে! কিন্তু সে বলে, তাহার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আপনাদের রহমতুল্লার নজর পড়িয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে, এখন দেখিতেছি, আমার উপরও আপনার রহমতুল্লার নজর পড়িয়াছে,

ইহাতে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই ত'? আমি অপর পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছি। এ মকদ্দমাটি হইয়া যাক্, ভবিষ্যতে আপনাদের যাহা কিছু মকদ্দমা হইবে আমিই করিব।"

সে আমাকে আদাব বলিয়া চলিয়া গেল এবং তাহা পরেও সেখ রহমতুল্লার দলের ৩।৪ জন লোক ঐ স্ত্রী-বাহির করিবার মকদ্দমায় যাহাতে আমি তাহাদের সাহায্য করিতে পারি, তাহার স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল, আমি কিছুতেই রাজী হইলাম না, তখন ঐ "উদ্ধারকের" দল রাজমিস্ত্রীর স্ত্রীকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিল এবং তাহার ক্ষতিপূরণের স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ডও দিল। শেষে মকদ্দমা আপোষে মিটিয়া গেল। তাহার কিছুদিন পরেই রহমতুল্লা তাহার পাড়ার একটি মকদ্দমা লইয়া আমার নিকট আসিল ; আসিয়াই অভিবাদনের পর বলিল, "মহাশয়, আপনি ধার্ম্মিক লোক, এখন হইতে আমার মহল্লায় যাহা কিছু মকদ্দমা, সব আপনিই পাইবেন। আজ হইতে আপনি আমার উকিল রহিলেন।" ইহার পর রহমতুল্লা ২০ বৎসর বাঁচিয়াছিল আর ২০ বৎসরকাল আমাকে অনেক মকদ্দমায় নিযুক্ত করিয়াছিল। বলিয়া রাখা উচিত, সে দালাল ছিল না, দালালীও লইত না। প্রত্যেক বৎসর বড়দিনের সময় একটি করিয়া ভেট আনিত, টাকা হিসাবে তাহার মূল্য ২০।২৫৲ টাকা, কিন্তু শ্রদ্ধা-উপহার হিসাবে আমার নিকট সেই ভেটটি অমূল্য।

দ্বিতীয়টি—ইহার কয়েক বৎসর পরের একটি মামলা। জনাইয়ের মুখুয্যে-বংশের কোন ভদ্রলোক এক বিশিষ্ট ছাপাখানায় কাজ করিতেন, অক্ষর (Type) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পুলিস কোর্টে চালান হন। এক দিন প্রাতঃকালে আমি ভুবন বাঁড়ুয্যের লেনস্থ বাটীতে উপর হইতে নীচে আসিতেছি, এমন সময় একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক

৩।৪টি পুত্র-কন্যা লইয়া আমার সিঁড়ির ঠিক তলায় আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া ভদ্রোচিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা আমি বিপন্না, স্বামী ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় অভিভাবক নাই, আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমার স্বামী হাজতে।"

এই বলিয়া আমার সামনে আমার ফী স্বরূপ কয়েকটি টাকা রাখিয়া বলিলেন—"বাবা, যেমন ক'রে পার আমার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

আমি কোর্টে যাইয়া দেখি, যে হাকিমের ঘরে মামলা পড়িয়াছে, তাহাকে আমাদের উকিলের আখ্যায়িকায় "কসাই" হাকিম বলিতাম। তাহার নিকট হইতে আসামী ছাড়ান কষ্টসাধ্য তো বটেই, প্রায়ই দুঃসাধ্য। মকদ্দমাটি সে দিন ৩।৪ ঘণ্টা চলিল। প্রাণপণে চেষ্টা করিযাও জামিন করাইতে পারিলাম না। আমি জামিনের জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, হাকিমপুঙ্গব বলিতে লাগিলেন—"You see it is a non-bailable offence." আমি উত্তরে বলিলাম, "হুজুর, non-bailable বলিয়াই আপনার নিকট এত জোর প্রার্থনা করিতেছি, ভদ্রলোক, ভদ্রঘরের সন্তান, পলাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, জামিন দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না, বিচারবিভ্রাটও ঘটিবে না।"

হাকিমপুঙ্গবের একই কথা—"You see it is a non-bailable offence."

ফল কথা, অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও আমি জামিন করাইতে পারিলাম না। তার পরদিন প্রাতঃকালেও সেই শোকাতুরা স্ত্রীমূর্ত্তি আমার বাটিতে আসিয়া হাজির। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "বাবা, আমার স্বামীর কি করিলেন?"

আমি স্ত্রীলোককে কি জবাব দিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার স্বামীর মকদ্দমা এখনও শেষ হয় নাই, যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করিব। হাত ভগবানের, আপনি ভগবান্‌কে ডাকুন।"

তাহার পর স্ত্রীলোকটি বলিল, "বাবা, গত কল্য আমার ঘটি-বাটি বেচিয়া আপনার ফী দিয়াছি, আজ আর তাহাও নাই, অতএব আজ আর ফী দিতে পারিব না।"

আমি সেই মূর্ত্তিমতী শোকাতুরা হিন্দু-রমণীর কাতরতা দেখিয়া, এত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেও কষ্ট বোধ হইতেছিল। আমি বলিলাম—"আপনি বাড়ী যান, আমাকে ফী দিতে হইবে না। আমার দ্বারা যতদূর সাধ্য আমি করিব।"

তাহার পর সেই মকদ্দমা ৪।৫ দিন চলিল। আমি বিনা ভিজিটে সেই মকদ্দমা করিলাম। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হইল না। আসামীর চৌর্য্য অপরাধে ছয় মাস জেল হইয়া গেল। পাড়ার একটি লোক ঐ মকদ্দমা দেখিতে আসিতেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়, মকদ্দমায় যাহা পারি করিব, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে আমার বাটিতে আসিতে বারণ করিয়া দিবেন; বলিয়া দিবেন, মকদ্দমা এখনও শেষ হয় নাই, আমি মকদ্দমা হাইকোর্টে লইয়া যাইব। সেই মূর্ত্তিমতী শোকাতুরা ব্রাহ্মণকন্যা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেই আমি অধীর হইয়া পড়ি, তাহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, খুঁজিয়া পাই না। নিজের পয়সায় মকদ্দমার নকলের কাগজ লইয়া, আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়—এখন যিনি হাইকোর্টের জজ, তাঁহার মির্জাপুরের বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং আরও বলিলাম, "ভাই, বিনা পয়সায় এই

ব্যাগারটি খাটিতে হইবে।" তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যে তিনি সে কার্য্য করিতে তো রাজি হইলেনই, উপরন্তু বলিলেন, "ভাই, ইহার আর একটু তদ্বির করিতে হইবে ; যে ঘরে মকদ্দমাটি পড়িবে, সে ঘরে আমাদের কে, এন, চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ খাতির, তাঁহাকে বলিয়া এই মকদ্দমায় দাঁড় করাইতে হইবে।" আমি কে, এন, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া, তাঁহাকে বিনা ভিজিটে মকদ্দমাটি লইতে রাজী করিলাম। জেল-হুকুমের দুই দিন পরে হাইকোর্ট হইতে তাঁহার জামিনের হুকুম হইল। আমি আমার মুহুরীকে দিয়া একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া, সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে মকদ্দমার শুনানী হইল এবং তিনি জেল হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এই খবর পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। জীবনে বিনা পারিশ্রমিকে অনেক সময় ঘরের পয়সা খরচ করিয়া অনেক মকদ্দমা করিয়াছি। ধর্ম্ম হিসাবেও ত' বটেই, ব্যবসা হিসাবেও সেগুলি ব্যর্থ হয় নাই। যে মকদ্দমাটি করিবেন, প্রাণ দিয়া করিবেন। কখনও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না।

তৃতীয় :—একটি মকদ্দমায় আমি আসামীর দিকে নিয়োজিত। তাঁহার স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী। একটি লোক সেই স্ত্রীলোকটির রূপ-লালসায় মকদ্দমার তদ্বির করিতে আসিয়াছে, তাহার প্রাণপণ চেষ্টা, যাহাতে ঐ আসামীর জেল হয়, আর তাহা হইলে সে অবাধে তাহার ঘৃণ্য পিপাসা মিটাইতে পারে। সে আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল। এক দিন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আসামীর স্ত্রী আর অন্যান্য আত্মীয়ের সম্মুখে সেই লোকটিকে আমার বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলাম। হাটের মাঝে

হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলাম এবং সেই লোকটিকে বলিয়া দিলাম, যত দিন এই মকদ্দমাটি শেষ না হয়, তত দিন সে যেন আমার বাটিতে না আসে। সেই লোকটির আস্ফালন দেখে কে! যাহা হউক, সেই আসামীকে বাঁচাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। আসামীর সেই চক্রী বন্ধুটির কথা শুনিলে তাঁহাকে স্থিরনিশ্চিত জেল খাটিতে হইত।

পেশার সাধনায় দীর্ঘকাল ফৌজদারী আদালতে কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে সততাই যে ওকালতী ব্যবসায়েরও মূলধন—উন্নতির মূলমন্ত্র, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। সেই কারণেই বলিতেছিলাম, ভগবানের স্থিরবিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করিলে তরুণ ও উদীয়মান উকিলগণকে কোন দিনই অনুতাপ করিতে হইবে না। অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে কেবল আইনের চক্ষে—ভগবানের চক্ষেই প্রতারণা করা হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া মকদ্দমায় নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার নিকট বিশ্বাস-হন্তারক হইলে নরকেও স্থান নাই। পেশায় কৃতকার্য্য হইতে গেলে আমি যে সকল কথা এই অধ্যায়ে বলিলাম, তাহার সমীচীনতা চিন্তাসাপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য। ভগবানের কাছে অবিশ্বাসী হইলে কখনই সুখী হইতে পারিবেন না। অর্থ উপার্জ্জনই সুখের একমাত্র উপায় নয়, মনের শান্তিতেই সুখ। অন্যায় করিয়া সেই শান্তি কখনই অর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

পঞ্চম কথা

অষ্টম গর্ভের সন্তান

বহুদিন পূর্ব্বে জীবন-সংগ্রামের প্রথম সোপানে যখন পদার্পণ করিয়াছি, সেই সময়ে এক দিন, এক জন সুপুরুষ বৃদ্ধ আমাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমার মানস-অন্তঃপুরে তখন অনেক আশা, বহু আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন মুকুলিত হইতেছে। আমি সেই সময়ে লালবাজার পুলিস আদালতে সামলা আঁটিয়া বিচরণ করিতেছিলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি উকিল?"

সবিনয়ে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

যে যুগের কথা বলিতেছি, তখন এমন প্রশ্ন অতি শ্রুতিসুখকর ছিল। তখন এইরূপ প্রশ্ন কাহারও মুখে শুনিলে হৃদয় আশার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছি, সম্মুখে বৃহৎ পৃথিবীর বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্র। নৈরাশ্য-বিড়ম্বনা যৌবনের উদ্যমকে আঘাত করিতে পারে নাই; সার্থকতা, সাফল্যলাভের উত্তেজনা হৃদয়কে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছে। এখন এইরূপ প্রশ্ন কেহ করিলে তাহার উপর বিশেষ বিরক্ত হই ও মনে করি, কেন?—আমাকে দেখিয়া কি মনে হয় না যে, আমি একজন উকিল? আর আপনি যদি আমাকে না-ই চেনেন, তবে আপনার সহিত আলাপ করিবারও আমার দরকার নাই।

বৃদ্ধের প্রশ্নে আমি আর্দ্র হইয়া গেলাম। মনে হইল, চোগাচাপকান ও শালের পাগড়ী ছাড়াও আমাতে এমন কিছু আছে, যাহাতে লোক আমাকে উকিল বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে। আমি তাঁহাকে পাকে-প্রকারে ভাব ভঙ্গিতে ও কথাবার্ত্তায় বুঝাইয়া দিলাম যে, আমি উকিল ত' নিশ্চয়ই এবং এক জন বিশিষ্ট দরের উকিল। আমার হাতে কাজ দিলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধ হইবে, সে কথাটাও ইঙ্গিতে জানাইতে ভুলিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লোকটি সুপুরুষ, বয়স ৬০ হইতে ৬৫র মধ্যে। তাঁহার সমগ্র আননে এমন চিহ্ন সুস্পষ্ট যে, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি জীবনে যেন অনেক দাগা পাইয়াছেন এবং শান্তির ভিখারী।

আগন্তুককে ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম, "মহাশয়! বসিবেন কি?" কিন্তু তখনও আমি উকিল-লাইব্রেরীর মেম্বর নহি, অতএব বসিবার স্থান বিশেষ সঙ্কীর্ণ। বাহিরে একখানি বেঞ্চ ছিল। উহা সরকারী উকিল মিঃ হিউমএর ঘরের সম্মুখে রক্ষিত। কিন্তু মোকদ্দমায় যাঁহাদের কষ্ট এবং মোকদ্দমা পাইলে যাঁহাদের আনন্দ, এই উভয় শ্রেণীর লোক মিলিয়া তাহা পূর্ব্বেই দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বেঞ্চে পাঁচ জন ব্যক্তির বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ন্যায় উহাতে পাঁচ জনের স্থানে আট জন বসিয়াছিলেন—"ন স্থানং তিল ধারয়েৎ।"

অবস্থা দেখিয়া আগন্তুক বলিলেন, "মশায়! আপনি এক জায়গায় বসুন।" আমি তখন এরূপ ভাব দেখাইলাম যে, আমি কাজের লোক, আমার বসিবার অবকাশ নাই। আমার যে বসিবার যায়গা নাই, তাহা আমি তাঁহাকে বলিলাম না। আমি বলিলাম, "আসুন, আপনাতে

আমাতে এই বারান্দায় বেড়াই ; বেড়াইতে বেড়াইতে আপনার সমস্ত কথা শুনিব।”

আমরা উভয়ে পুরাতন আদালতের পূর্ব্ব-বারান্দায় বেড়াইতে লাগিলাম। আগন্তুক বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি জাতিতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমার আটটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল।” আমি বলিলাম, “আপনি আটটি সন্তানের পিতা ? তবে ত' আপনি বিশেষ ভাগ্যবান্ পুরুষ! খুব কম ১২ হাজার টাকা গড়ে ধরিলে প্রায় লক্ষ টাকা আপনার পাইবার সম্ভাবনা। তাহার উপর সহজভাবেই হউক, কিম্বা অত্যাচারের কারণেই হউক, যদি অন্ততঃ চারিটি বউ মরে বা আত্মহত্যা করে. তাহা হইলে আবার ৫০ হাজার টাকা। আপনি মহাশয় অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ।”

আগন্তুক বলিলেন, “মহাশয়! আপনি অত্যন্ত আগাইয়া চলিয়াছেন। আমার সমস্ত কথা না শুনিয়া মনে মনে একটা ধারণা করিয়া লইতেছন।” আমি বলিলাম, “আমি কোন ভুল ধারণা করি নাই, আমি অভ্রান্ত। আট আটটি ছেলে—আট বারং ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। আর ধরুন অন্ততঃ চারিটি ছেলের আর একবার করিয়া বিবাহ দিলে আরও ৫০ হাজার ; মোটের উপর আপনি দেড় লাখ টাকার মালিক।”

আগন্তুক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়! ভগবান্ আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন। একে একে আমার সাতটি পুত্রকে যমরাজ তাঁহার অধিকারে লইয়া গিয়াছেন, বাকী একটি। সদানন্দ আমার অন্ধের নড়ি, বংশের প্রদীপ, পূর্ব্ব-পুরুষকে জল দিবার একমাত্র অধিকারী, সদানন্দই শুধু বাঁচিয়া আছে। আর বাকী সাতটি···—”

বৃদ্ধের বক্ষঃপঞ্জর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। আমি বিশেষ অনুতপ্ত হইলাম। ভাবিলাম, মানুষের এমন বিপদ্‌ও হয়! তখন জানিতাম না যে, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে বিপদ্‌ ঘটে; তবে কম আর বেশী। যত বেশী দিন এ জগতে থাকা যায়, ততই দেখা যায় যে, বিপদের—শোকের আঘাত পায় নাই, এমন লোক জগতে অতি বিরল। প্রত্যেক মানুষেরই প্রথম প্রথম আঁকা-বাঁকা সকোণ ভাব থাকে। এ জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যত বেশী আহত হয়, ততই আঁকা-বাঁকা সকোণ ভাব একবারে সরল—মসৃণ হইয়া আসে।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্‌ হইয়া রহিলাম।—তাহার পরে বলিলাম, "মশাই, বিপদ্‌ সব মানুষেরই হয়, আপনারও হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ অধীর হইয়া কোনও লাভ নাই।" আগন্তুক বলিলেন, "অধীর আমি একেবারেই হই নাই—আজ ১৪ বৎসর যাবৎ প্রথম সাত পুত্রের স্মৃতি মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছি। এখন শুধু ভাবিতেছি, কনিষ্ঠ পুত্রটি কিসে সুখী হইবে, কিসে তাহার শরীর ভাল থাকিবে। এখন ইহাই আমার জীবনের একমাত্র চিন্তা। ব্রাহ্মণী এই কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়াই প্রাণধারণ করিতেছেন। সে তাঁহার নয়নের মণি, জীবনের উদ্দীপনী শক্তি, পৃথিবীর একমাত্র লক্ষ্য। পাঁচ মিনিট তাহাকে না দেখিলে, তিনি পৃথিবী শূন্য দেখেন, মাথা ঘুরিয়া যায়, ধরা শ্মশান বোধ হয়। সেই পুত্রটির বয়স এখন ২০।২২ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সে অতি দুর্বৃত্ত ও অতি পাপাচারী হইয়া পড়িয়াছে, গত চার পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহার উৎপাত বাড়িয়াছে।"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন। তাহার পর চলিতে

চলিতে বলিলেন, "প্রথম প্রথম তাহার নষ্টামীতে আমোদ পাইতাম। মনে করিতাম, তাহার ছেলেমানুষী, কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাহার নষ্টামী বাড়ীতে লাগিল। ততই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, ভগবান্ আমাদের দু'জনের পাপের সাজারূপে এই পুত্রকে পাঠাইয়াছেন, উকিল বাবু!"

বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আমি নীরবে তাঁহার দিকে চাহিলাম। আত্মসংবরণ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "যত দূর মনে পড়ে, এ জীবনে কোনরূপ পাপকার্য্য করি নাই। বোধ হয় কেন নিশ্চয় আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের শাস্তির জন্য ইহাকে সন্তানরূপে পাইয়াছি। আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণী এখনও পর্য্যন্ত বুঝেন নাই। তিনি সেই দুষ্ট পুত্রকে ভগবানের বিশিষ্ট দান বলিয়া মনে করেন;—বলেন, তাহার নষ্টামী নহে, ছেলেমানুষী দুদিন বাদেই সব সারিয়া যাইবে। গৃহিণী না কি আমার পিসীমার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, আমিও ছেলেবেলায় অতিশয় দুষ্ট ছিলাম, পরে কি ভাল হই নাই? আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, আমি এরূপ ছিলাম না। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণী ভুল বুঝিয়াছেন। অনেক মাতাই এরূপ ভুল বুঝিয়া থাকেন।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বিরক্ত হইতেছেন? আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আপনার মূল্যবান্ সময় হয় ত' নষ্ট হইতেছে।"

আমি আগ্রহভরেই শুনিতেছিলাম। বলিলাম, "আপনি বলুন।"

তিনি বলিয়া চলিলেন, "প্রথম প্রথম সদানন্দ ছোট ছোট নষ্টামী আরম্ভ করিল- অর্থাৎ পাড়ার ছেলে দেখিলেই—যদি সে শিষ্ট, শান্ত

হয় এবং আমার পুত্র অপেক্ষা কম বলশালী হয়, তাহা হইলে তাহার মাথায় চাঁটি, অন্ততঃ টিপুনি, কানমলা এবং ধাক্কা দেওয়া এই সব দুষ্টামীতে পাকিয়া উঠিল। উড়িয়া দেখিলেই তাহার টিকি কাটিবার জন্য তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইত। মুটে মোট লইয়া যাইতেছে, তাহার কাপড়ের মধ্যে গরম মুগ ছড়াইয়া দিয়া আমোদ অনুভব করিত। তাহারা যে সব সময়ে তাহাকে ধরিতে পারিত তাহা নয়, কিন্তু তাহারা চেষ্টা করিত না। কারণ. আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহারা আমার পুত্রকে রেহাই দিত। ক্রমে সে আরও এক ধাপ উঠিল। মায়ের চুড়ি, কাণের বালা ইত্যাদি গহনা তাঁহার অসাক্ষাতে লইয়া, বন্ধক দিয়া আমোদ করিতে লাগিল। খবর পাইয়া আমি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওগো, দেখ ত' তোমার গহনার বাক্সের মধ্যে সব ঠিক আছে কি না?' ব্রাহ্মণী ত' আমার কথায় চটিয়া লাল। বলিলেন, 'চাবি আমার কোমরে সকল সময়েই থাকে এবং গহনা ত' সকল সময়ে চাবি দেওয়া থাকে। কেবলমাত্র দুপুরবেলা ঘণ্টাদুই ঘুমানোর সময় না হয় চাবি সম্বন্ধে কিছু অসাবধান হইয়া পড়ি। কিরূপে গহনা বাক্স হইতে যাইতে পারে?' আমার পীড়াপীড়িতে এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যখন তিনি বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, কয়েকখানি গহনা নাই, তখন আমি তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম যে, চাবি যখন কোমরে সর্ব্বদা থাকে, তুমি তাহা কখনও ভুলিয়াও ত্যাগ কর না, তখন কিরূপ ভাবে বাক্সের ভিতর হইতে গহনা অদৃশ্য হইল?'

ব্রাহ্মণের মুখে যে মৃদু হাস্যরেখা দেখা গেল, তাহা কিরূপ মর্ম্মান্তিক এবং তাহা যে জমাট অশ্রুর অভিনব প্রকাশ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব

হইল না। ভাবিলাম, সংসারের নিত্য ঘটনাস্রোতে এইরূপে তরঙ্গলীলা কি অভিনব? না, না, ইহা চিরপুরাতন সত্য—সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে এইরূপ ব্যাপার অভিনীত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে উল্‌টা ফল হইল। ব্রাহ্মণী চটিয়া গেলেন, বলিলেন—'তোমার মতলবটা খুলিয়া বল দেখি, তুমি কি চাও? আমার সাতটি সন্তান গিয়াছে, তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার অষ্টমটিকেও হারাইতে বসিয়াছি। তোমার মাসতুত ভাইয়ের ছেলেটি নামে বিনয়, কিন্তু কার্য্যে সে অত্যন্ত অবিনয়ী। আমার বিশ্বাস, এ সব কার্য্য তাহারই। আমার গর্ভজাত পুত্র এরূপ কখন করিতে পারে না। আমার শরীরে এখনও তর্কপঞ্চাননের রক্ত বিদ্যমান, সে রক্তে এরূপ কু-সন্তান জন্মিতে পারে না।' এইরূপ ভাবে ব্রাহ্মণী বিশেষ কোপান্বিত হইলেন আর বলিলেন—'যাও, তুমি থানায় গিয়া চুরির খবর দাও, তাহা হইলেই ইহার আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা জানা যাইবে।' আমি মশাই তাহা করিলাম না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, গরীব বিনয় এরূপ কার্য্য করে নাই। এ কার্য্য করিয়াছে আমার ভবিষ্যতের আশা, বংশের তিলক, অমঙ্গলের আশ্রয় সদানন্দ। কাজেই আমি থানায় খবর দিলাম না। তাহা হইলে কি হয়, ব্রাহ্মণী রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার চাকরকে দিয়া থানায় এই সোণার-চুরির খবর পৌঁছাইয়া দিলেন। ফলে প্রায় দেড়হাত লম্বা মোচধারী, শ্মশ্রুবিহীন হিন্দুস্থানী জমাদার আসিয়া উপস্থিত। আমি এই সবের কিছুই জনিতাম না। চাকরও থানায় যাইবার আগে আমাকে কিছুই বলিয়া যায় নাই। জমাদার আসিয়াই বলিল, 'হুজুর সেলাম।' সে যে ভাবে 'হুজুর সেলাম' বলিল, আমি ত' শুনিয়াই আঁতকাইয়া

উঠিলাম। সে হুজুর শব্দটি প্রয়োগ করিল বটে, কিন্তু সেটি কমবেশী বিদ্রূপাত্মক। সে বলিল, 'হুজুর, খবর মিলা যে, বিনয় বাবু বোলকে একৃঠো আদ্মি আপ্‌কা বাড়ীমে চুরি কিয়া।' আমি শুনিয়াই প্রমাদ গণিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান্, এ কি করিলে! গরীবের ছেলে, মা নেই, বাপ নেই, আমার আশ্রয়ে পাতের ভাত খাইয়া, মানুষ হইতেছে। প্রত্যেক ভদ্র-পরিবারেই গালি খাইবার জন্য একটা লোক দরকার। বিনয় সেই গালি খাইবার জন্যই আমার বাড়ীতে আছে। সে না থাকিলে আমার বাটীর অনেকেই পেট ফুলিয়া মরিয়া যাইত। বাড়ীতে গৃহিণী ব্যতীত আমার দুই জন শ্যালিকা এবং একটি শ্যালক-পুত্রও থাকিত।

আমি মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, পৃথিবীর নিয়মই এই—যার মা নেই, বাপ নেই, অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃ ও অর্থহীন, সেই সংসারের জঞ্জাল। সে যতই ভাল হউক না কেন, সমস্ত অপকর্ম্মের অপবাদ তাহার মস্তকে অর্পিত হয়। তাহার কথাগুলা কর্কশ, তাহার চলা কদাকার, তাহার চেহারার কোন মাধুর্য্য নাই, তাহার হাসিতে জ্যোৎস্নার আমেজ খেলে না, আর তাহার কান্না কুকুরের ক্রন্দন-ধ্বনির অনুরূপ। পৃথিবীতে যাহা কিছু কদর্য্য ও অন্যায় আছে, সে সেই সকলের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু ভাবিয়া লাভ কি? আমি দেখিলাম যে, এই বিষয় লইয়া গৃহিণীর সহিত মতভেদ হইয়া, নিজেকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজনটা কি? তখন আমি বুঝিলাম, পৃথিবীর কর্ম্মিপুরুষদিগের ন্যায় কিল খাইয়া কিল চুরি সমীচীন।

এই বুঝিয়া জমাদার সাহেবের স্তুতিবাদ করিয়া এবং অনেক কষ্টে তাহাকে খুসী করিয়া ফিরাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, ভগবান্ আমার কপালে কিঞ্চিৎ অর্থকষ্ট লিখিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবে কিরূপে।

আমি আসিয়া চোরের ন্যায় শয্যাগৃহে গেলাম, এবং সেখানে কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। যা হোক্ উকিলবাবু, অনেক কষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। পরে এ রকম অনেকগুলি ছোটখাট চুরি হইয়া গেল, আমি সেগুলি বিষয় জানিয়াও জানিতাম না, শুনিয়াও শুনিতাম না। কারণ, জানিয়া বিপদ্ আনার চেয়ে, না জানিয়া শান্তিতে থাকা অনেক সময় মঙ্গলদায়ক। কিন্তু এরূপ ভাবে ধামা চাপা দিয়া দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে আর কত কাল রাখা যায়? আমরা আমাদের পুত্রের সুখ্যাতি করিতাম। অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ছেলের অনেক গুণ, যাহা তাহার ছিল না, সেইগুলির অনেক স্তুতিবাদ করিতেন, আর আমি সেই সব অন্যায় স্তুতিবাদ শুনিয়াও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতাম না।

প্রথমে সে নিজের বাড়ীতে চুরি করিতে আরম্ভ করিল, শেষে অপর বাড়ীতেও চুরি করিতে আরম্ভ করিল। অপর বাড়ীর লোকরা আমার স্ত্রীর ন্যায় এই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে অপত্য-স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিল না। ফলে অনেক স্থলে তাহার দুষ্কৃতের জন্য তাহাকে হাতে হাতে ফল দিয়া দূর করিয়া দিল। যেমন ধরা—অম্‌নি বিচার, অম্‌নি সাজা, আধ ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ, খালি পুত্রের শরীরে তাহাদের বিচারের দাগ কিছু দিনের জন্য রহিয়া গেল। বাড়ীতে আসে, অধিকাংশ সময়ে আমার অসাক্ষাতে, আমার গৃহিণী তাহাকে ষোড়শোপচারে খাওয়ান এবং প্রায় তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, আমি না থাকিলে তাঁর পুত্রের আরও অনেক অভাব মোচন করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, ভগবানের নাম করিতে করিতে, আর ভগবানের নিন্দাবাদ করিতে করিতে এই পাঁচ সাত বৎসর কাটিয়া গেল।”

আমি বলিলাম, "আপনার পুত্রের বয়স বলিলেন প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না, মশাই, পৃথিবীতে অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু সব চেয়ে অন্যায় কার্য্য অনুপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দেওয়া, সেই পাপটি করি নাই। হিন্দুর ঘরে বিবাহের সুপাত্রীর অভাব কখনও হয় না। কাযেই আমার পুত্রের জন্য কখনও সুপাত্রীর অভাব হয় নাই। গৃহিণীর নির্ব্বন্ধতায় অনেক অপকর্ম্মে সহায়তা করিয়াছি, কিন্তু সব চেয়ে বড় অপকর্ম্ম কু-পুত্রের বিবাহ দেওয়া—তাহা আমি দিই নাই।

"আজ প্রায় দুহপ্তা হইল, পুত্র বাড়ী আসে নাই। প্রথম দুই এক দিন বিশেষরূপে খোঁজ করা হয় নাই। কিন্তু তার পর ব্রাহ্মণীর প্ররোচনায় ও নিজের অপত্যস্নেহের প্রেরণায় পুত্রের খবর লইতে লাগিলাম। শেষে খবর পাইলাম, পুত্র বটতলা থানায় চোর অপবাদে ধৃত হইয়া হাজতে আছে। আগামী কল্য মামলার দিন। এই খবর আমি আজ পাইয়াছি, আর সেই খবর পাইয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি, যদি আমার এই বিপদে কোন সাহায্য করিতে পারেন। দেখুন, উকিল বাবু, এরূপ কদাচারী পুত্রের যে পিতা তাহার বিপদ্ ত' সর্ব্বসময়েই— প্রত্যেক দিনে, প্রত্যেক প্রহরে, প্রত্যেক ঘণ্টায়, প্রত্যেক মিনিটে, প্রত্যেক সেকেণ্ডে। যে দিন এইরূপ পুত্রে জন্ম হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিপদ্‌কে বরণ করিয়াছি। সু-পুত্রের পিতা হওয়া বড় কম ভাগ্যের কথা নয়। আর কু-পুত্রের পিতা হওয়ার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য মানুষের আর হইতে পারে না।"

আমি তখন নূতন উকিল। মানুষের যে এইরূপ বিপদ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া একটু অধীর হইলাম। কথাবার্ত্তা হইতে এই

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কদাচারী বলিয়া বোধ হইল না। তবে কি কারণে তাঁহার এই ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, কি কারণে তাঁহার এই ঘোর মনস্তাপ? হঠাৎ মনে হইল, এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বজন্ম মানিতে হয়। এ জন্মের না হইলেও পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতের জন্য এ জন্মে কষ্টভোগ করিতে হইতেছে।

চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বকথিত বেঞ্চখানি অনেকটা খালি হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া লইয়া লইয়া সেই আসনে বসিলাম। পকেট-বহি বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের নাম, তাঁহার পুত্রের নাম, ঠিকানা, যে থানার হদ্দায় বাস করেন, সে থানার নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলাম। শেষে আরও কয়েকটি কথাবার্ত্তার পর আমার সর্ব্বপ্রধান বক্তব্য তাঁহাকে বলিলাম।

ব্রাহ্মণ ফি'য়ে টাকা কয়টি আমার হাতে দিলেন। আমিও ভগবানের নাম করিয়া চাপকানের পকেটে টাকা কয়টি রাখিলাম। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি বেলা তখন ৫টা। আসামীর সহিত দেখা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি হাকিমে এজলাস-ঘরে গেলাম। কারণ, আদালতের নিয়ম, হাকিমের বিনা অনুমতিতে কোন উকিলই আসামীর সহিত দেখা করিতে পারিবে না। গিয়া দেখি হাকিম উঠিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রলোককে বলিলাম, "আজ আর কিছুই হইবে না, কাল আপনি ১০টার সময় আমার বাড়ীতে আসিবেন। আপনি নূতন লোক, আপনাকে সঙ্গে করিয়া আমি আদালতে আসিব।" আমার এই সৌজন্য শুধু অমায়িকতা হিসাবে নহে, ইহার ভিতরে স্বার্থের বজ্রমুষ্টি লুক্কায়িত ছিল। প্রথম, আদালতে আসিবার গাড়ী-খরচটা মক্কেলে উপর দিয়া যাইবে; দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ একা আদালতে আসিলে দালাল ও

অপরাপর উকিলের হাত হইতে রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। কারণ, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, আদালতে একটি মক্কেল কিম্বা মক্কেল বলিয়া ভ্রম হয়, এমন কোন লোক আসিলে, মাঠে মৃত জীব জন্তুর মড়া পড়িলে শকুনিরা যেমন চারি ধার হইতে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই একটি মক্কেল কিম্বা যাহাকে মক্কেল বলিয়া ভুল করা হয় এমন একটি লোক আসিলে উকিল ও দালালরা তেমনই তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে।

অনেক দিন পরে, যখন আমি দালালদের বা জুনিয়ার উকিলদের হুদ্দা হইতে অনেক উপরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন একটি ভদ্র শ্বেতাঙ্গ আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের আদালত অতি ভয়ঙ্কর স্থান। কোন ভদ্রলোক এখানে অক্ষত দেহে প্রবেশ করিতেও পারে না, বাহিরে যাইতেও পারে না। গত মঙ্গলবার আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদালতে গিয়াছিলাম। অমনই ডজন দুই উকিল ও দালাল আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহারা সকলে স্ব স্ব গুণগান করিতে লাগিল এবং তাদের মুরুব্বী উকিলদের প্রশংসা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।"

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "সাহেব, আমি বিলাতের কথা জানি না, কিন্তু কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের আদালতে এরূপ দৃশ্য কিছুই নূতন নহে। এ সবও থাকিবে, অথচ ভাল উকিলও জন্মাইবে।"

পরদিবস ১০টার মধ্যে ঐ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া আদালতে পৌঁছিলাম। যতক্ষণ না হাকিম এজলাসে বসিলেন, ততক্ষণ পোকা-মাকড়টির আশায় বারান্দায় বেড়াইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া দিলাম, আমার একটি বড় মক্কেলের আসিবার কথা আছে, সেই জন্যই বারান্দায় পায়চারি করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে হাকিম এজলাসে

বসিলেন। আমি তাঁহায় নিকট গিয়া, হাজতঘরের মধ্যে সদানন্দ চাটুর্য্যের সহিত দেখা করিবার হুকুম লইলাম। কলিকাতার পুলিস-আদালতের হাজত-ঘরগুলি অন্যান্য ফৌজদারী হাজত-ঘরের ন্যায় দেখিবার জিনিষ। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নানা রকমের লোক ইহার মধ্যে অবস্থান করে। দুই জন মুন্সী এবং দুই জন পুলিসের লোক; তদ্ব্যতীত আর যাহারা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাদের বিচারের দিন ধার্য্য আছে, সেই সব কয়েদী এবং বিচারফলে যাহাদের প্রতি দণ্ডাদেশ হইয়াছে—তাহারা, অথবা যাহাদের পুনরায় মোকদ্দমার দিন পড়িয়া গেল, সেই সব ব্যক্তি।

এই স্থানটি সাম্যবাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে নৈকষ্য কুলীন, লম্বা শ্মশ্রুধারী, মাথায় সিন্দুরের তিলোকশোভিত ব্রাহ্মণ, ধনী ও মধ্যবিত্তঘরের ভদ্রসন্তান, গরীব ও নীচজাতির ধুরন্ধররা উপস্থিত আছে। বাঙ্গালী, মুসলমান, পেশোয়ারী, চীনা, ইহুদী, পার্শী, কাবুলি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ও সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিকে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হা-হুতাশ করিতেছে, কেহ মনের আনন্দে গুণ-গুণ করিয়া গান করিতেছে, আর কেহ মৃতপ্রায়ভাবে ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছে। কোন কোন লোকের চক্ষু জবার ন্যায় রক্তবর্ণ, কেহ কেহ লজ্জাকে বিদায় দিয়া কঠোর দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে, কেহ বা নীরবে নয়নজলে সিক্ত হইতেছে। জবরদস্ত লোকগুলি বেঞ্চে উপরে বসিয়া আছে, অপেক্ষাকৃত ভালমানুষ-গুলি ভূমিতলে উপবিষ্ট।

আমি গিয়া দেখিলাম, একটা লোক অশ্রুপাত করিতেছে। শুনিলাম, সে এই প্রথমবার গ্রেপ্তার হইয়াছে, অজুহাত, চুরি। অবিশ্রান্ত ক্রন্দনে তাহার সমস্ত মুখমণ্ডল স্ফীত। পার্শ্বে এক জন

পুরাতন হিন্দুস্থানী দাগী চোর নিকটে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিতেছে। শুনিলাম, সে তাহাকে বলিতেছে,—"কাহে তোম্ রোতা হায়। তোম্ পয়লা দফে আয়া, বহুত হোগা দু-মাহিনা মেয়াদ হোগা। হামরা যব্ পয়লা দফে ছ'মাহিনা জেল হুয়া থা, জেলখানাকা চার কোণমে চার দফে পিসাব করণে ছ'মাহিনা কাট গিয়া।" আর একটা পুরাতন চোর তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া বলিল, "বাবা, ভয় ত' নয়; আমার যদি ছ'মাস জেল হয়, তা হ'লে আমারই কোনও বেটা আত্মীয়, যে অনেক দিন হ'তে আমার বউয়ের উপর নজর দিচ্ছে, এই সুযোগে সেটিকে নিয়ে স'রে পড়্‌বে।

এই সময়ে আমি বেশ স্পষ্টস্বরে বলিলাম,—"সদানন্দ কার নাম?"

একটি ২০।২২ বৎসরের তরুণ যুবক উত্তর দিল—"আমার নাম।"

তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে সে গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ ছিল। এখন সে কতকটা ধূসরবর্ণ ও সূর্য্যতাপক্লিষ্ট। তাহার যজ্ঞোপবীতটিও তাহার ব্রাহ্মণত্বের ন্যায় অতি মলিন। আমি বলিলাম, "ওহে সদানন্দ, তোমার তরফ থেকে আমি উকিল আসিয়াছি।" সে শুনিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"উকিল বাবু, আপনাকে আমার উকিল কে নিযুক্ত করিল? আমি বলিলাম,—"তোমার পিতাঠাকুর।"

সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বটে, বটে, সে বেটা আসিয়াছে? উকিল-বাবু তাহার উপর যে অত্যাচার ও কদর্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য কখনও ভাবি নাই—সে আমার রক্ষার জন্য এখানে আসিবে। আমার জেল হইলেই তাহাদের কিছুদিনের জন্য শান্তি! সে আমার মাতাঠাকুরাণীর অনুরোধ ও নির্ব্বন্ধতায় এখানে আসিয়াছে। উকিলবাবু, এই অল্পবয়সে এমন পাপ নাই, যাহা আমি করি নাই।

তবে এক এক সময় আমার পাপাচারে উত্ত্যক্ত মাতার মলিন মুখ দেখিলে মনে হয়, আমি কি অন্যায় কার্য্যই না করিতেছি! কিন্তু সে সব কথা থাক্, আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন। আপনি ভদ্রলোক ও শিক্ষিত লোক, আপনি কিছু পান, তাহাতে কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু দেখুন, উকিলবাবু, ঐ বুড়ো বেটার যথেষ্ট টাকা আছে। আপনি যা ফী লইয়াছেন, তার চারগুণ লউন, তাহা হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন। আমার সাত ভাই মরিয়াছে, আমি অষ্টম গর্ভের সন্তান। আমি ব্যবহার না করিলে, উহার পয়সা কে ব্যবহার করিবে?"

আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, এরূপ নরকের কীটও মনুষ্যাকারে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায়!

যাহা হউক, সর্ব্বসমেত মোকদ্দমার পাঁচটি দিন পড়িল। আমি বেশী করিয়া ফী পাইতে লাগিলাম। পঞ্চম দিবসে হাকিম তাহাকে চোর সাব্যস্ত করিয়া সাজা দিলেন। সাজা হইল—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা মতে। সাজা স্থগিত রাখিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের জন্য তাহাকে তাহার বাপের জামিনে ছাড়িয়া দিলেন, এই মামলার যতটুকু সুফল হইল, সেটুকু আমার ওকালতির দরুণ হয় নাই। আমার উপদেশানুসারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনেক কাকুতি-মিনতি ও অশ্রুপাতের জন্য হাকিম দয়া করিয়া এরূপ হুকুম দিয়াছিলেন।

ফৌজদারী আদালতের উকিল ও হাকিমরা কখন কখন দয়া করেন। কারণ, তাঁহারাও মানুষ। মানুষ যে অবস্থায় থাকুক, সম্পূর্ণভাবে দয়া-মায়া বর্জ্জন করিতে পারে না। আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে—অষ্টম গর্ভের সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান্ ও কৃতী হয়, কিন্তু অনেক সময় ইহা প্রবাদরূপেই থাকিয়া যায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অষ্টম গর্ভের সন্তানও সময়ে সময়ে অতিশয় কদাচারী ও কূটনীতিসম্পন্ন হয়।

ষষ্ঠ কথা

চাকরী

পৃথিবীতে যত রকম পেশা ও কার্য্য আছে, তাহাদের মধ্যে চাকরী সুবিধাজনক। স্বাধীন পেশা খুবই ভাল, তবে তাহাতে ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিবার জন্য ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়। তাহাতে হয় ত' শ্রীভগবানের করুণা লাভ হইবে, না হয় সেই চেষ্টাতেই জীবনপাত করিতে হইবে। স্বাধীন পেশায় ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি কিছুতেই খুসী হইতে চাহেন না।

স্বাধীন পেশায় শতকরা একজন কৃতকার্য্য হয়েন, ৯৯ জন বিফল-মনোরথ হইয়া জীবন যাপন করেন। সহস্রের মধ্যে একজন বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হন। স্বাধীন পেশায় আর একটি মহা বিপদ; এক শতের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হইলেন, ৮০ জন একবারেই অকৃতকার্য্য, বাকী ১৯ জন আশেপাশে যে খুদ-কুঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহা লইয়াই খুব খুসী। তবে মানুষ স্বাধীন পেশার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার মত ভাগ্যবান্ কে? এই আশা।

সকলেই মনে করেন, যদি আমার উপরেই দেবী সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে সকল কষ্টেরই লাঘব হইবে। তবে স্বাধীন পেশার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেন, "যদি পৃথিবীর সর্ব্বসুখ ও আয়েস পরিত্যাগ

করিতে পার, তবে আমার সেবায় রত হও। আমি কখন অল্পে সন্তুষ্ট নহি, স্ত্রী, পুত্র, বিশ্রাম, আরাম সব ছাড়িয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইলে তবে আমি তোমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতে পারি।” উকিল ও কৌন্সুলি হিসাবে যাঁহারা বড হইয়াছেন, পেশার পেষণে তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন ; রাত্রি দেড়টা দুইটা পর্য্যন্ত সরস্বতীর সেবা করিতে হইয়াছে, ভোর ৬টা হইতে রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত কেবল মোকদ্দমার কাগজ দেখিতে হইবে, পড়াশুনা করিতে হইবে, তবে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর, নতুবা নহে। ভাল ডাক্তারদের মধ্যেও তাহাই, রোগী দেখা ত' আছেই, তাহা ছাড়া গবেষণা—পড়াশুনা চাই।

একসময় একজন এটর্ণিকে জজের সম্মুখে আসিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনি ব্যবসা করিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। জজ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া ঐ এটর্ণিকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখুন মিষ্টার···আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিই, একলোক পাঁচটা কাজ করিতে পারে না ; এটর্ণির পেশা ভালই, আপনি সে পেশাতেই বিশেষ অর্থবান্ হইতে পারেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, ‘A cobbler should stick to his last’—মুচি তাহার নিজের কাযেই ব্যস্ত থাকিবে।”

বাল্যকালে যখন আমি পড়াশুনা করিতেছিলাম, তখন জানিলাম, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক ডাক্তারী ও ওকালতী দুই-ই পাশ করিয়াছেন, ইঞ্জিনিয়ারিংও পড়িতে লাগিয়াছেন। তখন আমার মনে হইল, বাঃ, এঁর তো খুব মজা। সকালে ও বৈকালে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং করিবেন, আর মধ্যাহ্নে ওকালতী এবং সেই সময়ে একটা সাময়িক উত্তেজনায় মনে হইয়াছিল যে, শুধু ওকালতী পাশ

না করিয়া ওকালতী ও ডাক্তারী দুইটি পাশ করিলে ভাল হয়, কারণ, দুইটি পেশায় প্রভূত ধনোপার্জ্জনের সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম, যখন ওকালতী পেশা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইত, দ্বিপ্রহরে ওকালতী ও সকালে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং করিলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। কিন্তু ১৯০৬ হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন যাইতে লাগিল, তত পেশা জমিতে লাগিল ; তখন দেখিলাম, এক পেশা লইয়াই জীবন অতিষ্ঠ. অধিক পেশা হইতেই পারে না। এক ফৌজদারী আদালতে পেশা আরম্ভ করিয়া, ভোর ৬টা হইতে রাত ১২টা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইতাম না। অনেক সময় ভাত খাইবার সময় না পাইয়া দুধে ভাতে মিশাইয়া, মাতার অনুরোধে সেই দুধ ভাত চুমুক দিয়া খাইয়া, সময়মত আদালতে পৌঁছিয়াছি। আর সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আদালত উঠিয়া গেলে ৫টার সময় টিফিন করিতে সময় পাইয়াছি। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাত্রি ২টার সময় কোন ভদ্রলোক থানায় ধরা পড়িয়াছেন, তজ্জন্য অর্থের লোভে ও ভদ্রলোকের খাতিরে জামিনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। এমন দিন গিয়াছে যে, বন্ধুবান্ধব লইয়া রবিবারে থিয়েটারে যাইতেছি, যাইবার জন্য গাড়িতে চড়িয়াছি, এমন সময়ে ছোট আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, আমার বন্ধুবর শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার অনুরোধ—আমি তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইব ; কারণ. তাঁহার এক দূর-আত্মীয় ধৃত হইয়া থানায় আছেন। আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের "বলিলাম, তোমরা অগ্রসর হও, থিয়াটারে গিয়া অভিনয় দেখিতে আরম্ভ কর, আমি কার্য্য সারিয়া পরে যাইব।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের

অবস্থাও তদ্রূপ তবে পূজার সময় তাঁহাদের লম্বা ছুটী আছে, সেই জন্যই তাঁহাদের জীবন সহনীয়।

অনেক সময়ে পেশার খাতিরে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার তাঁহাদের স্ত্রীর জন্য যেটুকু সময় দেওয়া উচিত, তাহা দিতে পারেন না, এবং স্ত্রীরাও অনেক সময় বলিয়া থাকেন, "আমার পুত্রকে আর তোমার পেশায় দিব না, কারণ, পুত্রবধূ আসিয়া গালি দিবে।"

স্বাধীন পেশার তিনটি দলে লোক বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম, যাঁহার পেশার কৃতী, তাঁহারা আরাম করিবার সময় পান না, সব সময়েই কার্য্যে ব্যস্ত। যাঁহারা পেশার অকৃতী, তাঁহাদের অনেক সময় আছে, কিন্তু মনাগুনে তাঁহারা সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ, অর্থকষ্টে তাঁহারা সব্বদাই জর্জ্জরিত; আর যাহাদের পেশায় সামান্য কৃতিত্ব হইয়াছে, অথচ বিশেষ খাটিতে হয় না, তাঁহারা ভাবে, এ পেশায় না আসিয়া অন্য কোন পেশায় যোগদান করিলে হয় ত' ইহা অপেক্ষা ভাল হইত। পেশা যত উচ্চ দরের, তাহা সেই পরিমাণে কষ্টকর। অনন্যমনা হইয়া তাহার সেবা করিবেন, অন্য কোন দিকে চাহিবেন না। অন্য কিছুতেই রত হইবেন না, নিজের বৃত্তিতেই মজিয়া থাকিবেন, অনন্যমনা হইয়া তাহার সেবা করিবেন। যদি এইরূপ করিতে রাজি হন, পেশা অবলম্বন করুন, না পারেন তাহার কাছেও যাইবেন না। "পেশা চায় ষোল আনা প্রাণ।" আমাদের একজন নবীন উকিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া প্রায় বলিত, "যেমন একটা ছাগলের অনেকগুলি বাচ্ছা, দুধ খায় একটা, বাকিগুলা নেচে কুঁদে বেড়ায়; উচ্চশ্রেণীর পেশাতেও তদ্রূপ। সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করেন ২।৪ জন, আর বাকীগুলি পেশার গর্ব্বে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ান।"

যাঁহারা স্বাধীন পেশার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নহেন, তাঁহারা চাকরী

করিতে যান। ইহা দুই শ্রেণীর;—এক সরকারী আর এক বে-সরকারী। সরকারী চাকরীতে অসুবিধা প্রথম ঢুকিবার সময়; উচ্চপদস্থ পিতা, খুড়া, জ্যেঠা, ভ্রাতা, ভগিনীপতি, শ্বশুর এরূপ নিকট-আত্মীয়ের সাহায্য না থাকিলে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করা বিশেষ অসুবিধা, তবে কোন প্রকারে একবার ঢুকিতে পারিলে আর মার নাই। সময়ের গতির সহিত তঙ্কা-বৃদ্ধি—মরিবার পূর্ব্বে একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু হইবার সম্ভাবনা! যেমন কাননগো বা সাবডেপুটী হইয়া ঢুকিয়া শেষপর্য্যন্ত বিভাগীয় কমিশনার হওয়া যায়—যেমন মুন্সেফ হইতে সুরু করিয়া জেলার জজ হওয়া যায়,—যেমন সরকারী কেরাণী হইয়া ঢুকিলে শেষে আফিসের কর্ত্তা হওয়া যায়,—যেমন Literate Constable হইয়া ঢুকিলে District Superintendent of Police পর্য্যন্ত হওয়া যায়, যেমন কেরাণীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া Executive Counselএর সদস্য পর্য্যন্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরী বে-সরকারী চাকরী। ইহাতে বাড়ীর দারোয়ান হইতে সুরু করিয়া, "প্রবল-প্রতাপান্বিত" Estateএ নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত সকলেই চাকর। চাকরী তাহাদের পেশা। আজকালকার অল্পশিক্ষিত বালক ও যুবক সকলেই—যাহারা সরকারী চাকরী জোগাড় করিতে পারে নাই, তাহারা সকলেই বে-সরকারী চাকরীর জন্য উমেদার।

ব্যবসা করিতে গেলে পুঁজির প্রয়োজন। যে ব্যবসা করিতে চান, সেই ব্যবসার উপযোগী শিক্ষরে প্রয়োজন, পরিশ্রমের প্রয়োজন। সকালে বৈকালে আড্ডা দিবার সময় পাইবেন না, টপ্পাবাজীর সময় কম, কাযেই বে-সরকারী চাকুরিয়ার দল অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ চাকুরীর সংখ্যা অপরিমিত নয়, পরিমিত। কাযেই ইহার যোগাড়

করিতে হইলে লোককে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিতে হয়। সব জিনিষেরই প্রয়োজনীয়তার সংখ্যার উপর সরবরাহের সংখ্যা নির্ভর করে। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সরবরাহ থাকিলে জিনিষের কদর থাকে। প্রয়োজন হাজার, সরবরাহ লক্ষ হইলেই যে কয়টির প্রয়োজন, সেই কয়টির এক রকম যোগাড় হয়, বাকি সকলকেই হাহাকার করিয়া মরিতে হয়। অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত সকলেই চাকরীর উমেদার, কাযেই এত চাকরী আসে কোথা হইতে? অর্থনীতিশাস্ত্রে ইহার কোন মীমাংসা নাই। কোন শাস্ত্রেই ইহার সমীচীন সমাধান নাই। কাযেই বেকার সমস্যার সমাধান নাই! এ জন্যই বেকার-সমস্যা সমাজের একটি কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই অসংখ্য লোকের অন্নসংস্থান কিরূপে হইতে পারে? উচ্চশিক্ষিত স্বাধীন পেশায় নয়, কারণ, তাহার সরবরাহ প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। ব্যবসাতে কতকটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও প্রভুত পরিশ্রম ও শিক্ষার প্রয়োজন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলিতেছি না, ব্যবসায় শিক্ষার কথা বলিতেছি। বেকার-সমস্যাসমাধানের জন্য চাষবাসের দিকে ভদ্রলোকের নজর পড়া চাই, আর কলকারখানায় দ্রব্য প্রস্তুতের বিশেষ চেষ্টা থাকা চাই। অল্প পুঁজিতে সামান্য সামান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা বিশেষ আবশ্যক। খাঁটি খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের দিকে নজর থাকিলে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা বা কুঠি ভালরূপ চলিলে অনেক বেকার লোকের কার্য্য মিলিতে পারে।

কুলী-মজুর কখনও বেকার থাকে না। এত অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনেও গৃহস্থের কাযের জন্য চাকর-চাকরাণী কখন বসিয়া থাকে না।

তাহাদের সংখ্যার যত প্রয়োজন, তত সরবরাহ পাওয়া যায় না, কুলী-মজুরদের সম্বন্ধেও সেই কথা। তাহাদের আয় কম হইলেও অভাবের স্বল্পতা হেতু কষ্টের অনেক লাঘব হয়, এমন কি কষ্ট অনুভবই করে না। বেকার-সমস্যা বলিলে, কুলি, মজুর, চাকর-চাকরাণীর বেকার-সমস্যা বুঝায় না, রাজ-মিস্ত্রী, ছুতার, কামার, রং-মিস্ত্রী ইহারও বেকার নহে,—ভদ্রঘরের অল্পশিক্ষিত. অর্দ্ধশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপকাঠি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত তরুণদের লইয়াই বেকার-সমস্যা !

যেখানে অভাব. সেইখানেই অন্যায়কামী চতুর দুষ্টলোক অভাব-মোচনের পথি-প্রদর্শক হইয়া থাকে। জীবন-সংগ্রামে উত্ত্যক্ত ভদ্র-লোক চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাম, শ্যাম, যদুর কাছে চাকরীর উমেদার হইতেছে ; অমনি কতকগুলি কুটবুদ্ধি চালাক. চতুর দুষ্ট লোক এই সব অভাবগ্রস্ত লোকের উপর নিজ নিজ অভাব-পূরণের খোঁটা গাড়িতেছে। চাকরীপ্রার্থী যুবকগণ এই সব লোকের দিকে ধাবিত হইবে, তাহারাও সুবিধামত তাহাদের বিপথে চালিত করিয়া নিজের বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতেছে।

আজকাল এক শ্রেণীর লোকের ধারণা, কোন কোন বীমা কোম্পানীর সেয়ার (share) কিনিতে পারিলেই সর্ব্ব-দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। নিজে সেয়ার কিনিয়া কিম্বা অপর লোককে কিনাইয়া দিলে, ভাল ভাল চাকরী পাওয়া যায়, এই অজুহাতে অনেক গরীব বেকার যুবক মা, ভগিনী, স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বা দেশের ধানজমি বন্ধক দিয়া টাকা আনিয়া, এই শ্রেণীর শোষক কোম্পানীর সেয়ার কিনিতেছে। তারপর সেই কোম্পানীর যে সব নিয়ম আছে, তাহার বেড়াজালে পড়িয়া টাকাগুলি সব হারাইতেছে,

অনেক সময়ে ফৌজদারী মামলা করিয়া অকৃতকার্য্য হইতেছে। এই শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর প্রথম প্রস্তাব,—কয়েকখানি সেয়ার কিনিতে হইবে এবং অপরকে কিনাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ বীমা কোম্পানীতে তাহার চাকরী হইবে। বড় বড় ছেঁদো কথায় ইহাদের প্রস্তাবিত কোম্পানীর প্রস্তাবনা ছাপা হয়। তাহাদের কাগজপত্র পড়িলেই মনে হয়, ইঁহারা এতদিন কোথায় ছিলেন? ইঁহারা কোন্ বাগানের লুক্কায়িত আনারস ফল? এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে কোন্ বন হইতে সোনার টোপর মাথায় দিয়া বাহির হইলেন? তাঁহাদের উদ্দেশ্য কত মহান্! প্রাণ কত উচ্চ! যেন বেকার জনসাধারণের সুবিধার জন্যই তাঁহারা এই শ্রেণীর কোম্পানী খুলিয়াছেন! আর আমাদের অভাবগ্রস্ত বেকার লোকগুলি বৎসরের পর বৎসর বেকার থাকিয়া যখন দেখেন যে, হয় ত' এই কোম্পানী হইতে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে, তখনই তাঁহারা পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিরূপী এই শ্রেণীর কোম্পানীর দিকে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও মরেন!

এই শ্রেণীর কোম্পানীর উদ্দেশ্য—যেমন করিয়াই হউক, আইন বাঁচাইয়া, প্রতারণা করিয়া, লোকদিগকে অধিকতর গরীব করা। নিজে যিনি চিরকাল অভাবগ্রস্ত, কখনও অর্থ-সংস্থান করিতে পারেন নাই, তিনিই এখন ভুঁফোড় বীমা কোম্পানী করিয়া, অপর বেকারের অন্নসংস্থানের জন্য ব্যস্ত। এই জাতীয় কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে দেখা যাইবে, এতগুলি সেয়ার খরিদ করিলে এই কোম্পানীর ভিতর এতগুলি চাকরী মিলিবে। মাসিক মাহিনা ৫০৲ হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ের যে সব আড়কাটি আছে, তাহারা বিশেষ মোটা কমিশনে লোক ধরিয়া আনিয়া থাকে।

আর এক শ্রেণীর প্রতারক বাজারে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা

নিজে কোন চাকরী যোগাড় করিতে না পারিয়া, অপর অনেক লোকের চাকরীর সংস্থান করিয়া দিতেছেন। চাকরীর জন্য নগদ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে, মাসিক বেতনের পরিমাণ হিসাবে ২০০৲ ৪০০৲, ৫০০৲, ১০০০৲, ১০,০০০৲ ইত্যাদি। টাকা জমা দিলে মাহিনা ত' পাইবেই না, অধিকন্তু ঐ শ্রেণীর জুয়াচোরের অফিস নামে তাহাদের যে আড্ডা আছে, সেই স্থানে যাইয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে। ভাল ব্যবসায়ী যদি চাকরী দিবার জন্য টাকা জমা চান, তাহা হয় ত' তিনি পাইবেন না, কিন্তু এই জুয়াচোরেরা এমনভাবে কার্য্যকলাপ করে যে, এই সব বেকার লোক তাহাদেরই খপ্পরে গিয়া পড়ে। আমার এক আত্মীয় সরকারী পোষ্ট অফিসে চাকরী করিতেন। কর্ম্মস্থান কলিকাতা হইতে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় সামান্য পেন্সন লইয়া সরকারী কর্ম্ম হইতে বিদায় লইলেন। তাহার পর ৩।৪ মাস যাইলে চাকরীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কারণ, তখনও তিনি কর্ম্মক্ষম, বলিতে লাগিলেন 'আমার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে, আমি কেন বসিয়া খাইব ?' খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেন আর চাকরীর দরখাস্ত করেন। জবাব পান এত টাকা জমা দিলে এত টাকা মাহিনার চাকরী পাইবেন। তবে টাকাগুলি নগদ চাই। জবাব পাইলে আমার কাছে আসেন এবং পরামর্শ করেন যে, এই টাকা জমা দিব কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ধরিয়া ফেলি যে, তাহারা জুয়াচোর কোম্পানী।

এই রকম করিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর আমার নিকট চাকরীর জন্য ৩০।৪০টি প্রস্তাব আনিলেন ; আমিও ঐ ৩০।৪০টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমি বলিলাম, 'এই সবকয়টি কোম্পানীই জুয়াচোর কোম্পানী, জুয়াচুরি করিয়া টাকা মারিবার জন্য

এরূপ বিজ্ঞাপন দিতেছে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ তিন বৎসর ধরিয়া আমার পরামর্শে এই সব কোম্পানীতে টাকা জমা না দিয়া চাকরী না পাওয়াতে বিশেষরূপে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন; শেষাশেষি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই, তোমার কথা শুনিতে গেলে ত' আর চাকরীই হয় না। তুমি প্রত্যেক বিজ্ঞাপনকারীকেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লও, তাহা হইলে আমার চাকরী হয় কোথা হইতে?" আমি বলিলাম, "চাকরী কোথা থেকে হয়, সে কথা আমি বলিতে পারি না, তবে তোমার টাকাগুলি এই জুয়াচোররা ঠকাইয়া লইবে, এরূপ অবস্থায় এ অন্যায় পরামর্শ তোমায় দিব কিরূপে?"

আমার এই বন্ধুটি ৩ বৎসর ধরিয়া ঘন ঘন আমার বাড়ীতে পরামর্শ লইতে আসিতেন। তাহার পর প্রায় ৮ মাস ধরিয়া আমার নিকট আর আসিলেন না। আরও শুনিলাম, ১০টার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাহির হইয়া যান, ৫টার সময়ে আসেন। আমার মনে বিশেষ সন্দেহ হইল। মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই ভাল লোকটিকে কোন্ বড় জানোয়ার ভক্ষণ করিল? তারপর একদিন তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া হাজির। আসিয়াই আমতা আমতা স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।" কি বিপদ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর দেলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ;—

সহরের উত্তর প্রান্তে বিশেষ বড়লোকের বাড়ীতে এক ঠিকানায় 'ঘোষ কোম্পানী' বলিয়া একটি কোম্পানী গঠিত হয়, সেই কোম্পানী কয়লার কায করিবে। অনেকগুলি চাকরী তাহাদের কাছে খালি আছে। **Manager, Sub-manager, Secretary, Cashier,**

Office Superintendent, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার এই আত্মীয়টি ৫ শত টাকা জমা দিয় Record-keeperএর কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ছয় মাস ধরিয়া প্রত্যহ ১০টার সময় অফিসে যাইতেন, ৫টার সময় আসিতেন। অফিস ইংরাজটোলায় সহরের দক্ষিণ বিভাগে। টেবিল, চেয়ার, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, লেডী টাইপিষ্ট সবই আছে, খালি নাই কায আর নাই টাকা। তিনি বলিলেন, 'আমি ছয় মাস ধরিয়া নিয়মিতভাবে হাজির দিয়াছি, একটি পয়সা পাই নাই। কাযের মধ্যে চারখানা চিঠি খাতায় entry করিয়াছি, এখন আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এই কোম্পানীটা জুয়াচোর কোম্পানী। যাহা হউক, আমার টাকা আদায় করিয়া দিন, আমি ছাপোষা গরীব মানুষ, আমার এই টাকা যাইলে আমি একেবারেই বিপদে পড়িব। মাইনে না পাই, তাহাতে কিছু যায় আসে না, তবে গচ্ছিত টাকা ফিরিয়া পাইলে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব।'

আমি বলিলাম, "কৈ, তুমি ত' আমাকে টাকা গচ্ছিত করিবার আগে জিজ্ঞাসা কর নাই?"

তিনি বলিলেন, "ভাই, আর লজ্জা দিও না। আমি কি আর সাধ করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি নাই? আমি জানি এবং তিন বৎসর ধরিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, যে সব বিজ্ঞাপনদাতা চাকরী দিবার জন্য নগদ টাকা গচ্ছিত চায়, তুমি সে সবগুলিকেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লও। কাযেই দেখিলাম, তোমার সহিত পরামর্শ করিলে, তুমি কখনই টাকা গচ্ছিত দিবার মত দিবে না। আর তাহা হইলে আমার চাকরীও হইবে না।"

আমি বলিলাম, "নারাণ, (আমার বন্ধুটির নাম)—ঘরের টাকা পরকে দিবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? আজকালকার দিনে

চাকরী কি পড়িয়া আছে? ভাল চাকরী দিবার লোভ দেখাইয়া তোমার কষ্টার্জ্জিত টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য অনেকেই বিজ্ঞাপনের আশ্রয় লইতেছে আর তোমাদের মত এক শ্রেণীর লোক আছে—যাহাদের কার্য্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী যোগাড় করা। মোটের উপর আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারি, যেখানে টাকা জমা লইয়া চাকরী দিবার বিজ্ঞাপন দেয় আর কতকগুলি চাকরী খালি আছে বলিয়া জানায়, সেখানে তুমি ধরিয়া লইতে পার যে, সেগুলি কোন জুয়াচোর ফন্দিবাজের বিজ্ঞাপন। যদি তুমি একটা উদাহরণ দেখাইতে পার, যেখানে আমার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, আমি ইম্পিরিয়াল রেষ্টুরেণ্টে তোমাকে একদিন খাওয়াইয়া দিব!"

যাহা হউক, আমি সেই কোম্পানীর ঘোষ সাহেবকে চিনিতাম, আর তিনিও আমাকে বেশ ভালরূপ চিনিতেন। তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলাম, "ঘোষজা, এই নারাণ বাবুটি আমার আত্মীয়, ইঁহার গচ্ছিত টাকাটা উগরাইয়া দিতে হইবে, না দিলে আমি তোমার এই ব্যবসায়ের বিশেষ হন্তারক হইব। আমি দরখাস্ত করিলেই তোমার নামে ওয়ারেণ্ট পাইব, আর সেই ওয়ারেণ্টের কথা কাগজে ছাপাইয়া দিব, তাহাতে তোমার ব্যবসা একবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।"

অনেক কথাবার্ত্তার পর এইরূপ ধার্য্য হইল যে, সে আমার বন্ধুর টাকাটা ফেরত দিবে; আর আমি তাহার বিপক্ষে কিছুদিনের জন্য কোন মোকদ্দমা লইব না। আমি ঐ ৫ শত টাকা পাইয়া আমার বন্ধুকে দিবার সময় বলিলাম, "তোমার স্ত্রী আমার বিশেষ আত্মীয়া, এ টাকাটা তাকেই দিব।"

বিশেষ নামজাদা বহুকাল স্থাপিত আপিস ব্যতীত কোথাও

টাকা জমা দিয়া সহজে কেহ চাকরী লইবেন না, এই কথাটা আমি বলিতে চাই।

কয়েক দিন হইল, আমার কাছে কোন একটি লোক দরখাস্ত লইয়া আসিয়াছিলেন একটি লটারী খুলিবার জন্য। তিনি একজন শিক্ষিত লোক। তাঁহকে আমি বলিলাম, "আপনার এই কার্য্যটি আইনসঙ্গত নয়, আপনি একজন শিক্ষিত লোক, আপনি এ কার্য্যে কেন হাত দিয়াছেন ?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "মশাই, লোকের যেরূপ অর্থকষ্ট, সাধারণের সুবিধার জন্য এই কার্য্যটি খুলিতে মনস্থ করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "এই দুর্দ্দিনে সাধারণের সুবিধার দিকে নজর না রাখিয়া নিজের সুবিধা হয়, এরূপ কার্য্য করুন।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "এ কার্য্যে আমারও বিশেষ সুবিধা অছে। সাধারণেরও বিশেষ সুবিধা, আমারও বিশেষ সুবিধা।" আমি বলিলাম, "মশাই পরের জন্য মাথা ঘামাইবেন না, ন্যায্য উপায়ে নিজের জন্য যাহাতে সুবিধা করিতে পারেন, তাহা দেখুন।" আজকালকার দিনে তোতাপাখীর ন্যায় অনেকেই কপ্‌চায়, দেশের ও দশের জন্য এইকার্য্য করিতেছি। র্যতদূর সম্ভব, যত দিন আমি এই সরকারী কার্য্যে আছি, এরূপ 'দেশহিতকর কার্য্যে' আমি সর্ব্বদাই বাধা দিব। আপনার লটারীর ব্যবসা আমি খুলিতে দিব না।"

ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে দেশের ও দশের উপকারার্থে তাঁহার প্রস্তাবিত লটারী খেলাটি খুলিতে পারিলেন না, তাহার জন্য বিশেষরূপ আমাকে মনে মনে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন। সরকারী উকিলের কার্য্য করিয়া আমি অনেক 'দেশ-হিতকামী' লোককে খুসী করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় !

সপ্তম কথা

স্বার্থের সংঘর্ষ

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পিতা সংযমচন্দ্র একজন অবস্থাপন্ন জমিদার ছিলেন। তাঁহার পূজা, পার্ব্বণ, দান-ধ্যান যথেষ্ট ছিল। সমস্তই পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করিত। অর্থাগমের নূতন উপায় অবলম্বন করা জমিদার-বংশের আদর্শ নহে মনে করিয়া সংযমচন্দ্র অন্য কোনও পেশা অবলম্বন করেন নাই।

ননীগোপালের এক বিধবা পিসীমাতা ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া বরাবরই পিতার আলয়ে লালিতা-পালিতা ও বৰ্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। পিতৃভবনে তাঁহার প্রভূত আধিপত্য ছিল এবং সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপার তাঁহারই মতানুসারে সম্পাদিত হইত।

ননীগোপাল বাপের একমাত্র সন্তান। আলালের ঘরের দুলাল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না।

গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় জটাধারী গাঙ্গুলী নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। জটাধারী সার্থকনামা ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার জটা না থাকিলেও তাঁহার লম্বিত কেশগুচ্ছ ছিল। ছেলেদের মহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

ননীগোপালের বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন সে প্রথম জটাধারী অধ্যুষিত গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়। তাহার পিতা-মাতার ইচ্ছা ছিল,

৭ বৎসর বয়সেই তাহাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু ননীগোপালের পিসীমাতা তাঁহার আদরের দুলালকে কোনমতেই পাঠশালায় পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, মুখোপাধ্যায় বংশের কুলপ্রদীপ, জমিদার-সন্তান, সাধারণ লোকের সন্তানদের মত বিদ্যার্জ্জন করিতে গেলে জমিদার-বংশের অপমান হইবে। তাহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি চিরকাল জমিদারী চালাইয়া আসিতেছেন। ননীগোপালও সেই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু পরিশেষে ননীগোপালকে পাঠশালায় যাইতে হইল। কয়দিন হাজিরা দিবার পর জমীদার-বংশের দুলাল "পাঠশালা-পলায়ন" বিদ্যা আরম্ভ করিল। উপর্য্যুপরি তিন দিন অনুপস্থিতির পর গুরুমহাশয় জটাধারী স্বয়ং জমিদারভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ননীগোপাল ভয়ে তাহার পিসীমাতার অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় লইল।

জটাধারী বলিলেন, "পিসীমা, ননীগোপাল আজ তিন দিন পাঠশালায় যায় নাই।"

পিসীমা। হ্যা রে, ননী, তুই পাঠশালায় যাস্‌নি কেন?

ননী। আমার বড় শীত করে। যেতে ভাল লাগে না।

জটাধারী। তবে লেখাপড়া শিখ্‌বি কি ক'রে?

পিসীমা। আচ্ছা, গ্রীষ্মকালে শিখ্‌বে. শীতকালে এত সকালে সে উঠ্‌তে পারে না।

জটাধারী। তবে লেখাপড়া শিখ্‌বে কি ক'রে ও কবে? আর লেখাপডা না শিখ্‌লে ত চল্‌বে না, চল্ ননী, আমার সঙ্গে পাঠশালায় চল্।

ননীগোপাল পিসীমাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

পিসীমা বলিলেন, "তা বাপু, যখন সুবিধা হবে, তখন যাবে, তুমি অত ত্যক্ত করছ কেন ?"

জটাধারী দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "ত্যক্ত করা কি পিসীমা, লেখাপড়া না শিখ্‌লে চল্‌বে কি ক'রে ?"

পিসীমাতা এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তবে রে বিট্‌লে বামুন, তোর বাপ-জ্যাঠা ছেলে চরিয়ে খেয়েছেন, সকলেই পণ্ডিত ছিলেন অথচ চিরকাল ছেলে ধ'রে ও ছেলে চরিয়ে পেট চালিয়েছেন, আর আমার বাপ-দাদা চিরকালই জমিদারী চালিয়ে সংসার করেছেন। তোরা যা কচ্ছিস্, তাই কর্, আর আমার ননীগোপাল তার বাপ-দাদা যা ক'রে গেছে, তাই করবে। তোদের মত প্রজাকে ঠেঙ্গিয়ে খাবে। যা বিট্‌লে বামুন, সে আর পাঠশালায় যাবে না। এবার যদি ছেলে ধর্‌তে আমার বাড়ীর কাছে আস্‌বি, তোর ঐ লম্বা কাণকে ছোট ক'রে ছেড়ে দেব।"

পিসীমাতার মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার বচন-সুধা পান করিয়া গুরুমহাশয় গৃহে প্রত্যবর্ত্তন করিলেন। আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পিসীমা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কটু হইলেও সত্য।

যাহা হউক, সংযম মুখোপাধ্যায় ক্রমান্বয়ে বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক দিয়া, বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বাচরিত প্রথা বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার অর্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। কিন্তু খরচ কমাইতে পারিলেন না, অথচ আয়ের নূতন উপায়ও উদ্ভাবন করিত পারিলেন না, কাযেই সাংসারিক অনেক অসুবিধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিম্বদন্তী আছে, এক সময়ে এক পুরাতন

জমিদারবংশের ভদ্রসন্তানের সম্মুখে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, "এখন তোমার যা অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে হয় আমাকে ছাড়, নয় তোমার পুরাতন বনিয়াদি চাল ছাড়! এই দুই ব্যবস্থা একসঙ্গে চলিতে পারে না।" তাহাতে সে লোকটি উত্তর দিয়াছিলেন, "মা আমি তোমায় ছাড়তে পারি, কিন্তু পুরান চাল ছাড়িতে পারিব না।" সংযম মুখুয্যে মহাশয়ের তাহাই হইল। তাঁহার পুরাতন বনিয়াদি চাল, গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী, বাহক, নায়েব, তহশীলদার, পাইক, নিত্য পূজা, দান, বার মাসে তের পার্ব্বণ সবই চলিতে লাগিল, কিন্তু খরচের আধিক্যহেতু দেনা হইতে লাগিল। ক্রমে দেনা না দিতে পারায়, সম্পত্তির কোন কোন অংশ বিক্রীত হইতে লাগিল। তিনি কোন কর্ম্মই শিখেন নাই, অতএব অর্থাগমের অন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুরাতন বনিয়াদি চাল রহিয়া গেল, কিন্তু লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেলেন।

এক দিন সংযমচন্দ্র প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজন ও পোষ্য-পরিবারবর্গকে কাঁদাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। মহাযাত্রার পূর্ব্বে অধিকাংশ সম্পত্তি শেষ করিয়া গেলেন। রাখিয়া গেলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র ননীগোপাল, বিধবা বনিতা হৈমবতী, ভগিনী জটিলাসুন্দরী এবং অপর্য্যাপ্ত ঋণ।

সংযম বাবুর মৃত্যুর চারি বৎসর পরেই আত্মীয়স্বজনগণও ননীগোপাল প্রভৃতির সংবাদ লওয়া পরিত্যাগ করিলেন। ননীগোপালের বয়স তখন ১৬ বৎসর। সে কোনরূপ লেখাপড়া শিখে নাই, কোনরূপ কার্য্যক্ষমও হয় নাই। ঋণগ্রস্ত জমিদারীকে চালাইবার শক্তি ও বুদ্ধি তাহার ছিল না। ক্রমেই তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিবার উপক্রম করিল।

ননীগোপালের ১৮ বৎসর বয়সে তাহার পিসীমাতা এবং মাতাও শোকে, দুঃখে, অভাবে, আত্মীয়গণের ব্যবহারে ক্ষুব্ধা ও দুঃস্থা হইয়া ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। নিকট-আত্মীয়রাই সেই সব সম্পত্তি জলের দরে কিনিয়া রাখিলেন। সম্পত্তিগুলির নীলামের সময় অন্যান্য লোক উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করিতে আসিয়াছিলেন। ননীগোপালের আত্মীয়রা তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনারা এই সম্পত্তিগুলি ডাকিবেন না, আমরা তাঁহার নিকট-আত্মীয়, আমরা চেষ্টাচরিত্র করিয়া এই সম্পত্তি কম দামে কিনিয়া ননীগোপালকেই স্থিতু করি এবং বিশেষভাবে সংযম মুখুয্যের বংশধরের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহা দেখিব।" এই বলিয়া ঐ সম্পত্তিগুলি খুব কম দামে কিনিয়া লইলেন। পরে তাঁহারাই বলিতে লাগিলেন, "আরে রাধামাধব! ওই হাবাতে ছোঁড়াটাকে সম্পত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? যদি ছোঁড়াটা কখনও শোধরায়, তখন দেখা যাবে এবং কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাবে।"

এইরূপে ননীগোপাল সর্ব্বস্বান্ত হইল।

শুধু মাতার খানকয়েক অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্র সমেত দুইটি ট্রাঙ্ক ও কিছু নগদ মুদ্রা ননীগোপালের অবলম্বন হইল। আত্মীয়-স্বজনের কেহই তাহাকে আশ্রয় দিল না। স্বার্থের জন্য সকলেই তাহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিল, সকলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিল। আর সেই স্বার্থসাধনের জন্যই তাহার গহনা, নগদ টাকা ও বাক্সের দিকে নজর রাখিয়া এক গণিকা তাহাকে আশ্রয় দিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় অনেক গণ্যমান্য নামজাদা এটর্ণি ও উকিল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কলিকাতা

পুলিস আদালতে কার্য্য করিতেন। এই শ্রেণীর হাকিমের সংখ্যা এ সময় বড় কম ছিল না। বাবু কালীনাথ মিত্র, C. I. E., বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী. বাবু নবীনচাঁদ বড়াল, বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক গণ্যমান্য আইনজীবী অবৈতনিক হাকিম ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। আজকালকার হাল আইনের মতে তাঁহাদের একটি দুইটি কিম্বা ততোধিক পোঁ-ধরা উকিল তাঁহাদের কাছে ওকালতি করিত না। আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক হাকিমের একটি বা ততোধিক পেয়ারের উকিল আছে। সেই উকিলগুলি হাকিমদের ঘরে উকিল-শ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের অপেক্ষা বড় উকিল এ এজালাসের জন্য আর পাওয়া যায় না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে আইন-ব্যবসায়ী অবৈতনিক হাকিম হইতেন, তিনি যে আদালতের বিচারভার পাইতেন, সেই আদালতেই আবার ব্যবহারজীবের পেশা চালাইতে পারিতেন। কিন্তু Act v of 1898এ এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ সেই সময় হইতে তিনি একবার বেঞ্চে বসিবেন আর একবার ওকালতী করিবেন, এই প্রথা রহিত হইয়া যায়।

আমি দেখিয়াছি, পুর্ব্বকথিত ভদ্রমহোদয়গণ কয় ঘণ্টা হাকিম হইয়া বসিলেন এবং তৎপরেই হাকিমের তক্ত হইতে অবতরণ করিয়া উকিল ভাবে মক্কেলের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। এক দিন তিনি লালবাজারে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার ঘরে একটি নূতন ধরণের চুরির মামলা চলিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়া রখিয়াছি, ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি অমরেন্দ্র বাবুর কাছে হাইকোর্টের

Appellate sideএ Articled clerk ছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে আমি যে লিখিতেছি তিনি আদালতে শোভা-সম্পাদন ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিতেছিলেন, বাস্তবিক তাহা সত্য কথা। তিনি দের্ঘ্যে ৬ ফুট কয় ইঞ্চি, প্রস্থেও প্রায় ৩ ফুট। বর্ণ খুব সুন্দর, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে যেমন বড় ছিলেন, অন্তঃকরণেও তদপেক্ষা বড় ছিলেন। তাঁহার মত উদার ও উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোক খুবই বিরল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি হাকিম হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার এজলাসে একটি মোকর্দ্দমা পেশ হইল। ইহা পুলিশ-চালানি মোকর্দ্দমা নহে, দরখাস্ত করিয়া মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে। ফরিয়াদীর নাম শ্রীমতী সৌরভী, আসামীর নাম রূপচাঁদ মুখুয্যে। এই রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায় আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বকথিত ননীগোপাল। ফরিয়াদীর উকিল মিষ্টার ডট্ (তিনি এখন জীবিত নাই)। তিনি তখন বিলাত হইতে নূতন ব্যারিষ্টার হইয়া হইয়া আসিয়াছিলেন, কাযেই তখন ঝাঁজ খুব বেশী। আসামীর পক্ষের উকিল মিঃ ম্যানুয়েল ও আমি!

মিঃ ডট্ নূতন কৌন্সলী, বিলাত হইতে পাশ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, মোকর্দ্দমার ঘটনাবলী ও প্রমাণ-প্রয়োগ যতই কম থাকুক্ না কেন, তিনি তাঁহার বক্তৃতার চোটে সামান্য ঘটনা হইতেও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া একটা মস্ত কিছু করিয়া তুলিতে পারিবেন।

হাকিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিঃ ডট্, আপানার মোকর্দ্দমাটি কি?”

তিনি যেন একটা আকাশ-পাতালব্যাপী ঘটনার স্রোতোধারা প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে ঘটনা-স্রোত কল-কল রবে বহিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “হুজুর, কলিকাতা সহরে

দিন-দুপুরে এমন অরাজকতার বিষয় কখন শুনা যায় নাই। আমার মক্কেল নিঃসহায়া, পিতৃমাতৃহীনা এক জন স্ত্রীলোক। এ জগতে তাঁহার অন্য কোন আশ্রয় নাই। ইংরাজ রাজত্বে এরূপ অরাজকতা হইতে পারে, তাহা আপনি শুনিলেও বিশ্বাস করিবেন না। এই আসামী ভদ্রসন্তান হইলেও অতি নীচ—জঘন্য-প্রকৃতির লোক ও অতি দুশ্চরিত্র। অবশ্য আমার মক্কেল তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না—"

আসামীর উকিল।—আমি মিঃ ডটের এই কথার বিশেষরূপে আপত্তি করি। মামলায় প্রমাণ হইবার পূর্ব্বে ভদ্রসন্তান আসামীকে দুশ্চরিত্র, নীচ ও জঘন্য-প্রকৃতির লোক বলিবার আপনার অধিকার নাই।

ফরিয়াদী কৌন্সলী।—যে ব্যক্তি বেশ্যালয়ে যায়, সে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র নয় ত' কি চরিত্রবান্? নীচ নয় ত' কি উচ্চ? জঘন্য নয় ত' কি ভাল?

আঃ উঃ।—যদি বেশ্যালয়ে যাইলেই লোক দুশ্চরিত্র, নীচ ও জঘন্যপ্রকৃতির হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় ১ শত জনের ভিতর ৯০ জন লোক ঐ শ্রেণীভুক্ত।

মিঃ ডট বলিতে লাগিলেন—"তিনি তাহা জানিলে তাহাকে কখনই আশ্রয় দিতেন না। যখন তাহাকে তাহার জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন আমার মক্কেল দয়াবশে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দেন। যখন পৃথিবীর সকল লোকই নীচপ্রকৃতি ও কূটবুদ্ধির জন্য তাহাকে ত্যাগ করে, একমাত্র আমার মক্কেলই তাহাকে আশ্রয়দানে বঞ্চিত করেন নাই। চারি বৎসর ধরিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, ভাত, কাপড়, পোষাক, পরিচ্ছদ, শীতে বস্ত্র, গ্রীষ্মে পাখার হাওয়া, মাঝে মাঝে

থিয়েটার দেখিবার পয়সা সবই জোগাইয়াছেন। সেই উপকারের প্রত্যুত্তরে সে যে কি নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ ব্যাবহার করিয়াছে, তাহা শুনিলে আপনি আশ্চর্য্য হইয়া যাইবেন। অনেক সময়ে সত্য ঘটনা গল্পের অপেক্ষাও আশ্চর্য্যজনক। এই চারি বৎসর প্রভুত সেবা করিয়া এক দিন আমার মক্কেল তাঁহার ধর্ম্ম-ভায়ের বাড়ীতে যান, তাঁহাকে ফোঁটা দিবার জন্য। হুজুর, আপনি ফোঁটা কাকে বলে, তাহা বোধ হয় জানেন, 'A drop of kindness to brother."

হাকিম।—মিঃ ডট্, আমি ফোঁটা খুব ভালই জানি, এখনও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন নাতনীদের ফোঁটা লইয়া থাকি।

মিঃ ডট্ বলিতে লাগিলেন—"আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা শুনিবেন? আসিয়া দেখিলে, আসামী বাদিনীর আদরের প্রিয় একটি টিয়া পাখী পিতলের দাঁড়সমেত লইয়া পালাইতেছে। সেই দাঁড়ের এক দিকে ছোলা ও অপর দিকে জল ছিল। আমার মক্কেলের বাড়ীওয়ালী—যে অনেক অধমকেই আশ্রয় দেয়,—আসামী দাঁড়সহ টিয়াপাখী লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার পিছু-পিছু দৌড়ায় ও চোর চোর বলিয়া চীৎকার করে। সেই চেঁচামেচি শুনিয়া অনেক লোক জড় হয় এবং আমার মক্কেলও আসিয়া পড়েন। তিনি মানুষের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়েন। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়, অভিমানে একেবারে বসিয়া পড়েন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে তাঁহার বুকে ধাক্কা মারিতে থাকে, এমন কি, heart-fail হইবার উপক্রম হয়। ভগবানের অসীম করুণা ও সরলপথে ধর্ম্মের সাহায্যহেতু তিনি সে যাত্রা বাঁচিয়া যান।"

আঃ উঃ।—মিঃ ডট্, আপনার ঘটনাবলীর স্রোতটা একটু কমাইয়া দিন না। আপনার বর্ণনাটি মোটের উপর কিছু সংক্ষেপ করিলে,

আদালতের সময়ের সাশ্রয় হয়, আর আমাদেরও অনেক সুবিধা হয়।

ফ: কৌ:।—Both you and the Court are paid for their work.

আ: উ:।—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, উনি এক জন অবৈতনিক হাকিম।

ফ: কৌ:।—Don't interrupt me please. আমি আমার বক্তৃতার খেই হারিয়ে যাচ্ছি।

হাকিম।—মি: ডট্, যদি পারেন ত' আপনার বক্তৃতা একটু সংক্ষেপ করিয়া লউন।

ফ: কৌ:।—হুজুর, আজ্ঞে, তাই করিতেছি। অকৃতজ্ঞ আসামী এই সময় পাখীটিকে ছাড়িয়া দেয়। সে অনেক যত্নের এবং অনেক দিনের পোষা পাখী। মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু পাখী হয় না তাই যখন সে আসামীর হাত হইতে ছাড়ান পাইল, তখন সে উড়িয়া গিয়া আমার মক্কেলের বারান্দার রেলিঙের কাঠের উপর গিয়া বসিল। আর পিতলের দাঁড়টি—আহা, সে অতি সুন্দর দাঁড়,— তাহার ভিতর অকৃতজ্ঞ মানুষের নীচ প্রাণ নাই, তাই সেটা যেখানে পড়িল, সেইখানেই রহিল, পলাইবার চেষ্টাও করিল না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ আসামী পলাইয়া তাহার নীচ মনের পরিচয় দিল। তাহার কৃতঘ্নতার জন্য দু:খ প্রকাশ করিতেও এক দিন আসামীর বাড়ীতে আসিল না;—বলিয়াও গেল না যে; আমার ভুল হইয়াছে, আমাকে মাপ কর। কাযেই অনন্যোপায় হইয়া আইনের মর্য্যাদা-রক্ষাকারিণী আমার মক্কেল, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কথায় বলে, যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান্ আছেন। ভগবান্‌কে সব সময় ডাকিয়া পাওয়া যায় না, সেই কারণে ভগবানের

প্রতিনিধি রাজার আশ্রয় লইতে হয়। রাজাকেও সব সময়ে সশরীরে পাওয়া যায় না, সেই জন্য রাজার প্রতিনিধি আদালতে অধিষ্ঠিত হাকিমের আশ্রয় লইতে হয়। যাহার কেহ নাই, তাহার আইন আছে, আইনই তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। সেই জন্যই আমার মক্কেল আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব প্রমাণ-প্রয়োগাদি লইয়া, সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিয়া এই মোকর্দ্দমার সুবিচার করুন। এক দিকে অবলা, নিরাশ্রয়া, অভিভাবকবিহীনা স্ত্রীলোক—অপর দিকে দুর্ব্বুদ্ধিতাড়িত, কৃতঘ্নচূড়ামণি এই আসামী। ইহাকে উপযুক্ত সাজা দিয়া আইনের মর্য্যদা রক্ষা করুন।

হাকিম।—মিঃ ডট্, মোটের উপর কথা এই, ফরিয়াদী এক জন বারবনিতা। আসামী তাহাকে কিছুদিন রাখিয়াছিল। আপনার মক্কেল বলে যে, আসামী তাহার পাখী ও দাঁড় চুরি করিয়াছে। পাখী ফিরিয়া পাইয়াছে ; দাঁড়ও ফিরিয়া পাইয়াছে। কেবল কিছু ছোলা ও জল মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। সে অতি তুচ্ছ জিনিষ। তাহার জন্য মোকর্দ্দমার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ফঃ কোঃ।—বলেন কি হুজুর, চোরাই মাল পাওয়া গেলেই আর মোকর্দ্দমা চালান উচিত নয় ? আমার মক্কেল 'শান্তিপ্রিয়া অনাথিনী রমণী' ; যদিও সাধারণে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় তাঁহাকে বারবনিতা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি উচ্চকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণের কন্যা।

আঃ উঃ।—সোনাগাছির সমস্ত স্ত্রীলোকই দেবী, ওখানে দাসী মিলে না।

ফঃ কোঃ।—তিনি পুরুষের কুহকে পড়িয়া স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসেন। তিনি কিছুকাল পরে পরপুরুষের অকৃতজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু

আধুনিক সমাজের যে দুরবস্থা ও ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন ভাব, এ দীন-পীড়নকারী, পরদোষদর্শী অবস্থায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কাযেই স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহার জন্য তিনি সদাই অনুতপ্তা। আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহা না হইলে এই ধর্ম্মপ্রাণা বালিকা অনেক পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিতেন, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। আজ চারি বৎসর পূর্ব্বে কুক্ষণে এই আসামী যুবক ফরিয়াদীর গৃহে পদার্পণ করে। আমার মক্কেলের গুণে সে তাহার আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ফরিয়াদীর আশ্রয় লয় ও তাঁহার গৃহেই বাস করিতে থাকে। বিশুদ্ধ আমোদ; আহ্লাদ ও স্ফূর্ত্তিতে চারি বৎসর কাটিয়া যায় মনে রাখিবেন, এই যুবাপুরুষ উপায়ক্ষম নয়, তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাহার জীবন-মরুভূমির একমাত্র মরুদ্বীপ আমার মক্কেলের আবাস-স্থান। আমার মক্কেলও সরল বিশ্বাসে ও নিজ উদারতাগুণে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার পর আজ প্রায় ছয় মাস হইতে তাহার উড়ু-উড়ু ভাব দেখা যাইতেছিল।

হাকিম আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি হে বাপু, তুমি দেখছি ব্রাহ্মণ-সন্তান, বয়স অল্প, তোমার এ কি দুষ্প্রবৃত্তি, তোমার কি বলিবার আছে? দেখতে শুন্‌তে চেহারাও বড় মন্দ নয়, ভদ্র-সন্তান বলিয়াই বিশ্বাস হয়।"

ফঃ কৌঃ।—হুজুর, এ Warrant case. সাক্ষ্য না শুনিয়া, charge না করিয়া, আসামীর কৈফিয়ত চাহিতেছেন? এ কি আইন-সঙ্গত? বিশেষ সে এক জন চরিত্রহীন যুবক। যে বেশ্যালয়ে যায়, সে নিশ্চয় চরিত্রহীন।

আঃ উঃ। আপনার 'চরিত্রহীন যুবকের' মাপকাঠিতে বিচার করিলে শতকরা ৯০ জন চরিত্রহীন।

হাকিম।—মিঃ ডট, আমি ত' সাক্ষী না শুনিয়াই মামলার ফয়সালা করিতেছি না, আমি মোটামুটি জিনিষটা কি, তাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে সাজা দিব।

ফঃ কৌঃ।—আমার মক্কেল তাহাই চান অন্ততঃ এক বৎসর জেল। নূতন হাল আইনে চোরকে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা নাই, এরূপ আইন থাকিলে আমার মক্কেল তাহাই প্রার্থনা করিতেন।

হাকিম।—(আসামীর প্রতি) তোমার নামে চুরির নালিস, তা জান?

আসামী কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "হুজুর, আমি চোর নই। আমি পিতৃমাতৃহীন ও সহায়হীন ব্রাহ্মণ বালক। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু লেখাপড়াও শিখি নাই, কাযকর্ম্মও শিখি নাই। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সেই সঙ্গে অর্থকৃচ্ছ্রতা আসিয়া আমাকে অধিকার করে। আমার জ্ঞাতি ও নিকট-আত্মীয়রা পিতৃমাতৃ ও অর্থের অবসানে কেহই আমার খোঁজ লইলেন না, এমন কি, আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন না, সেই সময় আমার নিজের জন সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! আমি মূর্খতা হেতু কুসঙ্গে পড়িয়া, বামা বাড়ীওয়ালীর বাটীতে আসিয়া জুটি এবং (সৌরভীকে দেখাইয়া) এর কুহকে পড়ি। চারি বৎসরকাল বিকারের রোগীর মত অজ্ঞানে, অর্দ্ধজ্ঞানে, বেঘোরে কাটিয়া গেল। শেষে আমার এক দরিদ্রা দূর-আত্মীয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন এবং আমাকে সৎপরামর্শ দিয়া, অনেক বুঝাইয়া এর সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত রামশরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাদায়ে পীড়িত, তিনি আমাকে কন্যা দিতে রাজী, আমিও আত্মীয়ার পরামর্শে

এ কাযে রাজী হই। ২৪শে ফাল্গুন আমার বিবাহের দিন স্থির হয়। ১০।১২ দিন এর বাটীতে যাই নাই, লোকের উপর লোক পাঠায়, তার পর বাড়ীওয়ালী অনেকবার আমাকে রাস্তায় ধরে ও জোর করিয়া তাহার বাটী লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। এইরূপ অবস্থায় একদিন আমি চেঁচামেচি করি, তখন সে 'পাখী-চোর' 'পাখী-চোর' বলিয়া চেঁচায় ও অনেক লোক জড় করে। শেষে লোকদিগকে আমার প্রকৃত অবস্থা বলায়, বাড়ীওয়ালী আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমি তখনকার মত তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বিবাহের দিন বেলা ২টার সময় ও আর ঐ বাড়ীওয়ালী (সৌরভী ও বাড়ীওয়ালী আদালতে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল) পুলিস লইয়া আমাদের বাটীতে আসে, হাতে সূতা-বাঁধা অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারী warrantএ জামিনের ব্যবস্থা ছিল না, কাযেই হাজতে লইয়া যায়। শেষে হাকিমের বাটীতে গিয়া আমার ভাবী শ্বশুর জামিন করিয়া লইয়া আসেন। সেই রাত্রেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হুজুর, আমাকে মারুন, কাটুন, জেল দিন, ফাঁসী পর্য্যন্ত দিন, আমি আর ওর কাছে যাইব না।" এই বলিয়া আসামী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

হাঁকিম।—দেখুন মিঃ ডট, আসামী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। বিচার শেষ হইলে তখন বলিব, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। কিন্তু আপনার মুখ হইতেই যাহা শুনিলাম, তাহাতে ফরিয়াদীর যে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা গেল। সে পাখীটি ফিরিয়া পাইয়াছে। ক্ষতির মধ্যে ছোলা আর জল, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বিশেষ যখন দুই পক্ষই স্বীকার করিতেছে, আসামী ও ফরিয়াদী চারি বৎসরকাল একত্রে কাটাইয়াছে। আসামী

বলিতেছে, সে এখন বিবাহ করিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না যে, আসামী ফরিয়াদী আর একত্রে থাকে। এ অবস্থায় এ মামলা চালাইয়া লাভ কি?

কঃ কৌঃ।—হুজুর, সত্যের খাতিরে— নীতি বুদ্ধির মর্য্যাদা হেতু—নীতি-জ্ঞানের সম্মানার্থে আমার মক্কেল এ মামলা প্রত্যখ্যান করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মেই বলে, চোরের সাজা হওয়া উচিত। আমার মক্কেল লাভালাভ বোঝেন না, লাভের আশায় তিনি আদালতে আসেন নাই, দুষ্টের দমনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আপনি বিচার করুন, আমার সাক্ষী সাবুদ আছে।

হাকিম।—তবে তাহাই হউক্।

এই বলিয়া তিনি মামলা শুনিতে ও জবানবন্দী লিখিতে সুরু করিলেন।

বিচার-গৃহে লোকারণ্য। আজকাল বাঙ্গালায় এত বেকার লোক আছে যে, সর্ব্বস্থানে কোনও সময়েই বেকার লোকের অভাব হয় না। সভা হইলেই সেখানে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়। যতগুলি পার্ক—কোন স্থানেই লোকের অভাব নাই। চমকপ্রদ, কৌতুকজনক মোকর্দ্দমা থাকিলে জনতার আধিক্যে বিচারগৃহ অতিশয় অসহনীয় হইয়া উঠে।

জবানবন্দীর সঙ্গে সঙ্গে আসামীর উকিল ফরিয়াদীর ও সাক্ষিগণের জেরা করিলেন। ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল, ফরিয়াদী নিজে, বামা বাড়ীওয়ালী, তাহার দুই জন ভাড়াটিয়া আর ভাড়াটিয়াদের তিন জন বাবু, আর সেই বাটীর পাশের চাটের দোকানের এক জন দোকানদার।

এজাহার শেষ হইবার পর হাকিম মিঃ ডটকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"Charge frame সম্বন্ধে আপনার কি বলিবার আছে ?" এই কথা শুনিয়া ফরিয়াদীর কৌন্সলী লম্বাচওড়া এক প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিলেন। মোটের উপর শব্দালঙ্কারের আড়ম্বর বাদ দিলে এই বুঝা যায়, তাঁহার মক্কেল অবলা, সরলা, দুষ্টজনপ্রপীড়িতা, বিচারপ্রার্থিনী। আসামীকে সাজা দিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আ: উ:—হুজুর, চার্জ্জ কেন হইবে না, এই সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা বলিতে চাই।

হাকিম।—বলুন।

আ: উ:।—মোটের উপর সংক্ষেপে বলিতে গেলে মামলাটি এই— অবলা, সরলা, অকুলবালা ফরিয়াদীর পাখী চুরি গিয়াছে, দাঁড় চুরি গিয়াছে, দানাপানি গিয়াছে। দাঁড় ফিরিয়া পাইয়াছে, পাখী ফিরিয়া আসিয়াছ। আর দানাপানির যে কথা, তাহা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অভাব হইতে পারে, ভদ্ররমণীর কম হইতে পারে, কিন্তু কলিকাতার ন্যায় আজগুবি সহরে ফরিয়াদীর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দানাপানির কখনও অভাব হইবে না। তবে কথা হইতেছে আমার মক্কেলরূপ পাখীটি শিকল কাটিয়াছে, নূতন দাঁড়ে বসিয়াছে, সে পাখীটি আর ফিরিয়া আসিবে না। ফরিয়াদী যতই চেষ্টা করুক না কেন, আর তাহার দাঁড়ে বসিবে না! তিনি আরও বলিয়াছেন, বাদী ও তাহার সাক্ষীরা ফরিয়াদীর নিজের দলের লোক, সুতরাং তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। জেরাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে।

ফ: কৌ:।—আমি এ কথার বিশেষ আপত্তি করি—এ কথায় প্রতিবাদ করি। ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষীরা হলফান জবানবন্দীতে এজাহার দিয়াছে। তাহারা মিথ্যা বলিতে পারে না। মিথ্যা বলিলে তাহাদের সাজা হইতে পারে। আসামী শুধু মুখের কথা

বলিয়া গিয়াছে। সে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত হলফ নেয় নাই—তাহার কথার আবার দাম কি ?

আ: উ:।—আপনি বলিতে চান, যদি চারিজন অন্ধ আসিয়া হাকিমকে বলেন যে, সূর্য্যদেব নাই, হাকিম কি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিবেন ?

ফ: কৌ:।—আমার সাক্ষীরা ত' অন্ধ নয় ?

আ: উ:।—তাহারা স্বার্থান্ধ। সাক্ষীদের জবানবন্দী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহাদের এজাহারে আভ্যন্তরীণ মিথ্যাবাদের চিহ্ন রহিয়াছে।

এই সুরে তিনি একটি বক্তৃতা করিলেন। তবে তাহাতে শব্দাড়ম্বর কম, অলঙ্কারের আধিক্য ছিল না—সারগর্ভ যুক্তি ছিল। যাহা হউক দুই পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে হাকিম ছোট একটি রায় লিখিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন। অব্যাহতি দিবার পর ফরিয়াদীকে বলিলেন, আসামীকে হায়রাণ করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা মোকদ্দমা আনার অপরাধে তাহার কেন সাজা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

বামা বাড়ীওয়ালী একটি অদ্ভুত জীব, ওজনে প্রায় সাড়ে ৩ মণ, খুব বেঁটেও নহে, খুব লম্বাও নহে। বেঁটে না হইলেও সে এত অধিক মোটা যে, দেখিলে তাহাকে খুব বেঁটে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বসময়ে পয়সায় দুইটি করিয়া যে মাটীর আহ্লাদী পুতুল বিক্রয় হইত, সে তাহারই একটা। গায়ে খুব মোটা মোটা গহনা, পায়ে চারগাছা মল, নাকে খুব কাঁদাল নথ, তাহাতে খুব বড় নোলক ও বড় জুড়ি মুক্তা, গালে একগাল পাণ-দোক্তা, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে চুণের দাগ, হাতে পাণের আর সুপ্তির ডিবে। পরনে চওড়া পেড়ে দেশী শাড়ী, পাছায়

চন্দ্রহার খুব মোটা রকম, কপালে সিন্দুরের টিপ। দেখিলে মনে হাস্তরসের উদয় হয়। সে লোককে হাসায়, কিন্তু নিজে কখনও হাসে না। কর্কশতাই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। সে সৌরভীর কাণে কাণে বলিয়া দিল, "খুব সাবধান, যেন রূপোর মুখ দেখে ভুলে যাস্ নি। এক রূপো যাবে, একশ' রূপো আস্‌বে। কলিকাতা সহরে অভাব কিসের? ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব? ভদ্রঘরের সুপুরুষ কুলাঙ্গার এক যায়গায় কলিকাতায় ছাড়া এতগুলি অন্য কোথাও নাই।"

কৌন্সলীর ইচ্ছা, আর এক দিন তারিখ পড়ে, তিনি বলিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার জবাব দিবেন। কিন্তু বাড়ীওয়ালী মস্ত ঘুঘু। সে স্ত্রী ও পুরুষ চরাইয়া খায়। কৌন্সলীর সহিত যে ছোট উকিল ছিল, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এ দোষের জন্য খালি জরিমানাই হয়? যখন উকিল বলিল যে, তাহাই, তখন সে বলিল—মামলা মুলতুবি করিবার প্রয়োজন নাই, আজকেই শেষ করিয়া দিন। তার পর ফৌজদারীর কৌন্সলী আর একটি লম্বা-চওড়া বক্তৃতা হইল।

হাকিম বক্তৃতা শুনিয়া রায় দিলেন—ফরিয়াদীর ৫০৲ টাকা জরিমানা, না দিলে দুই মাস বিনা পরিশ্রমে হাজত। টাকা আদায় হইলে আসামীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে সমস্ত টাকাই পাইবে। তার পর আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ওহে, মুখুয্যে, খবরদার, এমন কোন কায করিও না, যাহাতে আবার এইরূপ বিপদে পড়।"

অষ্টম কথা

রাজনীতিক্ষেত্রে সুবিধাবাদ

পূর্ব্বকালে কোন রাজা রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী থাকিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি যাহা নিজে ভাল বোধ করিতেন, সেইরূপই করিতেন। তবে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে বা গোপনে প্রজাবৃন্দের মত জানিয়া লইতেন এবং প্রজারা যাহা বলিত, তাহা বিশেষ করিয়া মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং বিবেক ও বিচারের দ্বারা কিংকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া লইতেন। যদি রাজা অত্যাচারী হইতেন, প্রজারা দরখাস্ত ও অভিযোগের দ্বারা তাহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিত। রাজাদের চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বসময়েই উন্মুক্ত থাকিত। চক্ষু বা কর্ণের সাহায্যে কোন বিষয় তাঁহাদের গোচরীভূত হইলে বিবেক ও বিচারের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইতেন।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ধারণা ও স্পৃহা হইতে লাগিল,—ক্ষমতা এক জনের হাতে না থাকিয়া বহু লোকের হস্তে অর্পিত হউক। যত লোকবৃদ্ধি, তত বহু লোকের হস্তে ক্ষমতাবিস্তারের স্পৃহা। ক্রমে একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তে নিয়মতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল। মূল উদ্দেশ্য—একের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া বহু লোকের হস্তে স্থাপিত হইলে সাধারণ প্রজার সুবিধা হইবে, এই কারণে Absolute monarchy (একাধিপত্যের)

পরিবর্ত্তে Constitutional or limited monarchy (নিয়মতন্ত্র রাজ্যপ্রথা) বিস্তারিত হইতে লাগিল। ক্রমে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র রাজত্ব সুরু হইল। ক্রমে রাজশক্তি গণতন্ত্র বা জনশক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইল? সর্ব্বসময়েই যে গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র নিয়মতন্ত্র রাজ্য অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক, তাহা বলা যাইতে পারে না।

প্রত্যেক রাজতন্ত্রে ভাল মন্দ দুই দিক্ই আছে। রাজা ভাল হইলে রাজতন্ত্র বা একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি ভালই হইবে। রাজা নিজে উৎপীড়ক বা অত্যাচারী হইলে একতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি সাধারণ লোকের পীড়াদায়ক। প্রজা-পীড়ন একচ্ছত্র রাজাও করিতে পারেন, নিয়মতন্ত্রী রাজাও করিতে পারেন, আর প্রজাতন্ত্র রাজত্বেও অত্যাচার হইতে পারে। যে বা যাহারা রাজ্য চালাইবে, তাহাদের ভাল বা মন্দ স্বভাবের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র রাজত্বেও চালক বা ক্ষমতার ধারক যদি অত্যাচারী হয়, তাহা হইলে প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়।

রাজ্যশাসনের পদ্ধতি অনেকগুলি আছে, সেই বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির উপর প্রজাদের সুখ-দুঃখ অনেক নির্ভর করে বটে, কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষস্থানে অভিষিক্ত ব্যক্তি অত্যাচারী হইলে প্রজার সুখ একেবারেই থাকিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রজাতন্ত্রবাদীদের মধ্যেই Autocrat (স্বৈর নৃপতি—স্বয়মীশ্বর) দেখিতে পাওয়া যায়। আর, একবার এক জনের হস্তে ক্ষমতা গিয়া পৌছিলে, তাহার নিকট হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইলে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা তবে সেই কার্য্যে সার্থক্ হওয়া যায়।

মিসর, চীন, রোম, গ্রীস, রাসিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ইত্যাদি রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়, যে ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা নিহিত হয়, যে নামেই হউক, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান হন। তাহাকে Consulই বল, Proconsulই বল, Tribuneই বল Khediveই বল Mehdiই বল Czarই বল Presidentই বল বা Ministerই বল যে নামেই বল না কেন, সেই সময়ের জন্য সেই ব্যক্তিই সর্ব্বশক্তিমান।

প্রত্যেক সর্ব্বশক্তিমান ব্যক্তিকেই কতকগুলি লোককে তাহার সহকারিরূপে রাখিতে হয়। সেই সহকারীকে যে নামেই আখ্যায়িত কর না কেন, ক্ষমতাশালী লোকের সাহায্যের জন্যই এ সব লোক নিয়োজিত থাকে।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী, ইহা স্থির করিতে হইলেই যুদ্ধের প্রয়োজন হইত। কে বড়, কে ছোট, কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা পাইবার অধিকারী, আর কে তাহা নহে, তাহা বিনা যুদ্ধে কিছুতেই ঠিক হইত না, এমন কি, দেশের দুই দলের মধ্যে কোন্ দল ক্ষমতাশালী হইবে, তাহা স্থির করিতে হইলেও যুদ্ধের প্রয়োজন হইত। Caesar ও Pompeyর শেষ যুদ্ধই ইহার উদাহরণস্থল। Pompey ও Caesar দুজনেই রোমক, দুই জনেই রোমীয় সৈন্য লইয়া লড়াই করিতেন, অথচ যখন দুই জনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া রোমেরই বলক্ষয় করিলেন। কিন্তু আজ স্পেনের রাজা আলফান্সোর ব্যবহার দেখুন। যদিও এক দেশের মধ্যে পরস্পর দুই দলের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া লড়াই—গৃহ-বিবাদ বন্ধ হইয়াছে, ভোটযুদ্ধই সেই সশস্ত্র যুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ অধিকার করিবার

জন্য তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমের জনশক্তি তাহাদিগকে নিজ নিজ মত দ্বারা মনোনীত করিতেন।

এখনও অনেক স্থলে সেইরূপ পদ্ধতিতেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মনোনীত করা হয়। তবে সব সময়েই যে নিজ নিজ বিবেক ও বিচারশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ভোট প্রদান করা হয়, তাহা বলা বড়ই কঠিন। যাহাতে বিভিন্ন দেশ-শাসকগণ একত্র বসিয়া ভোটের দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ পার্থক্যবিষয়ে মীমাংসা করিয়া লন—বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ চেষ্টা বিশেষভাবে করা হইতেছে। জেনিভাতে বিভিন্ন জাতি ও শক্তি একত্র মিলিয়া তাঁহাদের মতভেদের বিষয় মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। অস্ত্র-সঙ্কোচ করিয়া কেবলমাত্র ভোটের দ্বারা কার্য্য সমাধা করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্পেন্‌-রাজ্য আজ ১৫ শত বর্ষ ধরিয়া রাজতন্ত্র-পদ্ধতির (Mouarchial) অধীনে। ইদানীং ইহা নিয়মতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল (Constitutional monarchical)। এই স্থানের রাজা ১৫ শত বৎসর ধরিয়া সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, অর্থকৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়া প্রজাদিগকে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এই ১৫ শত বৎসর রাজত্বের পর হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, প্রজারা রাজা আল্‌ফান্সোকে চাহে না। যখন রাজা আল্‌ফান্সো দেখিলেন যে, প্রজারা তাঁহাকে চাহে না, তিনি যুদ্ধ দ্বারা রক্তপাত না করিয়া, রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। অনেক সৈন্য তাঁহার দিকে ছিল, তথাপি তিনি ঘরোয়া যুদ্ধ করিয়া স্পেনের শক্তিক্ষয় করিলেন না।

তিনি চলিয়া যাইবার সময়, অনের প্রজা যখন চীৎকার করিতে লাগিল, "রাজার জয় হউক"। তিনি প্রজাদিগের "রাজার জয় হউক"

এই উচ্ছ্বাসের প্রতি-উত্তরে বলিলেন, "স্পেনের জয় হউক।" তিনি স্পেনকে শক্তিহীন করিয়া রাজত্ব করিতে চাহিলেন না। আর ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন পম্পি দি গ্রেটের সহিত সিজারের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখনকার ইতিহাসে আমরা কিরূপ দেখিতে পাই? দুই জনই রোমক, উভয়েই প্রবল সৈন্যদলের নেতা, দুই জনেরই রোমক সৈন্য, অথচ দুই জনে যুদ্ধ করিলেন—ফল,—পম্পি দি গ্রেট যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, দেশ ত্যাগ করিলেন, এবং মিশরে তাঁহার পূর্ব্ব-অনুগৃহীত টলেমির কাছে আশ্রয় লইতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী তিন জন পূর্ব্বকর্ম্মচারীর হস্তেই তাঁহার হত্যা সংসাধিত হইল।

বর্ত্তমান সময়ে দুই বা অধিক জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির অভিলাষী পম্পি-সিজারের ন্যায় নিজ নিজ দলস্থ সৈন্য লইয়া, যুদ্ধ করিয়া না মরিয়া ও না মারিয়া ভোট-যুদ্ধের দ্বারা ঠিক করিয়া লন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজশক্তি পরিচালন করিবেন।

এই ভোট-যুদ্ধে অর্থক্ষয় ও সময় নষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রাণিক্ষয় হয় না। তর্জ্জা লড়াইয়ের মত দুই দলের এক দল গাহিয়া আসর ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া বসেন ও অপর দল আসরে নামিয়া তাঁহাদের কেরামতি দেখান। বাগ্‌যুদ্ধ হয় বটে, হার-জিতও হয় বটে, কিন্তু যোদ্ধাদল প্রাণে মরে না। এখন যেমন লোক ভোট-সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন, ৩ হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রোমকগণ বা গ্রীকরা সাধারণ লোকের সহানুভূতি ক্রয় করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সাধারণ লোকশক্তি বা জনশক্তি যাহাকে পছন্দ করিত তিনি ক্ষমতা চালাইবার অধিকারী হইতেন। রোমকদের রাজত্বকালে তাঁহারা নিজেদের ছাড়া অপর সকলকেই অসভ্য বলিতেন। রোমের বাহিরে

যাহারা বাস করিত, তাহারা যেন সকলেই অসভ্য ছিল। প্রত্যেক বিখ্যাত রোমক-যোদ্ধা এই অসভ্যদের রাজ্য জয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক যোদ্ধাই যদিও অসভ্যদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যা করিতেন, রোমকদিগকে কিন্তু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতেন। এই সন্তুষ্টিসাধনের জন্য রোমের জয়যুক্ত সেনানায়ককেও অনেক অত্যাচার ও অন্যায় সহ্য করিতে হইত। মনের ভিতর যাহাই থাকুক, প্রকাশ্যে রোমীয় জনশক্তিকে কোনরূপেই অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না।

সাধারণ জনশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, রোমীয় কন্সল—প্রধান শাসনকর্ত্তা বা প্রধান বিচারক ট্রিবিউন (রোমের উচ্চকর্ম্মচারী বা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত বিচারকমণ্ডলী) সেনানায়ক সকলেই সেই সকল কার্য্য করিতেন। জনশক্তির মত লইয়া কন্সল, প্রোকন্সল, ট্রিবিউন, এডিলি (তামাসা-প্রদর্শনী, পুলিস-বিভাগ বা সরকারী অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক) এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। রোমীয় জনশক্তির সন্তোষ-বিধানের জন্য কন্সল ও ট্রিবিউনরা যতদূর সম্ভব আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। সিজার ও পম্পির সময়ে কতকগুলি ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

জুলিয়স্ সিজার খৃষ্ট শতাব্দীর এক শত বৎসর পূর্ব্বে জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অতীত কালের মধ্যে তিনি এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক জন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ও সেনানী ছিলেন। তিনি অনেক পুস্তকের গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার লেখনীধারা অতি সুন্দর ছিল এবং লাটিন ভাষায় নির্ভুলভাবে তাঁহার বইগুলি রচিত। জুলিয়স্ সিজার খৃষ্ট শতাব্দীর ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

পম্পি সিজার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ক্ষমতা হিসাবে পম্পি ধীমান, বলবান্, যোদ্ধা ও বিশেষরূপ রাজনীতিকুশল। কেটোও সেই সময়ের এক জন বিশেষরূপ শিক্ষিত লোক এবং শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি যদিও রাজনীতিতে যোগ দিয়াছিলেন, তথাপি রাজনীতির কোন পঙ্কই তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। যাঁহারা রাজনীতিতে নিমজ্জমান, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাদের অতিশয় সমীবদ্ধ। যেমন করিয়াই হউক, রাজনীতিজ্ঞের নিজ কার্য্যসিদ্ধ চাই। যুদ্ধে ও প্রেমে পথাপথে বিচার নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতি-বিশারদের পক্ষেও কিছুই অকর্ত্তব্য নাই, তাঁহাদের নিজ নিজ সুবিধার জন্য সমস্তই তাঁহারা করণীয় বলিয়া মনে করেন। মিথ্যা বলা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ। নিজের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সকল কুকর্ম্ম করিতেই তাঁহারা রাজী। তাঁহারা কুকর্ম্মকে কুকর্ম্ম বলিয়া ধরেন না, কার্য্যসিদ্ধির সোপান বলিয়া মনে করেন। কেটো এই সময়ের লোক হইয়াও ধর্ম্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হইতেন না। তাঁহার বিবেক যাহা বলিত, তিনি তাহাই করিতেন, তাহাতে ভালই হউক, আর মন্দই হউক। রাজনীতিকদের বিবেক নাই বলিলেই চলে। যদি কিছু থাকে, তাঁহাদের সুবিধাবাদের সুবিধার জন্য।

দেশের ও দশের সুবিধার ভাণ করিয়া, রাজনীতিজ্ঞগণ নিজের সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহাদের ষোল আনাই ভণ্ডামী, সব সময়েই উদ্দেশ্য মহৎ—নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া। তাঁহাদের মুখে সব সময়েই শুনিবেন, “দেশের জন্য করিতেছেন, দশের জন্য করিতেছেন”, কিন্তু আসল কথা, যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-সুবিধার জন্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-বিধান তাঁহাদের কোন অসুবিধা করে না। কারণ, তাঁহাদের অনেকেই ঈশ্বর মানেন

না, লোকের সুখ-দুঃখ কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা কেবল ভাবিতেছেন নিজস্ব—আত্ম-সুবিধা। বিবেক বলিয়া তাঁহাদের কাছে কিছু নাই, ঈশ্বর বলিয়া তাঁহাদের নিকট কোন শক্তিই নাই, সর্ব্বদাই তাঁহারা নিজ শক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত, সর্ব্বদাই চিন্তিত, কি করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবেন—শক্তিশালী হইবেন।

৩ হাজার ১ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রতারণা, জুয়াচুরী, মিথ্যবাদ তাঁহাদে অঙ্গের ভূষণ ছিল। হত্যাকার্য্যেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বিবেককে কথায় কথায় তাঁহারা বলিদান দিতেন, আত্মসম্মানকে রাইন্ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিতেন। কেবলমাত্র চিন্তা—কিরূপ করিলে শক্তিমান হইবেন, কিরূপে রোমরাজ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইবেন, কিরূপে সাধারণ লোককে নিজের অধীনে রাখিতে পারিবেন। রাজশক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য কিছুতেই তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না।

পাঠক-পাঠিকাগণ বাল্যকালাবধি শুনিয়া আসিতেছেন, "সিজারের স্ত্রী সন্দেহের বহির্ভূত।" এই প্রবাদটি কত দূর সত্য বা অতিরঞ্জিত বা কিরূপ অবস্থায় বলা হইয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

রোমসূর্য্য যখন আকাশের মধ্যস্থলে উঠিয়াছিল, সেই সময়ে পম্পি, আলেকজান্দার, সিজার ইত্যাদি রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তি রোমের প্রতিভাবান্ কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সে সময়ে রোমে অনেকগুলি দল ছিল, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান দল সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ;— উচ্চবংশীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের দল ও সাধারণ জনগণের দল। এই দুই দলের মধ্যে আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছিল। সে সময়ে রোমীয় সাধারণতন্ত্র অতিশয় ভোগবিলাসী ছিল। যিনি ভোগবিলাসের দ্বারা

জনগণকে তুষ্ট করিতে পারিতেন, জনতন্ত্র-দল তাঁহারই বেশী বাধ্য হইত। সে সময়ে অভিজাতগণে মধ্যে এমন লোক ছিলেম না যে, যাঁহাকে সাধারণ গণতন্ত্রের কৃপা-ভিখারী হইতে হইত না। প্রত্যেক উচ্চ পদাভিলাষী ব্যক্তি সাধারণ গণতন্ত্রকে নিজ পক্ষে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। জনগণের মত না হইলে কোন উচ্চ পদই তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে রাজনীতিবিশারদের প্রধান চেষ্টা, সাধারণ প্রজাতন্ত্রের মনোরঞ্জন করা, যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের খুসী করা, তাহা নাচ, তামাসা, খেলাধূলা, শোভাযাত্রা ও ভোজের দ্বারাই হউক বা উৎকোচের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারাই হউক। কোন এক উচ্চপদপ্রার্থী রোমান জনগণের সন্তোষ-বিধানের আশায় একটি কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সাধারণ লোক আসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া দাঁড়াইল এবং প্রকাশ্যে ও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা সেটি চাহে না। তখন সেই তথাকথিত জননায়ক ভালই হউক বা মন্দই হউক, যাহা সাধারণ লোক চাহে, তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। পম্পি দি গ্রেট, আলেকজান্দার দি গ্রেট, সিজার ইঁহাদের সকলেরই জীবন-চরিত ভাল করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণ লোককে খুসী রাখিবার জন্য এমন কোন কার্য্যই ছিল না, যাহা তাঁহারা করেন নাই। অবশ্য ইহা রোমবাসীদের জন্য, অপর দেশের লোকরা তাঁহাদের নিকট অসভ্য ছিল, চাবুকের আঘাতে—তলোয়ারের খোঁচায় তাহারা বাধ্য থাকিত।

জুলিয়স্ সিজার সম্বন্ধে দুইটি মাত্র ঘটনা এই প্রসঙ্গে বিবৃত করিতেছি। তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে রোমান নাগরিকগণকে খুসী করিবার জন্য তিনি তাঁহার নিজের বিবেককে পদদলিত করিতে

একটুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রোমক ও গ্রীক দুই জাতিতেই দেখা যায়, ভগবানের আশীর্ব্বাদ না লইয়া তাঁহারা কোন কার্য্য করিতেন না। ভগবানের আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা প্রভূতভাবে বলি প্রদান করিতেন এবং সেই বলির প্রসাদে সাধারণ লোককে ভুরিভোজন করাইতেন। অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেন এবং সাধারণ লোককে দেবসমীপে বলির প্রসাদ দিয়া তাহাদের প্রসাদ অর্জ্জন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে আর একটি প্রথা ছিল, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইার পূর্ব্বে দেবতাদের মতামত গ্রহণ করা। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, একেশ্বরবাদী না হইয়া তাঁহারা বহু দেবতার পূজা করিতেন। দেশ হইতে বাহিরে গিয়া, (তাঁহাদের মতে) অসভ্য লোকদিগকে জয় করিয়া, তাঁহারা রোমের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল দেশের লুণ্ঠীত সম্পত্তি দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালীন জননায়করা Oracleএর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না এবং কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে দেবতাদিগকে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট না করিয়া, কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁহারা দেবতাদিগের সাহায্য-ভিখারী ছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, দেবতারা সহায় না হইলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। জননায়করা দুই শক্তিকে সর্ব্বদা খুসী রাখিতে চেষ্টা করিতেন ;— দেবশক্তি ও সাধারণ জনশক্তি।

জুলিয়স্ সিজার রোমক দণ্ডনায়ক নিযুক্ত হয়েন। দণ্ডনায়ক হইয়া অন্য বিষয়ে বিশেষ সুখী হইলেও সাংসারিক বিষয়ে তিনি বিশেষ অসুখী ছিলেন। পাবলিয়স্ ক্লডিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি উচ্চ বংশের সন্তান। বংশ হিসাবে তিনি প্যাট্রিসিয়ান ছিলেন, তাহার উপর তিনি প্রভূত

ধনশালী, বিশিষ্ট বক্তা ; কাযেই বংশমর্য্যাদা হিসাবে, ধনমর্য্যাদা হিসাবে, বক্তৃতাশক্তি হিসাবে তিনি সে সময়ের এক জন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এ তিনটি গুণ থাকিলেও মানুষ ধার্ম্মিক, হৃদয়বান্ ও ন্যায়বান্ হয় না বরং অনেক সময়ে তাহার বিপরীতই হয়।

ক্লডিয়স্ অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। আর সেই সময়ে লম্পটদিগের মধ্যে হঠকারিতায় তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। সিজারের তিনটি বিবাহ হইয়াছিল। পম্পিয়া তাঁহার তৃতীয়া পত্নী। এই নরাধম ক্লডিয়স্ পম্পিয়ার বিশেষ অনুসক্ত ছিল, আর পম্পিয়াও সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু একটি প্রবাদ আছে, স্থান ও সময়ের সুযোগ না হইলে ইচ্ছা অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত করা যায় না। ক্লডিয়সের ইচ্ছা সেইরূপ স্থান ও সময়ের সুযোগ না পাইয়া কার্য্যকরী হয় নাই। সিজারের জননী অরিলিয়া অতিশয় বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি পম্পিয়ার ঘরগুলির উপর বিশেষরূপে পাহারা রাখিতেন ; আর এরূপভাবে সর্ব্বসময়েই পুত্রবধূর প্রতি নজর রাখিতেন যে, পম্পিয়া ও ক্লডিয়সের সাক্ষাৎ হওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেক সময়েই দেশকালপাত্রভেদের উপর ইচ্ছার সাফল্য নির্ভর করে।

ক্লডিয়সের ধন, যৌবন, বংশমর্য্যাদা সকলই ছিল ; তাহার সহিত আবার অপরিমিত সাহস। কোন দুষ্কার্য্যেই সে পশ্চাৎপদ ছিল না। সর্ব্বসময়েই অরিলিয়ার শ্যেন-চক্ষু তাহার আর পম্পিয়ার উপর থাকিলেও সে পম্পিয়ার সহিত গোপনে সাক্ষাতের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করে নাই। ইহার আরও বিশেষ কারণ, পম্পিয়া

রূপজমোহে আকৃষ্ট হইয়া কোন সময়েই ক্লডিয়সের সম্ভাষণ প্রত্যাখ্যান করে নাই।

রোমকদের মধ্যে অনেক দেবদেবী। Bonna তাঁহাদের মধ্যে একটি দেবী। এই Bonnaকে গ্রীকরা Gynaecia, Pbrygius, বা তাঁহাকে Midas এর মাতা নামে অভিহিত করিত। গ্রীকরা বলিত যে, Bonna Bacchusএর মাতা, তাঁহার নাম উচ্চারণ করা উচিত নহে। এই কারণে স্ত্রীলোকেরাই Bonnaএর পূজা করিতেন, তাঁহারা দ্রাক্ষালতা দিয়া তাঁহার তাঁবুটি ঢাকা দিয়া দ্রাক্ষাকুঞ্জে পরিণত করিতেন। ঐ দেবীর পার্শ্বে একটি সাপ রাখা হইত। এই দেবীর পূজায় স্ত্রীলোকদের অধিকার ছিল, কিন্তু পুরুষদের অধিকার ছিল না। এমন কি, পুরুষরা এই পূজার স্থানে যাইতে পারিতেন না এবং বাটীতে পূজা হইত, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে বাটীতে আসিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মধ্যে এই পূজাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। Orphiusএর পূজাতে যে সব পূজাপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্তই Bonnaএর পূজায় ব্যবহৃত হইত। এই উৎসব স্থরু হইলে গৃহস্বামী, যিনি সেই বৎসরের Consul বা Praetor, তিনি নিজে এবং তাঁহার পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিতেন। সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী সেই উৎসবের পূজা-পদ্ধতি নিজের হাতে লইতেন। এই উৎসবের প্রধান ক্রিয়াকলাপগুলি রাত্রিযোগে সাধিত হইত। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মধ্যে রাত্রিজাগরণ করিতেন এবং উৎসবের ক্রিয়াকলাপগুলি যাহাতে নিখুঁতভাবে সাধিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। সমস্ত রাত্রিব্যাপী নানাপ্রকার গীতবাদ্য সকল স্ত্রীলোককে আনন্দে মত্ত রাখিত।

সিজারের তৃতীয়া পত্নী পম্পিয়া এক রাত্রিতে Bonnaএর উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কৌশলী ক্লডিয়স্ এই রাত্রিতে পম্পিয়ার সহিত সাক্ষাতের মতলব করিল। কেবল স্ত্রীলোকেরা সেখানে থাকিবে, এই সুযোগে পম্পিয়ার সহিত স্ত্রীবেশে সাক্ষাৎ করিলে শ্যেনচক্ষু অরিলিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। ক্লডিয়সের তখন পর্য্যন্ত দাড়ি গজায় নাই। অতএব সে মনস্থ করিল যে, নর্ত্তকীর পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেই স্থানে যাইলে কেহই তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এইরূপ মতলব করিয়া ক্লডিয়স্ একটি যুবতীর পোষাক-অলঙ্কার পরিধান করিয়া, স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন নাচ-গান ও উৎসব চলিতেছে, দরজাগুলি সবই খোলা, যে স্ত্রীলোকটি সেই রাত্রির জন্য দ্বাররক্ষক, পূর্ব্ব হইতেই ক্লডিয়স্ তাহাকে হাত করিয়াছিল এবং সে-ও এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিত। সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া পম্পিয়াকে বলিতে গেল, তাহার নাগর আসিয়াছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি প্রত্যাবর্ত্তনে দেরী করিয়াছিল অথবা ক্লডিয়স্ মনে করিতেছিল যে, সে দেরী করিতেছে। এ অবস্থায় নাগরের পক্ষে এক পল এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে নটবর পম্পিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়িল। ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া সে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিতে লাগিল। তখনও পর্য্যন্ত যাহাতে আলোর সম্মুখে না পড়ে সে বিষয়ে ক্লডিয়স্ বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ে ব্যস্ততাই বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় অরিলিয়ার পরিচারিকা তাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকে স্ত্রীলোক মনে করিয়াই তাহার সহিত খেলিবার জন্য অনুরোধ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ উৎসবে

স্ত্রীলোকরাই আপনাদের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ করে; ক্লডিয়সের সমস্ত চিন্তাই পম্পিয়াতে কেন্দ্রীভূত। কাযেই এই স্ত্রীলোকের কথায় সে অস্বীকার করিল। এই পরিচারিকাও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে অমনই তাহাকে টানিয়া লইল, সে কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। পাপী অনেক সময়ে তাহার পাপচিন্তায় নিজেই ধরা দেয়। ক্লডিয়স্ পরিচারিকাকে বলিল, সে পাম্পিয়ার পরিচারিকা Ebraর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। Ebra গ্রীক শব্দ, যাহার অর্থ "প্রিয় পরিচারিকা", আর পম্পিয়ার পরিচারিকার নামও Ebra। যেমন এই কথা বলা, স্ত্রীলোকের পোষাক সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বরেই ক্লডিয়স্ ধরা পড়িয়া গেল। এই কথা শুনিয়া অরিলিয়ার পরিচারিকা যেখানে উজ্জ্বল আলোর নিম্নে অনেক স্ত্রীলোক ছিল, সেইখানে দৌড়িয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ভগিনীগণ, আমাদের মধ্যে আমি এক জন পুরুষমানুষকে চিনিতে পারিয়াছি।" সকল স্ত্রীলোকই অতিশয় ভীত হইল। অরিলিয়া পূজার সমস্ত পবিত্র জিনিকে ঢাকিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাদের উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হুকুম দিলেন এবং আলো লইয়া ক্লডিয়সকে খুঁজিতে লাগিলেন। পরিচারিকার যে ঘরের ভিতর দিয়া ক্লডিয়স আসিয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যেই সে ধৃত হইল। স্ত্রীলোকরা অনেকেই তাহাকে চিনিতেন এবং তাহাকে বাটীর দরজার বাহির করিয়া দিলেন, সেই রাত্রিতেই তাঁহারা নিজ নিজ স্বামীকে রাত্রির ঘটনার কথা বিদিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে সেই ঘটনাটি সকলের নিকটেই প্রচারিত হইল। ক্লডিয়স কিরূপ অবৈধ, নীচ, অন্যায় কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং কিরূপভাবে তাহার সাজা হওয়া উচিত, সকলেই এই কথা লইয়া ব্যস্ত হইলেন। সে যে শুধু

স্ত্রীলোকদিগকে অপমানিত করিয়াছে, তাহা নহে, সাধারণ জনশক্তিকে ও দেবতাকে অপমান করিয়াছে! এই সমস্ত উত্তেজনার ফলে এক জন Tribune (উচ্চ রাজকর্ম্মচারী) ধর্ম্মবিষয়ে অন্যায় ব্যবহারের জন্য নালিস রুজু করিলেন, আর অনেকগুলি প্রধান প্রধান সেনেটর একমত হইয়া তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল যে, সে অনেক লোমহর্ষণ পাপাচারণ করিয়াছে, এমন কি, তাহার এক সহোদরা—লুকুলাসের সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার সহিতও কুকার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। উচ্চবংশীয় রোমীয়রা, যাঁহাদের স্ত্রীলোকের প্রতি ক্লডিয়স্ অনেক প্রকার পাপাচরণ করিতেছিল বা পাপাচরণে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাঁহারা সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু সাধারণ জনশক্তি ক্লডিয়সের পক্ষে দাঁড়াইয়া গেল। কারণ, ক্লডিয়স্ থিয়েটার, নাচ, ভোজ, দেবার্চ্চনার দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। বিচারকদল যখন দেখিলেন, সাধারণ জনশক্তি তাহার পক্ষালম্বন করিতেছে, তখন ভীত হইলেন। লোকদিগকে উপেক্ষা করিবার সাহস তাঁহাদের হইল না। জজেরা ভীত হইলেন, এই লোকারণ্যকে উত্তেজিত করিবার সাহস পাইলেন না। পম্পিয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য সেই আদালতে উপস্থিত থাকিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সিজার জনসঙ্ঘের এই মনোভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ক্লডিয়সের বিপক্ষে তাঁহার কোন নালিস নাই।" ইহা স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া অনুভূতি হওয়ায়, যিনি নালিস রুজু করিয়াছিলেন, তিনি সিজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাটীতে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছেন?" শুনিয়া সিজার বলিয়া উঠিলেন, "I wish my wife not so much as suspected." সিজারের গৃহলক্ষ্মী সন্দেহের বহির্ভূত।

অনেকেই বুঝিতে পারিলেন, সাধারণ জনশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সিজার এই কথা বলিয়াছেন তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, জনশক্তি ক্লডিয়সকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। ক্লডিয়স্ মুক্তি পাইল।

জনশক্তি সে সময়ে এরূপ প্রভূত বলশালী ছিল যে, বিচারকরা এরূপ ভাবে হিজি-বিজি কাটিয়া তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কি লিখিয়াছেন, তাহা পড়া বা বুঝা যায় না। যদি তাঁহারা ক্লডিয়সকে দোষী সাবাস্ত করিতেন, তাহা হইলে জনশক্তি চটিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধ হইত, আর যদি ক্লডিয়সকে ছাড়িয়া দিবার রায় দিতেন, তাহা হইলে অভিজাত-সম্প্রদায়কে অপমান করা হইত।

পম্পি দি গ্রেটের উপর দৃঢ়তর আধিপত্য রাখিবার জন্য সিজার তাঁহার কন্যা জুলিয়সের সহিত পম্পির বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই জুলিয়সের সহিত সারভিলিয়াস্ কেপিয়র বিবাহ স্থির হইয়াছিল; কথাবার্ত্তা সমস্তই ঠিক। সিজার কেপিয়কে বলিলেন যে, তাহাকে পম্পির কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে, কিন্তু পম্পির কন্যা পূর্ব্ব হইতেই বাগ্দত্তা ছিলেন। সিলার পুত্র ফেনটাসের সহিত পম্পির কন্যার বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছিল। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই বিবাহগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সিজার নিজেও কিছু দিন পরে ফিসোর কন্যা কেপারনিয়াকে বিবাহ করিলেন, আর তাহার পর-বৎসরের জন্য ফিসোকে কন্সল করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত দেখিয়া কেটো ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, এইসব বিবাহ দ্বারা রাজত্ব পরিচালন করা অতিশয় হেয় ও অন্যায় কার্য্য।

তিনি উচ্চৈঃস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শাসনব্যাপারে এইরূপ ব্যভিচারের সৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা রমণীর সহায়তায় পরস্পরের মতলব হাঁসিলের সুবিধা করিয়া লইতেছেন। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যেই সেনা-পরিচালন, দেশশাসন এবং অপরাপর রাজকার্য্যের আয়ত্তসাধন করিয়া লইবেন।

এই সময়ে রোমে যে কোন লোক ক্ষমতার প্রার্থী থাকিতেন, তাঁহাকে সর্ব্বরকমে রোমক নাগরিকগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইত। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। রোমে বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুর পর সৎকারের পূর্ব্বে তাঁহার গুণগান করিয়া বক্তৃতা দিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল না। কিন্তু সিজার তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুতে এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা দেখাইয়া তিনি সাধারণ লোকের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। জনসাধারণ সকলেই দেখিল যে, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রেমময় এবং কোমল। তাঁহার স্ত্রীর সৎকারের পর তিনি ভেটাস্ নামে এক জন Praetorএর অধীনে Quaestorরূপে স্পেনে গিয়াছিলেন। এই ভেটাসকে তিনি বিশেষ মান্য করিতেন এবং যখন তিনি নিজে Praetor হইয়াছিলেন, তখন ভেটাসের পুত্রকে নিজের Quaestor করিয়াছিলেন! স্পেন-রাজ্যে Quaestorএর কার্য্য শেষ করিয়া তিনি পম্পিয়াকে বিবাহ করেন। কর্ণেলিয়া তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা। তাহাকে তিনি পম্পি দি গ্রেটের সহিত বিবাহ দেন। অর্থব্যয়ে তিনি এতদূর মুক্তহস্ত ছিলেন যে, সরকারী কোন কার্য্য পাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার

১৩০০ Talent দেনা হইয়াছিল। এই অর্থব্যয়ে তিনি লোকসাধারণকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সিজার সাধারণ লোকদিগের ভালবাসা আকৃষ্ট করিবার জন্য সামান্য খরচে নিজের জন্য অনেক সুবিধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Appian Way Surveyor নিযুক্ত হইবার পর, তিনি শুধু রাজকোষের অর্থব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার নিজ তহবিল হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

সিজার যখন Aedile নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অনেকগুলি Gladiator (যোদ্ধা) রাখিয়াছিলেন। এই Gladiatorরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া এক জন অপর জনকে হত্যা করিতে এবং ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, হয় তাহাদের নিজ প্রাণ হারাইত, না হয় পশুদিগকে হত্যা করিত। রোমক নাগরিকগণ এই সব লড়াই দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইত। লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সিজার ৩ শত ২০টি Gladiator রাখিয়া লড়াই দেখাইয়াছিলেন। আর থিয়েটার, শোভাযাত্রা, সাধারণকে ভোজ দিয়াও অর্থব্যয় করিয়া সিজার লোকদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উচ্চ রাজপদপ্রার্থীরা যত কিছু খরচ করিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিয়া সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ফলে, লোক তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিত, তাঁহার জন্য নূতন কি রাজপদ দেওয়া যাইতে পারে, কিরূপে তাঁহার প্রতি নূতন নূতন মান্য দেখান যায়। প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি জনশক্তিকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁহার জন্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সকল কার্য্য করিতেই রাজি ছিল। কিসে তাঁহার অধিক অর্থাগম হয়,

তাহার জন্য সকলেই ব্যস্ত ছিল। তথাপি দুই পাঁচ জন লোক সেনেটে সিজারের বিপক্ষে বর্ক্তৃতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং বর্ক্তৃতা করিয়াছিলেন। ক্যাটুলাস লুটাটস্ সেই সময়ে রোমানদের মধ্যে এক জন প্রধান লোক—তিনি এক দিন সেনেটে দাঁড়াইয়া সিজারের বিপক্ষে বর্ক্তৃতা করিলেন—সিজারকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিলেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহার বর্ক্তৃতা শেষ করিলেন, 'সিজার কেবল যে খনি খুঁড়িতেছেন, তাহা নয়, তিনি রোমরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ব্যাটারী প্রোথিত করিতেছেন'।

কেটো এক জন মনীষী ও বক্তা। তিনি সত্য বলিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। মনের আবেগে প্রাণ খুলিয়া সকল কথাই বলিতেন। তাঁহার বর্ক্তৃতার ফল কি হইবে, কখনই ভাবিতেন না। যদিও তিনি সাধারণ জনশক্তিকে ভোজ দিয়া নিজের দল আকৃষ্ট করেন নাই, তথাপি সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট থাকিত। উচ্চ রাজপদ কিম্বা প্রভূত অর্থ ঘুষ দিয়া কেহ তাঁহাকে তাহাদের নিজ নিজ দলে টানিতে পারে নাই। তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন, তাহার জন্য প্রাণপাত করিয়া কার্য্য করিতেন। যখন সীজার খুব প্রতাপশালী, কেটো দেখিলেন, গরীব রোমক নাগরিকরা সকলেই সিজারের উপর তাহাদের আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছে। কেটো জানিতেন যে, লোক ক্ষেপাইতে হইলে গরীব নাগরিকরাই প্রথম অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রদান করে। সিজারের হস্ত হইতে রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে লোকদিগকে সিজারের আন্তরিক অভিসন্ধি কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, সেই কারণে সেনেটকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া রাজী করিলেন যে, মাসে মাসে প্রত্যেক নাগরিককে কতক পরিমাণে শস্য দান করিতে হইবে। এই

সাহায্যের জন্য রোম-রাজ্যকে প্রত্যেক বৎসরে ৭০ লক্ষ ৫ হাজার Drachmas খরচ করিতে হইবে। তাহা হইলে সে অবস্থায় তৎ-সাময়িক বিপদ হইতে রাজত্বকে রক্ষা করা হইবে এবং সিজারের ক্ষমতাকেও খর্ব্ব করা যাইবে।

আর এক সময়ে সিজারের সহকর্ম্মী বিবুউলস্ দেখিলেন যে, আইনের বিরুদ্ধবাদী হইয়া কোন ফল নাই। তাঁহার এবং কেটোর দুই জনেরই জনসাধারণের মিলনস্থানে নিহত হইবার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা প্রবল। তখন তিনি তাঁহার কন্সলগিরির শেষ সময়টুকু নিজের বাড়ীর মধ্যে অতিবাহিত করিলেন। পম্পির বিবাহের পরেই সাধারণ রাজকার্য্য ও বিচারের স্থান সৈন্যসামন্তেরা ছাইয়া ফেলিল এবং জনসাধারণের নূতন আইনের প্রচলনে সহায় হইল। সিজার আল্প্সের দুই দিকে ইলিক্রিয়মের সহিত গলের সমস্ত রাজ্য এবং চারিটি সৈন্যদলের প্রভুত্ব পাঁচ বৎসরের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। কেটো এই সকল কার্য্যে বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সিজার তাঁহাকে পথিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেন এবং গ্রেপ্তার করিয়াই কারাগারে পাঠাইয় দেন। সিজার মনে করিয়াছিলেন যে, কেটো (Tribune) সাধারণের নির্ব্বাচিত জনমণ্ডলীতে আপীল করিবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, কেটো কোন কথা না বলিয়া নীরবেই কারাগারে চলিয়া গেলেন; তাহাতে সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী ক্ষুব্ধ হইলেন—জনসাধারণও কেটোর ধর্ম্মনিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া, মাথা নত করিয়া নিঃশব্দে শ্রদ্ধাভরে ও অবসন্নমনে তাঁহার অনুগামী হইল, তখন সিজার নিজেই, কেটোর উদ্ধার-সাধনের জন্য এক জন ট্রিবিউনের নিকট গোপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য সেনেটরদের মধ্যে কেহ কেহ পৌরপরিষদে

যোগদান করিলেন, অবশিষ্ট কয়েক জন বিরক্ত হইয়া সেনেটে অনুপস্থিত রহিলেন। ক্ল্যাসিডিয়াস্ নামে এক বৃদ্ধ সুবিধামত এক দিন সিজারকে বলিলেন যে, "পৌরপরিষদগণ উপস্থিত না হওয়ার কারণ তাঁহারা সৈন্যগণের জন্য বিশেষ ভীত।" এই কথা শুনিয়া সিজার বলিলেন, "বেশ, যদি সৈন্যগণই সভ্যগণের অনুপস্থিতির কারণ, তখন আপনিই বা সেই ভয়ে ঘরের ভিতর না থাকিয়া বাহিরে আসেন কেন?" ক্ল্যাসিডিয়াস্ সিজারের এই কথার উত্তরে বলিলেন যে, "তাঁহার পরিণত বয়সই ভীতির বিপক্ষে তাঁহার প্রহরিস্বরূপ কার্য্য করিতেছে, তিনি আর ক'দিনই বা বাঁচিবেন, এই জন্য তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে বিশেষ সাবধান হইবার কিছু কারণ নাই। যে ক্লডিয়াস্ এক দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সতীত্বকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং চুপি চুপি নিঃশব্দে নৈশ উপাসিকাদিগের নিকট অনাহূতভাবে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই ট্রিবিউন পদ-প্রাপ্তির সহায়তা করা সিজারের কন্সলগিরি সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কর্ম্ম। সিসিরোর অবনতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে ক্লডিয়সকে এই কার্য্যে মনোনীত করা হইয়াছিল। সিজার যত দিন না সিসিরোকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি রোমনগরী ত্যাগ করিয়া নিজের সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে গমন করেন নাই।

সিজার তাঁহার Praetorship শেষ হইলে পর Province of Spainএ অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উত্তমর্ণরা তাঁহাকে অতিশত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, যখন তিনি স্পেনে যাইবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা জোর তাগাদা করিতে লাগিল এবং অতিশয় নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। সেই সময় রোমে ক্রেসাস্ নামে এক জন ধনী লোক ছিলেন। তিনি রোমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী; পম্পির

বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্য সিজারের ন্যায় এক জন যুবককে দলে লইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিসাস্ উত্তমর্ণদিগকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাকে আট শত ত্রিশ Talent দিতে হইল। এই দেনা পরিশোধ করিলেই সিজারের স্পেন প্রভিন্সে যাইবার কোন বাধা রহিল না।

পথিমধ্যে যখন তিনি আল্পস্ পার হইতেছিলেন এবং অসভ্যদিগের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন যে, কয়জন মাত্র লোক সেই গ্রামে বাস করে, আর সকলেই অতি দরিদ্র। বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহার সহগামীরা নিজেদের মধ্যে এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল, "এই ক্ষুদ্র গ্রামেও কি রাজকার্যে উচ্চপদের জন্য লোক ঘুরিয়া বেড়ায়? এখানেও কি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া মরে?" এই কথা শুনিয়া সিজার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি এই সব অসভ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে পারিলে, সুসভ্য রোমের দ্বিতীয় লোক হইতে চাহি না।"

এক দিন স্পেনে সিজার কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না মনঃসংযোগ করিয়া আলেক্জাণ্ডারের ইতিহাস পড়িতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাঠের পর, তিনি বিশেষ ভাবাম্বিত হইয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বন্ধুরা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এরূপ কাঁদিবার কারণ কি?" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি মনে কর, আমার কাঁদিবার বিশেষ কারণ নাই? আলেকজাণ্ডার আমার বয়সে কত জাতিকে জয় করিয়াছিলেন, আর আমি, ভবিষ্যতে লোকের স্মরণ থাকিবে, এমন কোন কার্য্য করিতে পারি নাই।"

গার্ল্টে অনেকগুলি যুদ্ধ জয় করিবার পর, রোমে তাঁহার সুনাম ও ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে কেহ উচ্চপদপ্রার্থী ছিল, সকলেই তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিত, তিনি আপনার নিকট হইতে পদপ্রার্থিগণেকে টাকা দিয়া সাধারণ লোকদিগকে দূষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অর্থেই জনশক্তির ভোট ক্রয় করা হইয়াছিল। যখন পদপ্রার্থীরা তাঁহার সাহায্যে ও অর্থে নির্ব্বাচিত হইত, তাহারাও সিজারের উন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই করিত। এইভাবে তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন যে, রোমের বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। লাক্কা, পম্পি, ক্রিসাস্, এপিয়াস্, সেডিনিয়ার নেপাসের শাসনকর্ত্তা, স্পেনের প্রো-কন্‌সাল সকলেই তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। তাঁহার বাটীতে এক সময় বহুসংখক Senator ও Lictors সমবেত হইয়াছিলেন। একটি মন্ত্রণা-সভায় ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, পম্পি ও ক্রিসাস্ পরবৎসরেও Consul নিযুক্ত হইবেন, সিজারকে আরও অধিক টাকা দেওয়া হইবে, আরও ৫ বৎসরের জন্য তিনি সেনানায়ক থাকিবেন। যে সকল লোককে তিনি টাকা দিয়া বশ করিয়াছিলেন, তাহারাই সিজারকে আরও অধিক টাকা দিবার জন্য সেনেটকে অনুরোধ করিলেন, সমস্ত চিন্তাশীল মনীষী এইরূপ অর্থদান অমিতব্যয় বলিয়া মনে করিলেন। সেনেট যে এইরূপ টাকা দিল, তাহা লোকের অনুরোধে নহে, সিজারের নিকট বাধ্য থাকিয়া, দুঃখে ও মর্ম্মবেদনায় প্রপীড়িত হইয়াই এই সর্ত্তের স্বপক্ষে মত দিল।

কেটো সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না ;—সিজারের দল সময়মত তাঁহাকে রোম হইতে সাইপ্রাসে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফেভোরিয়াস্

প্রাণপণে কেটোর অনুকরণ করিত। যখন তিনি দেখিলেন যে, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না, তখন ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং বাহিরে আসিয়া লোকসমূহকে বলিতে লাগিলেন, 'সেনেটে কি অন্যায় কার্য্য হইতেছে'; কিন্তু কে তাঁহার কথা শুনে? সকলেই কন্সলকে খুসী করিবার জন্য ব্যস্ত। কারণ, সিজার খুসী ল তাহাদের নিজ নিজ আশা ফলবতী হইবে।

গ্যালিক যুদ্ধগুলি সিজার ক্রীডাভূমি করিয়া, নিজের এবং সৈন্যদিগের ক্ষমতার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাহার বিজয়গৌরবে তিনি আরও উন্নত হইয়াছিলেন। পম্পির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত ক্ষমতা যে তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা সিজার বেশ বুঝিয়াছিলেন। রোমের অরাজকতা,—উচ্চরাজকীয় পদপ্রার্থীদের প্রকাশ্যভাবে রোমক নাগরিকদিগকে উৎকোচ প্রদানে নিপুণতা,—তাহাদের প্রসাদলাভের আশায় নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে অর্থদান,—বিশেষতঃ পম্পির নিজের ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যেকটিরই তিনি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নাগরিকরা উৎকোচস্বরূপ অর্থ পাইয়া তাঁহাদের উপকারার্থে শুধু ভোট দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তীর-তরোয়ালের আঘাতও দিয়াছিল। উচ্চরাজকর্ম্মচারীদের নির্ব্বাচনস্থানে অনেক লোক খুন হইত এবং সাধারণ নির্ব্বাচনস্থান রক্তে প্লাবিত হইয়া যাইত, রোম নগরে যেন কোনরূপ শাসনতন্ত্র ছিল না। রোম-শাসনতরী হালবিহীন ও কাণ্ডারীবিহীন অবস্থায় যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছিল, এরূপ সাধারণতন্ত্র অপেক্ষা একেশ্বর রাজার রাজত্ব অনেক ভাল।

সিজার সুবিধামত তাঁহার অধীনের লোকদিগকে নির্ব্বাচনস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। সেনেটে কি হইতেছে, কি না হইতেছে, তাহারও তত্ত্ব লইতেন। Forumএ সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার লোক ঘুরিত। যখন তিনি রোমের বাহিরে থাকিতেন, তাঁহার অধীনস্থ লোকরা রোমে থাকিয়া তত্ত্ব লইতেন। এক দিবস তাঁহার এক জন সেনা-নায়ক রোমের সেনেট ভবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, সেনেট সিজারকে অধিক দিন রাজকার্য্য চালাইবার সময় দিবেন না। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার কটিবিলম্বিত তরবারি চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু এইটি (খড়্গ) তাঁহাকে সময় দিবে।"

সিজার মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা করিতেন না এবং করিবার চেষ্টাও করিতেন না; কিন্তু প্রায় বলিতেন, মিষ্ট কথা বলার কোন ক্ষতি নাই, মিষ্ট কথাতে তাঁহার কোন কার্য্যেরই ব্যাঘাত হইবে না। এক সময় সিজার যখন সাধারণ অর্থকোষ হইতে টাকা লইবার মনন করিয়াছিলেন, তৎকালীন ট্রিবিউন মেট্লাস্ তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার ইচ্ছায় কতকগুলি আইন তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সিজার বলিয়া উঠিলেন, "আইন আর অস্ত্র, দুইটিরই পৃথক্ পৃথক সময় আছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহা যদি তোমার ভাল না লাগে, তুমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পার, যুদ্ধের সময় স্পষ্ট কথার সময় নয়। যখন আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিব, শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিব এবং যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ বক্তৃতা করিব।" তিনি আরও বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি বলিতেছি, তুমি, তোমরা এবং অপরাপর সকলে, যাহারা আমার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলে

এবং এখনও যাহারা আমার বিপক্ষে আছ, এক্ষণে সকলেই আমার ক্ষমতার অধীনে, এখন আমার যেমন ইচ্ছা, তোমাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারি।” মেট্‌লাস্‌কে এই সব কথা বলিয়া তিনি রাজকোষ-ভাণ্ডারে গমন করিলেন; কিন্তু ভাণ্ডারের চাবি পাইলেন না, দরজা ভাঙ্গাইবার জন্য কামারকে ডাকাইলেন। মেট্‌লাস্‌ পুনরায় বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, অপর কয় জনও মেট্‌লাস্‌কে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া সিজার আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “সে যদি তাঁহাকে আরও বাধা দেয়, তিনি তাহাকে বধ করিবেন।” মেট্‌লাস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “যুবক, তুমি বেশ জানো, এই কথা বলিতে যত কষ্ট, কার্য্যে পরিণত করিতে তত কষ্ট নয়।” এই সব শুনিয়া মেট্‌লাস্‌ ভয়ে সরিয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে সিজার মেট্‌লাস্‌কে যাহা কিছু হুকুম দিতেন, মেট্‌লাস্‌ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই সম্পাদন করিত।

এই সব ঘটনা যে সময়ে ঘটিয়াছিল, সেই সময় হইতে আজ ৩ হাজার বৎসরের অধিককাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু উচ্চপদাভিলাষীদের উচ্চপদ পাইবার পথ কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?

নবম কথা

"তিন টাকা দশ আনার মামলা!"

বর্ত্তমান কলিকাতা সহর পূর্ব্বে যখন একটি প্রকাণ্ড হোগলাবন ছিল, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বসাক-বংশ কলিকাতার বহু স্থানের মালিক ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জমিদার ও ব্যবসাদার ছিলেন। বসাকরা কলিকাতার আদিম নিবাসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাদ আছে, এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম অবস্থিত, সেই সমস্ত স্থান হোগলাবনে পরিপূর্ণ ছিল এবং বসাকরাই এই স্থানের অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন। এখনও কলিকাতার অনেকগুলি স্থান বসাকদের নামে আখ্যাত আছে। কলুটোলার শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট চোরবাগানে বসাক লেন, অধুনা যে স্থান Marcus square নামে অভিহিত, সেই স্থানটিকে পূর্ব্বে লোক "বসাকদীঘি" বলিয়া জানিত। বৈষ্ণবচন্দ্র শেঠ ষ্ট্রীট, রাম শেঠ রোড, আহিরীটোলায় বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট ইত্যাদি আখ্যাত স্থানগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তি বসাক মহোদয়গণের সম্পত্তি ছিল। শুধু যে তাঁহারা ধনী ও জমিদার ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে অনেকগুলি শিক্ষিত লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সময়ের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টারের মধ্যে বড়বাজার-নিবাসী বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় অন্যতম। শুনা যায়, গৌরদাস এক জন প্রথিতনামা ডেপুটী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অনেক স্থানে বিশেষ যোগ্যতার সহিত

কার্য্য করিয়াছিলেন। বসাক মহাশয়ের যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক এখনও জীবিত আছেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়া অনেক লোকহিতর কার্য্য করিয়াছিলেন। অশীতি-উর্দ্ধ বয়সে তিনি এখনও কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর, ইণ্ডিয়ান কমিটীর মেম্বাররূপে জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন। জোড়াসাঁকোর রাজবাটী ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর ইণ্ডিয়ান কমিটীর কেন্দ্রস্থান। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আতিথ্যে তাঁহার বাটীতেই কমিটীমিটিংগুলি হয়। প্রত্যেক কমিটী-মিটিংয়ে লালবিহারী বাবুকে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কমিটী-মিটিংয়ের কার্য্যে যোগদান করেন।

প্রথমকালীন ডেপুটীদের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র কর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ কর, দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ কর, দুই ভ্রাতাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তৃতীয় পুত্র খ্যাতনামা এটর্ণী শ্রীযুক্ত প্রমথচন্দ্র কর, যাঁহাকে অধিকাংশ লোকই পল্টুবাবু বলিয়া জানেন। তাঁহার এক কন্যা রাজা দিগম্বর মিত্রের অন্যতম বংশধর ৺যুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী।

রাম শেঠ মহাশয় কলিকাতা বাঁশতলা-নিবাসী ছিলেন। তাঁহারই পৌত্র স্বনামধন্য এটর্ণী রায় বাহাদুর স্বর্গীয় নলিনীচন্দ্র শেঠ। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে অনেকদিন ধরিয়া কমিশনারী করিয়াছিলেন এবং শেষবয়সে কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বার হইয়াছিলেন। সর্ব্বভুল বসাক এই বসাকবংশেরই এক জন।

কলিকাতা সিমলাবাজার বলিয়া বেথুন কলেজের নিকটবর্ত্তী স্থানে

একটি বাজার ছিল। সে বাজারটি এখন আর নাই। আমার স্মরণ হয়, আমি এই বাজারে বাল্যকালে বাজার করিয়াছি। চুঁচুড়া-নিবাসী স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে কলিকাতায় আর একটি বাজার ছিল, সেটিও এখন আর নাই। সেই বাজারের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যে "আশুতোষ বিল্ডিং" হইয়াছে, সেই বিল্ডিংটি পূর্ব্বতন "মাধব বাবুর বাজার" যেখানে ছিল, তাহার উপর স্থাপিত। মাধব বাবুর পৌত্র শ্রীযুত হেমচন্দ্র দত্ত; তিনি ধনবান্, অধুনা কলিকাতার কলুটোলায় বাস করিতেছেন। পূর্ব্বকথিত সিমলা বাজারের নিকটেই সর্ব্বভুল বসাকের ষ্টেশনারী দোকান ছিল।

কলিকাতা জেলেটোলা-নিবাসী রামনিরঞ্জন আঢ্য মহাশয় ডাক্তারী পেশা করিতেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র সদানন্দ আঢ্য। যে বাটীতে সর্ব্বভুল বসাকের দোকান ছিল, তাহারই এক অংশে সদানন্দ আঢ্যের ষ্টেশনারী দোকান ছিল। এই দুই জনে এক জমিদারের প্রজা। দুই জনের ষ্টেশনারী দোকান-ঘরের ব্যবধান মাত্র একটি কাঠের বেড়া। এই ঘরে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স লাগিত ৭ টাকা ৪ আনা। সর্ব্বভুল বসাক ও সদানন্দ আঢ্য প্রত্যেকে ৩ টাকা ১০ আনা হিসাবে 'অকুপায়ার সেয়ারের ট্যাক্স' দিতেন। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্স না দিয়া, এক জনে অপরকে ট্যাক্স দিতেন এবং তিনি ৭ টাকা ৪ আনা একত্র করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে দিতেন। প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, মানুষকে ভুতে বা পেত্নীতে পাইয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল দুষ্টবুদ্ধি মানুষকে অধিকার করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য। দুষ্টবুদ্ধি যখন মানুষকে অধিকার করে, তখন অনেকরূপেই তাহার অধঃপতন সংঘটিত হয়। সময়ে সময়ে মানুষকে মামলায় পায়, ইহা দুষ্টবুদ্ধি অধিকারের নামান্তরমাত্র।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা মামলাবাজ। মামলা-মোকর্দ্দমা করা তাহাদের বিশেষ আনন্দ উপভোগের উপায়। এক সময়ে হ্যালিডে ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা ছিল, যাহার উপর দিয়া এখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ গিয়াছে। ইহা মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি বড় বড় বস্তি ছিল। এই বস্তিতে অনেক শ্রমজীবী মুসলমান-পরিবার বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত, নিরক্ষর এবং উদ্ধতস্বভাব। আমি যখন ফৌজদারী আদালতে প্রথম ওকালতী আরম্ভ করি, তখন এই মহল্লায় আমার বিশেষ পসার ছিল। আমি দেখিয়াছি, যেমন মানুষ অনেক সময়ে যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি দেখিয়া আনন্দিত হয়, এবং উদ্‌বৃত্ত অর্থ ব্যয় করে, এই স্থানের লোকেরা অনেকে মোকর্দ্দমা করিয়া সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিত। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ উদ্‌বৃত্ত হইলে তাহারা প্রতিবেশীর নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিত এবং তাহাদের হস্তে যত দিন উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকিত, তত দিন মোকর্দ্দমা চালাইত। যখন উদ্‌বৃত্ত অর্থ নিঃশেষিত হইত, তখন চলতি মোকর্দ্দমাটি ধামা-চাপা দিত। ফরিয়াদী আদালতে আসিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামীকে বলিত "আর আমার অর্থ নাই, অতএব এ মোকর্দ্দমা এই পর্য্যন্ত, যা, তুই বেঁচে গেলি" এই বলিয়া এই অবস্থায় মামলা ছাড়িয়া দিত, আবার কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে পুনরায় নূতন অজুহাতে মামলা সুরু করিয়া দিত।

সময়ে সময়ে তাহাদের যেমন মামলায় পাইত, সর্ব্বভুল বসাককেও সেইরূপ মামলায় পাইয়াছিল। মামলার নেশা তাঁহাকে সেইরূপ অধিকার করিয়াছিল। এক দিন সেই নেশায় অধীর হইয়া সর্ব্বভুল বসাক সদানন্দ আঢ্যের নামে মামলা রুজু করিয়া দিলেন। মামলা

৩ টাকা ১০ আনার, তাহার বিবরণ এইরূপ,—সর্ব্বভুল বসাক তাঁহার অংশের ট্যাক্সের ৩ টাকা ১০ আনা মিউনিসিপ্যালিটীতে জমা দিবার জন্য সদানন্দের হাতে দিয়াছিলেন, তিনি তাহা জমা না দিয়া সেই টাকাটি আত্মসাৎ করিয়াছেন।

মামলাটি খুব জোরে রুজু হইল। এই ৩ টাকা ১০ আনার জন্য লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এটর্ণী মিঃ ম্যানুয়েল ও সরকারী উকিল মিঃ জে, টি, হিউম নিযুক্ত হইলেন। মিঃ ম্যানুয়েলের ফি দৈনিক ৫১ টাকা ও তাঁহার মুন্সীর তহুরি ২ টাকা, এবং হিউমের দৈনিক ফি ৩৪ টাকা ও তাঁহার আরদালির তহুরি ১ টাকা। ষ্ট্যাম্প ও আদালতের অন্য খরচ ব্যতীত এই ৮৮ টাকা খরচ করিয়া ৩ টাকা ১০ আনার মামলা রুজু হইল। সর্ব্বভুল বসাকের একখানি টমটম গাড়ী ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধব সহ টমটম গাড়ী চড়িয়া লালবাজার পুলিস-আদালতে আসিয়া মামলা রুজু করিলেন। সে সময়ে লালবাজারে একটিমাত্র পুলিস-আদালত ছিল। এখন যেখানে কন্‌ষ্টেবল ও হেডকন্‌ষ্টেবলদের বাসস্থান হইয়াছে, পুলিস-কমিশনারের অফিসের পূর্ব্বাংশে চিৎপুর রোডের দিকে তখন পুলিস-আদালত স্থাপিত ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ ম্যানুয়েল ও মিঃ হিউম কর্ত্তৃক দরখাস্ত দাখিলের ফলে আসামীর নামে সমন দিলেন।

যে সময়ে সর্ব্বভুল মহাশয় মামলাটি রুজু করিলেন, সে সময়ে তাঁহার চলতি ষ্টেশনারী দোকানের তিনি ষোল আনা মালিক, বসতবাটীর অর্দ্ধেক অংশীদার ও সুন্দর ঘোড়াযুক্ত একখানি টমটমের মালিক। তিনি সন্ধ্যা ৬টা অবধি দোকান করিতেন, তাহার পর তাঁহার এক কর্ম্মচারীর হস্তে দোকানের ভার দিয়া টমটমে চড়িয়া বেশ সাজিয়া গুজিয়া সহর-ভ্রমণে বাহির হইতেন। চলতি দোকানে বেশ আয়

ছিল। যে বাটীতে বাস করিতেন, তাহা ভাল লাগিত না, তাই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাজিয়া গুজিয়া টমটম আরোহণে বিশেষ আনন্দের সহিত কলিকাতা সহর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন দুঃখই ছিল না। বেশ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মামলা রুজুর দিন পর্য্যন্ত তিনি মহা আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

সদানন্দও মহা আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার রোজগারি পিতা ডাক্তারী পেশায় বেশ দুপয়সা রোজগার ও সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার নিজের বসতবাটী ছিল। সদানন্দ এই ডাক্তার পিতার পুত্র হইয়া সংসারের সকল ভার তাঁহার উপর অর্পন করিয়া, দোকান হইতে যাহা আয় হইত, তাহাতেই মনের আনন্দে নিজের সুখ-শান্তির জন্য হাত-খরচা করিতেন।

যে দিন সর্ব্বভুল বসাক মামলা রুজু করিলেন, সেই দিন কালী-ঘাটে গিয়া; মহা উল্লাসে বন্ধু-বান্ধবদের একটি ভোজ দিলেন, ষোড়শোপচারে মা কালীর পূজা দিলেন। কারণ, বিপক্ষের নামে সমন বাহির হইয়াছে। তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা বলিল, সর্ব্বভুলের ন্যায় খোসমেজাজী লোক আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা বড়ই আনন্দিত, অবশ্য খরচ সর্ব্বভুলের। তাহার পরদিনই বেশী খরচ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর হইতে সমন বাহির করাইলেন এবং দরখাস্ত করিলেন, অপর পক্ষ হইতে অত্যাচারের আশঙ্কা আছে, এই জন্য এক জন ইউরোপীয় সার্ভিং পুলিস অফিসারকে সঙ্গে লইলেন। এক দল ব্যাণ্ড, ইউরোপীয় সার্ভিং অফিসার ও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বনিরঞ্জনের বাটী গিয়া সমন জারি করাইলেন। সর্ব্বনিরঞ্জন পুত্রের নামে সমন পাইয়া একেবারে অধীর ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ডাক্তারী করেন,

রোগী দেখিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, মিতব্যয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করেন ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। সমন পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ একেবারেই অধীর হইলেন।

আজকালকার ভোট-যুদ্ধের দিনে ভোট রেকর্ডের এক মাস পুর্ব্ব হইতে যেমন অনেক অনাত্মীয়ই আত্মীয় হইয়া ভোট-প্রার্থনাকারীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে, সেইরূপ এই মোকর্দ্দমা রুজু হইলে ও সমন জারির পর হইতে দুই পক্ষের অনাত্মীয়রা তাঁহাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিল। তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মোকর্দ্দমার জন্য দিন-রাত উভয় পক্ষকে পরামর্শ দিতে লাগিল। আহারের জন্য বাড়ী যাইবারও সময় তাহাদের ছিল না। অতএব উভয় দলের লোকরা কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজ নিজ পক্ষের বাটীতে ভুরি ভোজনে যোগ দিলেন। মোকর্দ্দমা প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। প্রত্যেক পক্ষই ভাবিতে লাগিল, "কি হয় কি হয় রণে জয়-পরাজয়।"

মিষ্টার জে, টি, হিউমের পুরা নাম মিষ্টার জেমস্ টরেন্স হিউম। ইনি একজন স্কচম্যান। ইঁহার পিতা এক সময়ে কলিকাতার পুলিস-আদালতের প্রধান বিচারক ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার দুই ভগিনী বাস করিতেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী মিষ্টার উডরফ এক সময় কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তিনি ইঁহার এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার আর এক ভগিনীকে বিবাহ করেন প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী মিঃ পেফার; তিনি একজন নামী আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। মিঃ হিউম বাল্যকালে কলিকাতায় আসিয়া এটর্ণী-শ্রেণীভুক্ত হন এবং সামান্য

বেতনে সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর তরফ হইতে সরকার পক্ষে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত হন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট সাণ্ডার্স ন কোম্পানীকে মাসমাহিনা দিয়া সরকারের তরফ হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য নিয়োজিত করেন, আর মিঃ হিউম সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর তরফ হইতে কলিকাতার পুলিস-আদালতে মামলা চালাইতেন। তিনি মাহিনা পাইতেন উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়মে কার্য্য কার্য্য চলিয়াছিল। এই সময়ে মিঃ হিউম হাজার টাকা মাহিনা পাইতেন। এই বৎসরে গভর্ণমেণ্ট ফৌজদারী মামলা চালাইবার ভার সাণ্ডার্স ন কোম্পানীর নিকট হইতে মিঃ হিউম নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটারের পদটি গভর্ণমেণ্টের খাসদখলে আসিল। সাণ্ডার্স ন কোম্পানী তখন কেবল দেওয়ানী মামলা চালাইতে লাগিলেন আর Legal Remembrancerএর অধীনে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মিঃ হিউম কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটাররূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ফৌজদারী আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার অধীনে আসিল। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ৪৪ বৎসর দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং সেই সময় হইতেই আমি কলিকাতা পুলিশ-আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটাররূপে নিয়োজিত হইলাম। হাইকোর্টের বিচারপতি অনারেবল মিঃ জাষ্টিস উড্রফ্ মিঃ হিউমের ভাগিনেয় ছিলেন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে তিনি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ভারত-সচিবের অনুমোদনে মিঃ হিউমের মাসিক ১ হাজার ৫ শত

টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন এবং পূর্ব্ব আঠারো মাসের বেতন মিঃ হিউম এই হিসাবে প্রাপ্ত হন।

মিঃ হিউম লোক হিসাবে উদারপ্রকৃতি হইলেও দেশীয়দের পছন্দ করিতে বা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অবসর লইবার ৫।৭ দিন পূর্ব্বে এক দিন হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী হইতে আসিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলাম, এক জনও সাদা লোক নাই, সব কালো লোক, এখানে অধিকদিন আর তিষ্ঠানো অসম্ভব।"

তিনি আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, এই কার্য্যে আমি নিয়োজিত হই। তিনি অবসর লইবার কিছুদিন পূর্ব্বে এক দিন আমাকে বলিলেন, "এ কাযের জন্য যদিও তুমি বিশেষ উপযুক্ত, তথাপি তাহারা তোমাকে নিয়োজিত করিবে না, কারণ তুমি দেশী লোক।" আমি বলিলাম, "আমি এই কর্ম্মের জন্য বিশেষ উৎসুক নই, আমি যে কার্য্য করিতেছি, তাহাতেই বিশেষ সুখী, স্বাধীন ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছি, কম বেতনে কেন এ কার্য্য লইব?"

যাহা হউক, যদিও তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এক জন য়ুরোপীয় সলিসিটর এ কার্য্যে নিযুক্ত হউক, তথাপি তাঁহার বাধা সত্ত্বেও আমি এ কার্য্যে নিযুক্ত হই।

ডাক্তার আঢ্য তাঁহার পুত্রের নামে সমন পাইয়া একেবারে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত হইলেন। তিনি অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পারতপক্ষে সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে তিনি অতি সামান্য অংশও ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক। তিনি জানিতেন, অর্থ-সঞ্চয়েই মানুষের সুখ, অর্থব্যয়েই মানুষের দুঃখ। যতদূর সম্ভব, সেই দুঃখ

ভোগ করিতে তিনি বিশেষ অনিচ্ছুক। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা লোহার সিন্দুক খুলিয়া মাঝে মাঝে কোম্পানীর কাগজের দিস্তা দেখিতে পাইলেই বিশেষ সুখভোগ করেন। সুখভোগের জন্য তাঁহাদের মতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন একেবারেই নাই। অর্থব্যয় করিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা লৌহ-সিন্দুকে সঞ্চিত অর্থ দেখিয়া অনেক গুণে বেশী সুখ। ডাঃ আঢ্য মহাশয় এই সুখের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ডাঃ আঢ্য একবারেই বসিয়া পড়িলে ত' আর সর্ব্বভুল মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িবেন না, কাযেই খানিকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, পরে সেখান হইতে প্রসিদ্ধ এটর্ণী বাবু কালীনাথ মিত্র C. I. E. ও আমার আশ্রয় লইলেন, অর্থাৎ আমরা দুই জনই তাঁহার পুত্রের পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত হইলাম। ফী দিবার সময় আঢ্য মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, "দেখুন, অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই কষ্টলব্ধ অর্থের এইরূপ অপব্যয়ে আমি বিশেষ মর্ম্মাহত।"

মামলা সুরু হইয়া গেল। হাকিম বিখ্যাত পোষাক-ব্যবসায়ী মিঃ ফেল্‌পস্‌। প্রত্যেক দিন মামলা ডাক হয়, কতকটা শুনানী হয়, তাহার পর তারিখ পড়ে। অনেক দিন এই ভাবে মামলা চলিতে লাগিল। ডাঃ আঢ্য ও সর্ব্বভুল বসাক এই দুইজন ছাড়া অপর সকলেই এ মামলায় বিশেষ সুখী। উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ এবং মামলার তদ্বিকারকগণ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের একটা কোন বাঁধাবাঁধি আয় ছিল না, এখন এই মামলা রুজু হওয়ায় তাঁহারা যে, এ সংসারে অপরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিবার বেশ সুযোগ পাইল।

বিনা অর্থব্যয়ে কোন কার্য্যই হয় না। উকিল, সাক্ষী,

তদ্বিরকারক কাহাকেও পাওয়া যায় না। আর প্রত্যেক দিনের তারিখেই যথেষ্ট পরিমাণে খরচা আছে। এই খরচা আছে বলিয়াই ইহা একটা আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্রেক করে অর্থাৎ চৈতন্য আনায়ন করে।

মামলা দুই পক্ষই খুব জোরে চালাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক তারিখেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। সাক্ষী ও তদ্বিরকারকদের টিফিনের বহরটাই বা কি! প্রত্যেক রাত্রিতেই একটি করিয়া ছোট ভোজ প্রত্যেক পক্ষের বাটীতে হইতেছে। ফলে প্রতি পক্ষেরই ৫।৬ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। সর্ব্বভূল বসাকের যে সুদৃশ্য ও সুন্দর রবার-টায়ার টমটম ও সুন্দর ঘোড়া ছিল, অর্থের অভাবে সে টমটম ও ঘোড়া তাঁহার অধিকার হইতে অপর এক মাড়ওয়ারী চিনির দালালের অধিকারে চলিয়া গেল। তাঁহার নিজ বসতবাড়ীতে তিনি অর্দ্ধেক অংশীদার ছিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থের জন্য সে সম্পত্তির অংশ অপরের হস্তে চলিয়া গেল। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীর অলঙ্কার, ভাল ভাল আসবাবপত্র, ইলেবাস-পোষাক সবই ক্রমে তাঁহার হস্ত হইতে সরিয়া গিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হইল। ডাঃ আঢ্য মহাশয়কেও অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হইল। এরূপ মামলার ফল প্রায় একই। নিজস্ব জেদে যে মামলার উৎপত্তি, তাহাতে পক্ষকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। পুলিস-আদালত হইলে হাজারের কোটাতেই থাকে, হাইকোর্টে হইলে তাহার অনেকগুণ বেশী খরচ হয়। এরূপ অনেকগুলি ঘটনা জানা আছে, যাহাতে জিদের বশে এবং চুলচেরা বিচারের ভাঁওতায় আদালতের আশ্রয় লইয়াছে, পরে সূক্ষ্ম বিচারের ফলে অধিকতর সূক্ষ্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে যখন মামলা রুজু হয়, তখন এক পোয়া দুধ লইয়া দুই

আত্মীয়ের ঝগড়া, তাহা হইতে পার্টিসন মামলার সূত্রপাত, অনেক দিন ধরিয়া মামলা চলার ফলে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দুই পক্ষেরই প্রত্যাগমন। নিজ বাটীতে নহে, কারণ, মোকদ্দমার খরচায় ঘোড়া, গাড়ী, জুড়ী, বাগানবাড়ী, বসতবাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, সবই চলিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়া নিকট-আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে; তখনও ভরসা—মামলা জিত হইলেও হইতে পারে, শেষে উক্তরূপ অবস্থা। প্রথমে যখন এটর্ণীর বাড়ী গিয়াছিলেন এবং খরচার টাকা জমা দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সবিশেষ অভ্যর্থনা, লেমনেড, বরফ-জল, ভাল তামাক ইত্যাদি। ক্রমেই যখন খরচের টাকা দেওয়া কমিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে খাতিরও কমিতে লাগিল। তার পর দুই পক্ষই হৃতসর্ব্বস্ব হইল! পরিণামে এক পক্ষ এটর্ণীর বাড়ীর Serviug clerkএর পদ পাইল, অপর পক্ষ রাম বাবুর বাড়ীর সরকার হইল। ফলে যাহা লইয়া বিবাদ, তাহাও সব গেল, আর যাহা লইয়া বিবাদ নহে, অর্থাৎ অন্যান্য সম্পত্তি, সেগুলিও স্থানান্তরে যাত্রা করিল।

অনেক সময়েই যাঁহারা মামলা করেন, বিশেষ ফৌজদারী মামলা রুজু করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—"I was well, hoping to be better I am here."

এক জন খুঁতখুঁতে লোক প্রায়ই ভাবিতেন, তাঁহার অসুখ হইয়াছে বা তাঁহার অসুখী হইবার কারণ আছে। এই বলিয়া তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ ঔষধ-বিষ খাইয়া নিজের শরীরকে জর্জ্জরিত করিলেন, শেষে শরীর সুস্থ হইতে অসুস্থ হইল, অসুস্থ হইয়া রোগগ্রস্ত হইল, রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইলেন। যখন মৃত্যু তাঁহার নিকটবর্ত্তী

হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার Executorদের বলিয়া গেলেন, তাঁহার গোরের উপর যেন এই কথা লেখা হয়—"I was well, hoping to be better I am here." (আমি ভালই ছিলাম, আরও ভাল হইতে গিয়া এইখানে আসিয়াছি)।

মোকদ্দমা-প্রপীড়িত লোকদেরও সেইরূপ দশা হয়। ক্রোধের উপর ভিত্তি করিয়া এবং তাহার ন্যায্য স্বত্বের হানি হইতেছে মনে করিয়া, তাঁহারা আদালতের আশ্রয় লন, ফলে সকল স্বত্বেই বঞ্চিত হন। ফৌজদারী আদালতে যে সব মামলা রুজু হয়, তাহার শতকরা ৬০টা মামলা ক্রোধ, প্রতিহিংসা, লোভ এবং অপর রিপুর মোহে স্থাপিত। যে অধিকারের লোপ হইতে পারে ভাবিয়া, লোক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, রিপু উত্তেজিত না হইলে তাহার এরূপ ভাবিবার কোন ভিত্তি নাই। রিপু ঐ লোককে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। রিপুর অধিকারভুক্ত হইয়া তাহার তাড়নায় নিজেকে বিশেষ সুখী মনে করেন এবং সেই কারণে অনেক ভিত্তিহীন মামলার জন্ম হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যের দ্বারা যদি মানুষ তাড়িত না হয়, তবে অর্দ্ধেকের উপর ফৌজদারী আদালত বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগ সকল মনুষ্যকেই অধিকার করে। গেরুয়াপরা ও বেনারসীপরা সন্ন্যাসীর দলও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পান না। প্রত্যেকের মুখেই শুনিতে পাইবেন, আমি ফরিয়াদী আমি খুব ভাল লোক; সে আসামী, অতি কদর্য্য লোক। সে যদি আমার মত নম্রস্বভাব, সুসভ্য, ভদ্রলোক হইত, তাহা হইলে আসামীর সহিত মনোবিবাদ একেবারেই হইত না। কিন্তু এ বিশ্বাস মানুষের—"আমি বড় বুদ্ধিমান্"—অহংজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

প্রায় ৮ মাস ধরিয়া মামলা চলিবার পর এক দিন সর্ব্বভুলের

চৈতন্যের উদয় হইল। পরবর্ত্তী শুনানীর তারিখে আদালতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোন উকিল কৌন্সুলি কাহাকেও নিযুক্ত করিলেন না; তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁহার সঙ্গে নাই। মামলা ডাক হইবার পর ফরিয়াদীর স্থানে গিয়া তিনি উঠিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার উকিল আছে, তাঁহাকে ডাক।"

সর্ব্বভুল—আজ্ঞে, আমার আর পয়সা নাই।

হাকিম - তবে তোমার মামলার কি হইবে?

সর্ব্বভুল—আজ্ঞে, যেখানে আমার পয়সা গিয়াছে—মামলাও সেখানে যাক্।

হাকিম—আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বড় বড় উকিল দিলে, সাক্ষী ডাকিলে, ৮ মাস ধরিয়া চালাইলে, আর এখন বলিতেছ, মামলা আর চালাইব না।

সর্ব্বভুল—হুজুর, মামলা ত' পয়সার খেলা, মামলা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু পয়সা খরচ করিয়া বড় উকিল কৌন্সুলী দিলে, তবেই মামলা বড় হইবে। আমার মামলা ত' ৩ টাকা ১০ আনার। যখন বড় বড় এটর্ণী দিয়া রুজু করিয়াছিলাম, তখন একটা হৈ-চৈ হইয়া পড়িয়াছিল, খবরের কাগজে রিপোর্ট হইয়াছিল। এখন আজ আর পয়সা নাই, মামলাটি অতি ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি আর মামলা চালাইব না। (আসামীর দিকে তাকাইয়া) যা বেটা, আমার আর পয়সা নাই, এ যাত্রায় বেঁচে গেলি।

ডাঃ আঢ্য—(কালী বাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া) আপনারা কি বলেন? আমাদের এতে আপত্তি করা উচিত কি না? যাহা করিয়া হউক, অব্যাহতি পাইলেই পরম মঙ্গল।

এক জন আসামী সাক্ষী (অর্থাৎ মামলা আরও চলিলে যাহাকে

সাক্ষী দেওয়া হইত এবং যে গতকল্য ডাক্তারের নিকট হইতে সাক্ষ্য দিবার অজুহাতে ২৫ টাকা ধার করিয়াছে) বলিয়া উঠিল—"আরে, তাও কি হয় ? ফরিয়াদি বেটা চালাইব না বলিলেই ছেড়ে দেওয়া যাইবে ? তাহা কখনই হইবেনা। এতে আরও ২ হাজার টাকা খরচ হইলেও মামলা ছাড়া উচিত নয়। সর্ব্বভুলকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমার আসামীত আর ফকুরে নয়, ডাক্তার বাবুর ছেলে, নাড়ী টিপলেই পয়সা।"

ডাঃ আঢ্য—আরে থাম্ রে বাপু, পয়সা কি খোলামকুচি। উকিল বাবু, আপনারা কি বলেন ?

আমি বলিলাম—"ফৌজদারী মামলায় আসামী হইয়া মামলা চালাইবার জিদ করা উচিত নয়। ফৌজদারী মামলা কোথায় গিয়ে ঠেকিবে, এ কেহই বলিতে পারে না, হাকিম নিজেও নয়। অতএব এ মামলা এখানেই স্বস্তি করা উচিত।"

ডাক্তার—তবে আমার এত যে খরচা হইল, তাহার কি হইবে ?

আমি।– অহিসাবী পুত্রের পিতা হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়, এ অর্থদণ্ড ত' সামান্য কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট 'আসামী খালাস' বলিয়া হুকুম দিলেন। সকলেই এ বিষয়ে আর অধিক মাথা না ঘামাইয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ডাক্তার বাবু মাথায় হাত দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন আর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তাই ত, হ'লো কি ? এতগুলো টাকা— মুখে রক্ত ওটা টাকা—ন দেবায় ন ধর্ম্মায় চ'লে গেল। ভগবান্ ! কি করলেন !'

আসামী আসিয়া ডাক্তার বাবুর হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন,

বলিলেন—"আর ভাবিলে কি হইবে, যা হবার, তাহা ত হয়ে গেল। ভগবানের রাজত্বেও এরূপ হয়!"

ডাক্তার।—আমি ত' জীবনে কখন কিছু অন্যায় করি নাই, আমার এরূপ কেন হইল?

সেই সময় একটা আওয়াজ শুনা গেল—

Sins of the children shall be visited upon the father. (পুত্রের পাপের জন্য পিতাকে সাজা ভোগ করিতে হইবে)।

ডাক্তার বাবু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তা এই রকমই হবে; যখন বিশেষ করিয়া পুত্রদের শিক্ষা দিই নাই, তখনই এইরূপ ফল ছাড়া কি আশা করিতে পারি? তখন সুশিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করি নাই, এখন কুশিক্ষা ও কুসঙ্গীর সহবাসের ফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই টাকার অপব্যয় হইল।"

দশম কথা

অবিদ্যার চাতুরী

"I refuse to ask for security from these ladies; they follow one of the oldest professions of the world."- Observed Mr. Keays, the Second Presidency Magistrate.

কলিকাতার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কীজ্ সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমি এই সকল স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মুচলেখা চাহিব না। কারণ, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতেছে।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, তিনটি স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে, অতএব তাহাদের কোন আইন-মানিত পেশা নাই, এই কারণে কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী পুলিস তাহাদের নিকট মুচলেখা ও জামিন চাহিয়াছিল। এই মোকর্দ্দমাটি আইন অনুযায়ী কতদূর চলিতে পারে, তাহা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই সময় কিড্ ষ্ট্রীটে আদালত বসিত। সেই আদালতে এই তিন জন স্ত্রীলোককে চালান দেওয়া হইয়াছিল। আসামীগণকে কীজ্ সাহেবের নিকট হাজির করিবার পর, তিনি পুলিস-চালান পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় বাহাদুর, আপনি এই মোকর্দ্দমাটি কি সমর্থন করিতেছেন?"

আমি বলিলাম, হাঁ; পুলিস এ কেসটি Test Case করিয়া চালান দিয়াছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট।—আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া কি এই মামলা চালান দেওয়া হইয়াছে?

আমি।—না, তবে পুলিস চায়, আপনি আইন-সঙ্গত এই মামলা করেন, আর আইনের পক্ষে কি বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতে পুলিস আমাকে এই মোকর্দ্দমায় দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—আইন সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতে পারুক না কেন, আমি এই মোকদ্দমায় এই হতভাগিনীদের নিকট হইতে কখনও জামিন ও মুচলেখা চাহিব না। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এই শ্রেণীর ধরিত্রীনন্দিনীরা এই পেশার উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। আপনি আইনের তর্কে আমাকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করুন, আপনি কখনও এই মোকর্দ্দমায় জয়ী হইবেন না।

আমি তখন কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারায় কি বলে, তাহা পড়িয়া শুনাইলাম এবং বলিলাম, এই ধরিত্রীনন্দিনীরা যেরূপভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা আইন-অনুমোদিত নহে, আইনের কাছে তাহা পেশাই নহে। যখন ইহা আইন-অনুমোদিত নহে, তখন ইহা ১০৯ ধারার আইনে আইসে।

ম্যাঃ।—আপনি বলিতে পারেন, ইহারা কি করিয়া খাইবে?

আমি।—সেই তর্ক চোররাও করিতে পারে, ভিখারীরাও করিতে পারে, জুয়াচোরের দলপতিরাও করিতে পারে।

ম্যাঃ—আপনার ইহাদের উপর দয়া করা উচিত।

আমি।—অবস্থাবিশেষে চোরের উপরও দয়া করা উচিত। এক জনের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, কিম্বা অন্নাভাবে পুত্র-কন্যা মরিতেছে,

সেই লোক যদি চিকিৎসা বা পথ্যের জন্য চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, আইনের দৃষ্টিতে সে দোষী হইলেও প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট সে সহানুভূতি পাইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া আইন তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

ম্যাঃ।—আপনি কি এই মামলা চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন? আমি যদি আপনাকে এই মোকর্দ্দমায় হারাইয়া দি, তাহা হইলে আপনি কি আমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাইবেন?

আমি।—না; আমি কেবল এই পেশা আইন-অনুমোদিত নয়, এই বলিয়া আপনার হাতে এই মামলা ছাড়িয়া দিব, আপনার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিব না।

ম্যাঃ।—আইন-অনুমোদিত না হইলেও আমি ইহাদিগকে সাজা দিব না। পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এই পেশা চলিয়া আসিতেছে। আজ বে-আইন বলিয়া এই পেশা অবলম্বনকারীদের আমি সাজা দিব না।

আমি।—তবে আমি এই মামলা তুলিয়া লইলাম।

এই ঘটনার অনেক দিনের পর যখন কীজ্ সাহেব জোড়াবাগান আদালতের হাকিম, তখন বেশ্যাদের সম্পর্কীয় আর একটি মামলা তাঁহার নিকট করিয়াছিলাম। জাহ্নবী দেবী নাম্নী এক বাড়ীওয়ালী অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়া, তাহাদের খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিত এবং দশ, এগারবর্ষ-বয়স্কা হইলে তাহাদিগকে নাচ-গানে কিয়ৎপরিমাণে তালিম দিয়া, দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পেশায় নিযুক্ত করিত। প্রত্যেক পালিত কন্যাকে নিজ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিত; না হয় তাহাদের খুব উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত করিত

অনেক সময় এই সব বালিকা দেবীরূপে আখ্যাত হয়। সোনাগাছি ইত্যাদি স্থান হইতে যে সব মামলা চালান হয়, সেই সব স্থানের বাড়ীওয়ালীর ও তাহাদের পালিতা কন্যাদের অধিকাংশই দেবী বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করে। দর বাড়াইবার জন্য মেদিনী-পুরের মাহিষ্য-কন্যারাও এখানে দেবী বলিয়া পরিচয় দেয়। এক জন ইন্‌স্পেক্টর এইরূপ একটি মামলা চালান দিয়াছিল। তাহাতে বাদিনীকে দেবী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, আপনি ইহাকে দেবী বলিয়া কেন আখ্যাত করিয়াছেন, এই সকল স্থানে প্রত্যেক কুপথগামিনীরা কী দেবীকুলসম্ভূতা ?

ইন্‌স্পেক্টার।—আমি কি করিব, পরিচয়ে ইহারা দেবী বলে, কাযেই দেবী বলিয়া আখ্যাত করিতে হয়।

এই বৃথা নামের দিনে অনেক উপদেবী দেবী বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করে। কুকুরের যেমন উচ্চ বংশের জন্মতালিকা (pedigree) থাকে, ইহাদের প্রত্যেকেরই উচ্চবংশের জন্মতালিকা আছে। সেই জন্মতালিকার অজুহাতে সকলেই উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত। তখন এই শ্রেণীর বাড়ীওয়ালীরা বলে—'ও ত' আমার গর্ভের মেয়ে নয়। বংশমর্য্যাদার মায়া কাটাইয়া আমার এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।' মেয়ে ও মা না হইলেও ইহারা এক জাত এই হিসাবে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সাহায্য করে। পেশা অতি প্রাচীন—বংশপরম্পরায় না চলিলেও এক জনকার পালিতা কন্যা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পেশার উৎকর্ষ-সাধন করিতেছে। প্রত্যেক পেশাগীরের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। সেই সময়ের অপব্যবহার করিয়া, পেশার চরম ঔৎকর্ষসাধনের

চেষ্টা হইতেছে। বহুকালের বহুদর্শিতার ফলে, ইহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা এমন হইয়াছে যে একবার তাহাদের আটাকাটিতে পড়িলে চলিয়া আসা দুঃসাধ্য। একবার তাহাদের জালে পা দিলে সেই জালের বাহিরে আসা প্রায় অসম্ভব। তাহাদের চাতুরী হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য। এই সব মন্তব্য বেশ্যাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য হইলেও চরিত্রহীনাদের পক্ষেও সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগযোগ্য। যে সব স্ত্রীলোকের সতীত্বধর্ম্ম হইতে পদস্খলন হইয়াছে, তাহাদের চাতুরী হইতে আত্মরক্ষা করবার জন্য সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি একটি যথার্থ ঘটনার কথা বলিতেছি—কেবল আসল নাম না দিয়া লোকদিগকে অন্য নামে আখ্যাত করিতেছি। এই ঘটনার আখ্যায়িকা হইতে পাঠক ও পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন, তাহাদের জালবিস্তার কিরূপ ভয়াবহ ও দুশ্ছেদ্য।

কয়েকখানি দরখাস্ত শুনানীর পর, সে দিন পুলিস আদালতে মুলতুবী দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদী জাহ্নবী দেবীর ডাক হইলে, সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিতা দরখাস্তকারিণী এক রমণী, ঐ নামে সাড়া দিল। সে আস্তে আস্তে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার চক্ষু ১৭।১৮ বৎসরের একটি তরুণী উপর ন্যস্ত; সে আদালত-গৃহের এক পার্শ্বে দাড়াইয়া ছিল। ফরিয়াদী রমণীটিকে দেখিলে বোধ হয, অনেক দিন পূর্ব্বে সেও এই তরুণীর ন্যায় সুন্দরী ছিল। এখন তাহার বেশভূষা দেখিলে মনে হয়, সে পোষাক-বিক্রেতার দোকানের ছাঁচে গড়া পুতুলের মত, আকৃতিটি কেবল পোষাকের সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহৃত; পোষাকের সৌন্দর্য্যের উপর যত নজর, আকৃতির উপর তত নহে। তাহার চক্ষু দুইটি চারিদিকেই ঘুরিতেছে, মুখে অবসাদের রেখা, অথচ খুব ব্যস্তভাব, আওয়াজ স্ত্রীলোকের

মত একবারেই নয়, কর্কশ ও কর্ণকটু, মুখের মাংস কুঞ্চিত হইয়াছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে মেয়েটির নামে পরোয়ানা দেওয়া হইয়াছিল, সে হাজির আছে?"

একজন উকিল।- হাঁ হুজুর, মুসামত প্রমাদিনী কাহিল হাজির। তিনি এখন আমার মক্কেল মহম্মদ কাহিলের বিবাহিতা পত্নী। এখানে হাজির আছেন, আর আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয়, সেই উদ্দেশ্যে শারীরিক কাহিল থাকিলেও, কাহিল সাহেবও আদালতের মর্য্যাদা-রক্ষা হেতু এখানে উপস্থিত আছেন।

হাকিম।—আমি আপাততঃ প্রমাদিনীকে গোটাকতক প্রশ্ন করিতে চাই।

প্রমাদিনীর ডাক পড়িল। জাহ্নবী দেবীকে নামাইয়া দেওয়া হইল। জাহ্নবী দেবী কাঠগড়া হইতে নামিবার সময় ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "হ্যালা প্রমাদিনী, তোকে এই জন্যই কি মানুষ করেছিলাম? অনেক কষ্টে এত বড়টা করেছি, সে কি এই করতে? তুই আমাকে ধনে-প্রাণে মারলি?"

প্রমাদিনীর পক্ষের উকিল-বাবু।- হুজুর, ফরিয়াদী আমার মক্কেলের সহিত যেন কথা না কয়, ওকে মিথ্যা শিখাইয়া দিবে; ফরিয়াদী সব পারে ও আমার মক্কেলের মাতা নয়, উপমাতা। হাঁসপাতাল থেকে ২৫ টাকা ঘুষ দিয়ে নিয়ে আসে, আমার মক্কেল বেশ্যা নয় বা বেশ্যার কন্যাও নয়, তিনি একজন উচ্চবংশীয় ভদ্রমহোদয়ের কন্যা; কোন কারণে তাঁর মাতা তাঁহাকে হাঁসপাতালে প্রসব করিয়া মারা যান, ফরিয়াদী সেইখান থেকে প্রমাদিনীকে নিয়ে আসে, আর বেশ্যা করিবার চেষ্টা করে। আমার মক্কেল ঘৃণ্যভাবে জীবনযাপন

করিতে চান না, তাই মিঃ কাহিলের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, ভদ্রমহিলার ন্যায় বিবাহিত জীবনযাপন করিবেন। মিঃ কাহিলের উদ্দেশ্য মহৎ, তাই তিনি প্রমাদিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন পঙ্কতিলক প্রমাদিনীকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া কপালে রাখিয়াছেন।

ফরিয়াদীর উকিল।—তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়াই বুঝি, গহনাগুলি পর্য্যন্ত যৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হুজুর, বেশ্যার মেয়ের আবার বিবাহ কি? উহারা চার পুরুষে বেশ্যা (অবশ্য উহাদের মাতৃগত-কুল)। হুজুর বেশ্যার মেয়েকে আবার কে বিবাহ করিবে? ওদের বিবাহ হয় কেবল পুলিসে তাড়া দিলে।

প্রমাদিনীর উকিল।—হুজুর, যে একবার খারাপ হয়, সে কি আর ভাল হইতে পারে না? পতিতা নারীর ভাল হওয়া ত' তাহার জন্মগত অধিকার। আর সে খারাপ হইয়াছিল, তাহাও নিজ দোষে নয়, তাহার উপমাতার পীড়নে এবং প্রতারণায়। আজকালকার উন্নতির দিনে যে মহাপুরুষ একটি, দুইটি বা ততোধিক পতিতা রমণীর উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনি সমাজের মঙ্গলস্তম্ভ; তাঁহারই এখন সমাজকে পতন হইতে রক্ষা করিবেন। আজকালকার বাঙ্গলার সাহিত্যে দেখিতে পাইবেন, যিনি পারাকে মাথায় লেপিতে পারিবেন, তিনি ত' আদর্শ পুরুষ; বেশ্যার উদ্ধারই মহাজনের প্রকৃত সৎসাহসের পরিচয়।

হাকিম।—আমি এখানে ওসব সমাজনীতির কথা শুনিতে আসি নাই। আমি বালিকাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এখন কিছু বলিবেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাদিনী প্রতি :—

প্রশ্ন।—তোমার নাম কি ?

উত্তর।—প্রমোদিনী।

প্রঃ।—তোমার বয়স কত ?

উঃ।—উনিশ বৎসর।

প্রঃ।—তোমার বাপের নাম ?

উঃ।—আমার বাপ নাই।

প্রঃ।—জন্মাইবার পূর্ব্বে ত' ছিল।

উঃ।—জানি না।

প্রঃ।—তোমার মায়ের নাম ?

উঃ।—জানি না।

প্রঃ।—ফরিয়াদী তোমার মা নয় ?

উঃ।—না, সে আমার উপমাতা ; বারো আনি।

প্রঃ।—বারো আনি কি ?

উঃ।—আমাকে দিয়া উপায় করায়, অর্জ্জনের বারো আনা সে লয়।

প্রঃ।—তুমি তার কাছে যেতে চাও ?

উঃ।—না।

প্রঃ।—কোথায় যাবে ?

উঃ।—কাহিল সাহেবের কাছে।

প্রঃ।—কি সর্ত্তে ?

উঃ।—তিনি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছেন।

প্রঃ।—এ গহনাগুলি কাহার ?

উঃ।—এ সমস্ত আমার রোজগারের, কিন্তু আমি এ সমস্ত পাপলব্ধ গহনার একখানাও ব্যবহার করিব না। আমি এ পাপের জিনিস পাপীকেই দিয়া যাইব।

প্রঃ।—পাপী কে ?

উঃ।—আমার উপমাতা, যাহাকে আমি মা বলিতাম। জগতে ঘোষণা করিতে চাই, যে আমার বাবু, থুড়ি, সাহেব, আমাকে গ্রহণ করিতেছেন, আমার জন্য, আমার গহনার জন্য নয়। আমি গহনাগুলি রাখিলে বাবুর নামে ঘোর কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।

এই বলিয়া সে প্রত্যেক গহনা গা হইতে খুলিয়া সম্মুখে উকিল-দের টেবিলের উপর রাখিল, আর ফরিয়াদিকে ডাকিয়া বলিল, "নে সর্ব্বনাশী, এই সব গহনা নে, আমি এক কাপড়ে বাবুর সঙ্গে চলিলাম, যদি বরাতে থাকে, সোনার স্যুটের জায়গায় হীরা-জহরতের স্যুট পরিব। কি বলেন কাহিল সাহেব ?"

কাহিল সাহেব এতগুলি টাকার গহনা চলিয়া যায় দেখিয়া একটু কাহিল হইলেন; কিন্তু কি করেন, উপায় নাই; অতএব হাসিয়া বলিলেন, "যাক্ ও সব। আমি আছি।"

এক জন প্রবীণ উকিল অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বাবা, এও একটা ছেনালি। কিছুদিনের জন্য ধাড়ী ছেড়ে ছানাটা চ'লে এলো, আবার খেয়ে-দেয়ে কিছু দস্তুরমত ঠিক ক'রে নিয়ে, নিজের বাসায় উড়ে যাবে। যেমন ধাড়ী, তেমনি ছানা; যা বেটী যা, কিছু মোটা ধরণের মেরে দিলি ! সাবাস্ কেউটের বাচ্ছা।"

হাকিম।—কি সৎসাহস, কি বিশুদ্ধ অনুরাগ, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ? (ফরিয়াদীর উকিলের প্রতি) আমি আপনার মক্কেলের কোন সাহায্য করিতে পারিবনা। বালিকাকে দেখিয়া আমার ধারণা, তাহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক; অতএব তাহার যেখানে ইচ্ছা, সে যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না।

হুকুম শুনিয়া ফরিয়াদী কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,

"তোকে মানুষ করিতে ওস্তাদজীর মাহিনে হিসাবে এখনও যে আমার দুই হাজার টাকা ধার আছে, সে টাকা কে দেবে রে?"

প্রমাদিনী।—কেঁদ না, এ শুভক্ষণে চোখের জল ফেল না। (মিঃ কাহিলের দিকে চাহিয়া) এই ঘুটে-কুড়ানীর মেয়েটাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দাও, বাস্। তুই বেটী ঘুটে-কুড়ানীর মেয়ে, সাহেবের কাছে চাইলেই পাস, শাঁপাশাঁপি কেন? এ সময়ে কাঁদিস্ নি, বাবু সাহেব, একে আর এক হাজার টাকা দিয়ে দাও।"

এই বলিয়া সাহেবের কোরিয়ার ব্যাগ খুলিয়া ৩ হাজার টাকার তিন বাণ্ডিল নোট উপ-মায়ের হাতে দিয়া বলিল, "দেখিস্ বেটী, আকৃখুঁটের ঘরের পেত্নী, আমার মেনী বিড়ালটি রহিল, তাকে যত্ন করিস্, দুধ-ভাত দিস্। চল সাহেব, এখন নিষ্কণ্টকে তোমার সঙ্গে যাই। এত দিনে আমার জন্ম সার্থক। যাহার জন্য আমার সৃষ্টী, তাহাকে পাইলাম; দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন এই বেশ্যার আশ্রয়ে ছিলাম আমি নিজেও বেশ্যা নহি বা বেশ্যাকুলে আমার জন্ম নহে। পূর্ব্বজন্মে কিছু পাপ ছিল, তাই এত দিন বেশ্যার অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। এতদিনে আমি শাপমুক্ত হইলাম। ঈশ্বর যাহার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে পাইলাম।

রমেশচন্দ্র বলিয়া এক জন স্তাবক এই কথা শুনিয়া বলিল, কাহিল সাহেব, প্রমাদিনী যাহা কিছু বলিল, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য, আমরা অনেক সময় নূতন নূতন বাবুর কথা বলিয়াছি। সে কিন্তু কিছুতেই রাজি হইত না। সে বলিত, আমি বড় ঘরের কন্যা, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ্যার ঘরে আসিয়াছি ও তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। আমি এক জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তাহার সাক্ষাৎ পাইলেই তাহার সহিত এই পাপস্থান ত্যাগ করিব।"

স্তাবক মন্মথনাথ কহিল, "সাহেব বিশ্বাস করুন আর না করুন, যে সকল কথা এখন শুনিতেছেন, এ সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হরিদাস বাবাজীর সহিত যে দিন আপনি এই বাড়ীতে প্রথম আসিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই প্রমাদিনী সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিল, যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। যাহার জন্য এতকাল এই পঙ্কিল স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহার সঙ্গে এত দিনে দেখা হইল। আমি যত শীঘ্র পারি এই পঙ্কিল স্থান পরিত্যাগ করিব। সবই পীরের সংযোগ!"

বাহিরে আসিয়াই ১নং স্তাবক বলিল, "হুজুর, লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর মতন শুধু গায়ে বাড়ী নিয়ে যাবেন না। চলুন, এইখান থেকেই হ্যামিল্‌টন কোম্পানীর বাড়ী যাওয়া যাক্, মা লক্ষ্মীকে সাজিয়ে নিয়ে যান, তবে ঘরে তুলবেন। পূজার আগে ঠাকুর সাজান চাই, আমরা সব চাল-চিত্রের ঠাকুর, আমরা সাজান-গুছান ঠাকুর দেখিতে চাই। প্রমাদিনী বিবি কি বল?"

প্রমাদিনী।—আমার আর কি বল? আমার মানও নাই, ইজ্জতও নাই; বাবুর হাত ধরেছি, বাবুর যাহা ভাল লাগে, তাই করুন। সাজাতে হয় সাজান, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে সাঁচ্চা মতির ব্রত করেছিলাম। আর যাহা কিছু মানায়, তাহাও দেবেন, তা হ'লে আমি আর অন্য বাবুর হাত ধরব না।"

স্তাবক নং ২।—তুমি আজ যা দেখালে, তাহাতে আজ থেকে এক জন আদর্শ রমণী বাড়িল। পুরাতন স্তবটা ভেঙ্গে গড়তে হবে, এই স্তবে প্রমাদিনীর নাম থাকিবে, এ নিশ্চয়; আর তোমার জন্য বাবুর নাম, থুড়ি, সাহেবের নাম জগতে বিখ্যাত হবে,—'প্রমাদিনীর বাবু' ব'লে। ধন্য তুমি প্রমাদিনী, আর তা হ'তে ধন্য তোমার বাবু, ধন্য

আদর্শ রমণীর উদ্ধারকর্ত্তা। বাঙ্গালার একদল সাহিত্যিকের খোরাক জুটিল। চল সব হ্যামিল্‌টন কোম্পানীর দোকানে যাওয়া যাক্‌, আজ রাত্রে কি স্ফর্ত্তি, প্রমাদিনী আজ অষ্টপ্রহরব্যাপী নাচ ও গানের ফোয়ারা ছোটাবে।

একাদশ কথা

খাঁটি বনাম ভেজাল খাদ্যদ্রব্য

আমাদের এই পবিত্র দেশে কোন বিষয়ে পবিত্রতার আঘাত লাগিলেই মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে। যাহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেছে, তাহাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা ভালরূপ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। যদি আমরা যথার্থ ই চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই অন্যায় ব্যবহারের সম্পূর্ণরূপে প্রতিকার করিতে পারি। সকলে মিলিয়া একমত হইয়া চেষ্টা করিলে এ জগতে কিছুই অসম্ভব হয় না; কিন্তু তাহা আমরা কখনই করি না। তাহার কারণ, প্রথম, আমরা একমত হইতে জানি না, দ্বিতীয়, আমাদের ধর্ম্মে যথার্থ ই এরূপ বিশ্বাস নাই—যাহার জন্য আমরা প্রাণপণে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা করি। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসেরও আমাদের বিশেষ অভাব।

আমাদের শাস্ত্রে বলেন, মানুষকেও বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু আমরা সুবিধাবাদী—ভাসা ভাসা ভাবে শাস্ত্র মানি, যখন সুবিধা হয় ও এক পয়সা খরচায় হয়, তখন পিপীলিকাকে চিনি দিয়া বাঁচাইয়া রাখি, আর প্রয়োজন হইলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে সর্ষপতৈলের সহিত **mineral oil**, ঘৃতের সহিত সাপের চর্ব্বি ও **vegetable oil**, ও ময়দার সহিত **soft stone** মিশাইয়া তিলে তিলে পলে পলে মারিতেছি। মুখে ধর্ম্মের ভান করি, বেদিতে বসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার

করি বা ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করি, তিলকফোঁটা কাটিয়া চিতাবাঘ সাজিয়া ধর্ম্মে ও ভগবানে ভক্তি দেখাই, কিন্তু স্বার্থে আঘাত পড়িলে সব ভুলিয়া গিয়া অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হই।

পবিত্র ঘৃত দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়, সেই ঘৃত প্রস্তুত হয় বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ হইতে, কিন্তু অনেক দিন হইতে সস্তা দরে বিক্রয় করিবার জন্য ঘিয়ের সহিত সাপের চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে একটি Trade mark Caseএ Search Warrant লইয়া, টেরিটিবাজারে একটি মুসলমান দোকানদারের ঘর হইতে অনেকগুলি খাতা-পত্র ধৃত হয়। ঐ মুসলমান বণিকের ব্যবসা মফঃস্বলে ঘি চালান দেওয়া। খাতা পত্র পাঠ করিয়া দেখা গেল, বড় বড় পাহাড়ী সাপের চর্ব্বি ক্রয় করার দরুণ টাকা খরচ লেখা রহিয়াছে। এক একটা সাপের ওজন এক মণ, দেড় মণ ও দুই মণ—দর ৫৲ টাকা। এই সাপের চর্ব্বিমিশ্রিত ঘি মফঃস্বলে চালান হয়—দর ২০৲।২২৲ টাকা। আর সেই ঘৃত ব্যবহার হয় দেবপূজার জন্য, আর ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের শরীরধারণের জন্য। সকলেই জানেন, এইরূপ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রতিকারের কোন বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে কি ?

দেবতার ভোগের জন্য এবং মানুষের সেবার জন্য যত রকম দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে পবিত্র গব্যঘৃত প্রধান দ্রব্য। এই পবিত্র ঘৃত প্রস্তুত করিবার জন্য ভাল দুগ্ধের প্রযোজন, আর ভাল দুগ্ধ পাইতে গেলে, উৎকৃষ্টভাবে গো-পালন প্রয়োজন। ইহার কোন কি চেষ্টা হইতেছে ? পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের মাঠ ছিল। সেই মাঠগুলিতে স্থানীয় লোকদিগের গোচারণের ব্যবস্থা ছিল। এখন

অনেক স্থানের জমিদারগণ সেই মাঠগুলিতে প্রজাবিলি করিয়াছেন। প্রজাবিলি করিবার অধিকার জমিদারের নাই, কিন্তু অধিকার থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহারা চাষের জন্য এই সব জমি বিলি করিয়া গো-মহিষাদি চারণের বিশেষ অসুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য কেহ কি কোন দিন তাহার বিরুদ্ধে একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলিও উত্তোলন করিতেছেন ?

সরিষার তৈলে অনেক স্থলেই দেখিবেন mineral oil মিশ্রিত আছে। সেই mineral oil প্রাণঘাতিকা। অনেক সময় ইহা ব্যবহারে এক এক গ্রামে কলেরা হইয়া বহুসংখ্যক মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিতেছে। খাঁটি সরিষার তৈল পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। যদিও আমরা দেশসেবা করিব, ব্যবসা করিব বলিয়া মুখে এই সব কথা বলিতেছি, কয়জন লোক যাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল নানাস্থানে পাওয়া যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ?

অতি পূর্ব্বে সর্ষপ-তৈলে সরগোঁজা মিশাইত। আমি যখন প্রথম উকিল হইয়াছি, আর মিউনিসিপ্যালিটির মামলা কলিকাতার পুলিস আদালতেই বিচার হইত, তখন যে খাদ্য-পরীক্ষকরা তেলের ভেজালের মামলা করিতে আসিত, তাহাদের নালিসই থাকিত, তেলের সহিত সরগোঁজা মিশাইয়াছে। আর আসামীদের উক্তি হইত, সরগোঁজা কতক পরিমাণে না মিশাইলে সরিষা হইতে সম্পূর্ণভাবে তৈল নির্গত হয় না। কিন্তু সরগোঁজা-মিশ্রিত সর্ষপ-তৈল প্রাণঘাতিকা ছিল না। কিন্তু এখন কেহ কি চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে খনিজ তৈল মিশান বন্ধ হয় ?

ময়দায় এখন Soft stone মিশ্রিত হয়। গম হইতে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহাই খাইয়া মানুষ জীবনধারণ করে ও শক্তিশালী

হয়। কিন্তু এখন ব্যবসাদারদের অনুগ্রহে গম হইতে প্রস্তুত রুটী ও লুচি না খাইয়া Soft stoneএর লুচি ও রুটী খাইতেছি, ইহা হইতে মৃত্যু কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। খাঁটি ময়দা যোগাইবার জন্য বাঙ্গালী যুবকরা কি করিতেছেন ?

লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ ইত্যাদি শরীর-পুষ্টিকারী মশলা ব্যবহার করি, সেগুলির প্রত্যেকটি হইতে তৈলাক্ত অংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে যে ছিবড়া থাকে, সেই-গুলি বাজারে লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও বড় এলাচ ইত্যাদি বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে এবং তাহাই আমরা লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

বাজারে যে দুগ্ধ বিক্রয় হয়, তাহার মাখন তুলিয়া লওয়া হয়। মাখন-বিবর্জ্জিত দুগ্ধ অনেক সময়ে বাজারে বিক্রয় হয়। অনেক সময় লম্বা-চওড়া নাম-বিশিষ্ট দুগ্ধ-সরবরাহকারী কোম্পানীর কথা শুনেন, তাহাদের অধিকাংশ কোম্পানী মফঃস্বল হইতে প্রেরিত বাজারের দুধ কিনিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য চালাইতেছে।

বিহারস্থিত সাঁওতাল পরগণার মধুপুরে এক জন ইহুদী ভদ্রলোক একটি মাখন তুলিবার কল লইয়া যান। তিনি গোয়ালাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গোয়ালার দুগ্ধ তাঁহার কলে ঢালিয়া দিবে। তিনি সের-করা দুই আনা হিসাবে দাম দিবেন; আর মাখন-তোলা হইয়া গেলে যে দুগ্ধ থাকিবে, তাহাও তাহাকে ফেরত দিবেন। কাযেই গোয়ালা দুধকে দুধও পাইল, আর দুই আনা করিয়া পয়সাও পাইল, আর সেই দুধ বাজারে বেচিয়া তিন আনা করিয়া দাম পাইল।

খাঁটি বনাম ভেজাল খাদ্যদ্রব্য

এখন যেরূপ খাদ্যবিভ্রাট হইয়াছে, তাহাতে খাঁটি জিনিষ পাওয়া ও খাওয়া অতিশয় দুর্লভ। ভাত আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য, সেখানে ঢেঁকি ছাঁটা চালের বদলে কলে ছাঁটা চাল চলিতেছে। কলে ছাঁটিবার সময় ভিটামিনযুক্ত অংশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বলিতে পারেন, মানুষ কি খাইয়া বাঁচিবে?

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দুটি করিয়া দল আছে। প্রত্যেক দলেরই প্রাণপণ চেষ্টা লাভের সম্পূর্ণ অংশ তাহাদের দলই পায়, অপর দল যেন কিছু না পায়। আপনারা কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কোন স্থানের কতকগুলি লোক তাহাদের দেশ হইতে বানর ধরিয়া অপর স্থানে চালান দেওয়া হইতেছে বলিয়া মহা উত্তেজনাজনক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য, রামচন্দ্রসখা হনুমানদের উপর এরূপ অত্যাচার অতিশয় অন্যায় ও ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত করা হইতেছে। তাঁহারা চিৎকার করিয়া দেশকে উত্তেজিত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুখে তাঁহারা বলিতেছিলেন, ধর্ম্ম গেল, দেশ উৎসন্ন গেল, কিন্তু আসল কথা অন্যরূপ। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল সভাতে ইহাই স্বীকৃত হইয়াছিল যে, বানরের সংখ্যাবাহুল্য হেতু সেই স্থানের অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, কাযেই স্বীরকৃত হইয়াছিল যে, রেলের গাড়ী করিয়া বানরদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হউক। সেই মিউনিসিপ্যালিটিতে দুইটি দল ছিল। বানরগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার কন্‌ট্রাক্ট একটি দলের লোক পাইয়াছিল, ভগ্নমনোরথ অপর দলের লোকগুলি অমনই চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি।

এইরূপ ধর্ম্মের ভানের খেলা হইয়াছিল ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে। তখন

চীৎকার উঠিয়াছিল, ঘিয়ে ভেজাল হইতেছে, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি। একটি দলের হাতে অনেক ঘৃত ছিল এবং তাহা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, অপর দলের হাতে তখন বিশেষ ঘৃত ছিল না। তাহারা দেখিল, প্রতিপক্ষ ঘি বেচিয়া অনেক লাভ করিবে, অমনই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘিয়ে অত্যন্ত ভেজাল, দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল ইত্যাদি। ভাগীরথীর ধারে দলে দলে অনেক মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের ও দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ গঙ্গাকিনারায় না খাইয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ধর্ণা দিলেন। মুখে বলিতে লাগিলেন, ভেজাল ঘি খাইয়া দেবতারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, মনুষ্যের ধর্ম্মে আঘাত লাগিতেছে, অতএব ভেজাল ঘি'র পরিবর্ত্তে আমরা পবিত্র ঘি চাই। লোকের কি উৎসাহ!

পরে ঘৃত সম্বন্ধে একটি নূতন আইন রুজু হইল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, যিনি পরে লর্ড হইয়াছিলেন, তিনি সেই আইনের জন্য দায়ী। যে মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণরা পবিত্র ঘৃতের জন্য গঙ্গাকিনারায় ধর্ণা দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই ধনী মাড়োয়ারীর হুকুম-তামিলদার। তাঁহাদের জীবনের কার্য্যই হুকুম তামিল করা। আমেরিকার বড় বড় হোটেল অধিকারীর সংশ্লিষ্ট আইরিশ ভোটারদের ন্যায় তাঁহারা হুকুম মাফিক কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাঁহারা কতকটা আধুনিক গণতান্ত্রিক দলের ভোটারদের ন্যায় নিজেদের কোন বিভিন্ন অস্তিত্ব অনুভব করেন না। গণতান্ত্রিক দলের স্বৈরাচারী কর্ত্তারা যাহা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই করেন। কোন রাজনৈতিক লেখক বলিয়াছেন—"Democracy is an institution to find out who is the worst autocrat,"

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বৈরাচারী কে, তাহাই গণতন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

আইন করিয়া ভেজাল ঘৃত বিশুদ্ধ করা যায় না, আইন করিয়া মিশ্রিত খাদ্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করা যায় না, আইন করিয়া ভোগবিলাসী লোককে ভোগবিলাস পরিত্যাগ করান যায় না, আইন করিয়া অধার্ম্মিককে ধার্ম্মীক করা যায় না, আইন করিয়া লোভীকে নির্লোভ করা যায় না, আইন করিয়া দুষ্টকে শিষ্ট করা যায় না, আইন করিয়া অসৎকে সৎ করা যায় না, আইন করিয়া অধঃপতিত সমাজকে উর্দ্ধমুখীন করা যায় না। সৎশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, স্বার্থত্যাগ দ্বারাই পতিত সমাজকে উন্নত করা যায়। অধঃপতিত জাতিকে উন্নতির পথে লওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতিক প্রচারকার্য্য দ্বারা তাহা হয় না। তাই ঘৃত আইনবদ্ধ হইলেও তাহার উন্নতি কিছুমাত্র হইল না। যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। সেই ভেজাল ঘৃতই চলিতে লাগিল, তবে দর দ্বিগুণ হইয়া গেল। Sybills bookএর ন্যায় সেই পচা ঘৃত দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল।

যখন ঘৃতে ভেজাল চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক 'ট্রেড মার্ক' যুক্ত এক ঘৃত বাজারে ছাড়িলেন—ঘিয়ের কেনেস্তারার মার্কা হইল নাগরী অক্ষরে লেখা—"পাতিরাম।" এই মার্কা ঘি দিনকতক বেশ চলিল। তাহার পর আর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাহির করিলেন, তাঁহার মতে খাঁটি ঘি মার্কা "খাতিরাম।" খাতিরামেরও প্রতিপত্তি বেশ দাঁড়াইয়া গেল। পাতিরাম ও খাতিরাম দুইটি মার্কাযুক্ত ঘি বাজারে বেশ কাটিতে লাগিল। দুইটি মার্কার জন্য বাজারে বেশ আগ্রহও ছিল। ইহা দেখিয়া আর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাহির করিলেন "খালিরাম"।

ইহাও বাজারে চলিতে লাগিল। একটা নাম ও মার্কা দিলে বাজারে যে চলে না কি, তাহা আমার জানা নাই। দেবনাগরী হরপে এই তিনটি মার্কার নাম দেওয়া হইল—পাতিরাম, খাতিরাম, খালিরাম। হিন্দি অক্ষরে "খাতিরাম" ও "পাতিরামের" মধ্যে তফাৎ একটি বার। পাতির "প"য়ের পেটে একটা 'বার' দিলেই "খাতি" হইয়া যায়। আর "খাতি"তে ও "খালি"তে দেবনাগরী হরপে তফাৎ একটা অতিরিক্ত Loop।

"খাতিরাম" মার্কার ব্যবসায়ী যিনি "পাতিরাম" মার্কাওলার পর বাজারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন – তিনি "খালিরামের" চালানদারদের নামে তাহার ব্যবসার মার্কা জাল করিয়াছে বলিয়া নালিশ করিলেন। খাতিরামের উকিল হইলাম আমি, আর খালিরামের কৌন্সুলী হইলেন সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (লর্ড সিংহ)। মামলা রুজু হইল, আসামীর নামে শমন বাহির হইল। মার্কার 'টিন প্লেট' (Tin plate) ও খাতাপত্রের জন্য Search Warrant বাহির হইল। আর Search Warrantএর দ্বারা খাতাপত্র এবং মামলা-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রগুলি আদালতে আনা হইল। আসল গোড়ার যে "পাতিরাম", সে কোন মামলা করিল না। মধ্যাগত খাতিরাম, খালিরামের মালিকের নামে মামলা রুজু করিয়া দিল। পুলিস-আদালতের মামলায় আমি জিতিলাম। খালিরাম মার্কাওয়ালাদের সাজা হইল। যখন মামলা চলিতেছিল, তখনকার একদিনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তর্ক করিতে করিতে মিঃ সিংহ (পরবর্তী যুগে লর্ড সিংহ) বলিয়া উঠিলেন, খাতিরাম মার্কা অধিকারী আমার মক্কেল 'পাতিরাম' মার্কা জাল করিয়াছে। কিন্তু সে নিজে দূষিত হস্তে আদালতের সাহায্য চাহিয়াছে, সেইজন্য তাহার এ মামলায় আমার কৃতকার্য্য হওয়া উচিত নয়।

লর্ড সিংহ।—খাতিরাম মার্কার অধিকারী পাতিরাম মার্কা জাল করিয়াছে, তাহার দূষিত হস্তে আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, সেই কারণে আদালতের তাহাদের সাহায্য করা উচিত নয়। বরং খাতিরামের অধিকারীদের উপর পাতিরামের মার্কা জাল করার দরুণ মামলা চলা উচিত।

আমি।—মিঃ সিংহের অভিভাষণে বিশেষ সারবত্তা নাই। খাতিরামের "খ"য়ের 'বার'টি, পাতিরামের মামলা চালাইবার বিশেষ ব্যতিক্রম। That additional bar in Khatiram is a bar to its prosecution।

লর্ড সিংহ।—If that is so, the additional loop in "ল" of Khatiram ought to be a loophole to the accused, খাতিরামের "ত"য়ে একটা loop, খালিরামের "ল"য়ের দুটো loop। সেই কারণে অতিরিক্ত loopটি আমার মক্কেলের loophole হওয়া উচিত অর্থাৎ বাহির হইবার পথ হওয়া উচিত।

লর্ড সিংহ সম্বন্ধে এইস্থানে আমি আর দুই-একটি কথা বলিতে চাই। আমার ভাগ্যে তাঁহার সহিত কার্য্য করা ও তাঁহার বিপক্ষে কার্য্য করা ঘটিয়াছিল। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভালবাসিতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভজনলাল লোহিয়ার বিরুদ্ধে মানহানি মোকর্দ্দমায় নর্টন সাহেব ও আমি ফরিয়াদীর তরফে ছিলাম। সিংহ সাহেব ও মিষ্টার বিজয়বিহারী চাটার্জ্জী আসামী ভজনলালের তরফে ছিলেন। মামলা অনেক দিন চলিয়াছিল।

তিন কিম্বা চারি বৎসর পূর্ব্বে কোন একটা পার্টিতে লর্ড সিংহ উপস্থিত ছিলেন। স্যার বি, এল, মিত্রও ছিলেন। অন্যান্য অনেক

লোকের মধ্যে আমিও সেখানে ছিলাম। স্যার বি, এল মিত্র আমার লিখিত পুস্তকগুলি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি লর্ড সিংহ মহাশয়ের সম্মুখে বলিলেন—"তারক, তোমার বইগুলি কি লর্ড সিংহকে উপহার দিয়াছ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কতকটা অপ্রতিভ হইলাম, কারণ আমি লর্ড সিংহকে আমার পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিই নাই। যাহাই হউক, আমি বলিয়া উঠিলাম, "লর্ড সিংহ ত' আর বাঙ্গলা বইগুলি পড়িবেন না, আমার বাঙ্গলা ভাষায় লেখা বইগুলি পাঠাইয়া লাভ কি?"

লর্ড সিংহ।—তারক বাবু এতকাল একসঙ্গে ব্যবহার করিয়া আজ কিনা বলিলে, তোমার বাঙ্গলা ভাষার লেখা পুস্তকগুলি পাঠ করিব না?

আমি।—আমার ভুল হইয়াছে, কিছু মনে করিবেন না, আমার পুস্তকগুলি শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেই তারিখের পরবর্ত্তী রবিবারে আমার পুস্তক চারিখানি "ভোলানাথের ভুল", "মেনকারাণী", "ঋণমোক্ষ" ও "মহামায়ার মহাদান" ইলিসিয়াম রো-স্থিত তাঁহার বাটীতে গিয়া উপহার দিলাম। তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। দুই সপ্তাহ বাদে আমি পুনরায় তাঁহার বাটীতে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

লর্ড সিংহ।—তারক, তোমার বইগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে, এইরূপ পুস্তকে সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে। তোমার বইগুলি ঠিক সময়ে বাহির হইয়াছে। একদিন আগেও বাহির হয় নাই।

আমি।—আপনি সমস্ত বই ভাল করিয়া পড়িয়াছেন?

লর্ড সিংহ।—আমি পুস্তকগুলি ভাল করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ

করিয়াছি, শুধু আমি পাঠ করি নাই, লেডী সিংহকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। তাঁহার Reader—যিনি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনান, তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, বইগুলি তাঁহাকে আগাগোড়া পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন। আমি তোমার পুস্তকগুলি পাঠে বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আমি।—আমার উদ্দেশ্য ধর্ম্মহীন শিক্ষায় মানুষ সুখী হইতে পারে না। ভগবানের অনুকম্পা বিনা মানুষের শান্তি হইতে পারে না, এইটিই দেখান। সকল পুস্তক লেখাতেই আমার উদ্দেশ্য এক—ধর্ম্মহীন শিক্ষায় মানুষ সুখী হইতে পারে না। আমি আরও বলিলাম, "এইখানে আমার একটি কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস, মোগল পাঠান ইত্যাদি জাতিরা ভারত জয় করিয়া হিন্দুদের যতদূর অনিষ্ট করিয়াছে, তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিতেছে এই হুজুগবাজদের দল। আমাদের সব গিয়াছিল, তথাপি অন্দরমহলটি ঠিক থাকার দরুণ আমাদের নিজ নিজ গৃহে বেশ সুখ-শান্তি ছিল। আমাদের মা, মাসী, স্ত্রী, ভগিনী ইহারা আমেরিকার কামিনীর ন্যায় Home Breaker নন, Home Makers—তাঁহারা গৃহবিচ্ছেদ ঘটান না, গৃহে শান্তি আনেন। কিন্তু যে দিন অন্দরমহল প্রথাটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে, সেই দিন আমাদের শান্তি কোথায় থাকিবে?"

লর্ড সিংহ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"Perhaps you are right, Perhaps you are right, তারক, সম্ভবতঃ তোমার ধারণাই ঠিক।"

লর্ড সিংহের Ghee Actএর পর পবিত্র ঘৃতের অভাব সমানই আছে। সাপের চর্ব্বি, পচা কলার মাড় ইত্যাদি ত ঘিয়ের সহিত ব্যবহার হইতেছেই, তাহার উপর বনস্পতি-তৈলের মিশ্রণে বিশুদ্ধ ঘৃত

এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা নিজের ব্যবহারের জন্য ঘৃত দেশ হইতে আনেন। যে সব ঘৃত বাজারে বিক্রয় হয়, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন না, সেই সব বাজারের ঘিয়ের খরিদ্দার অধিকাংশই বাঙ্গালী। তাঁহারা ঘরে বসিয়া বিশেষ অর্থ-কষ্ট সহ্য করিবেন, তথাপি ঘৃত-ব্যবসায়ে বা গোকান হইতে ঘৃত আমদানী বা ঘৃত প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না।

মধুপুরে আমার একখানি বাটী আছে। আজ ২৪ বৎসর ধরিয়া আমি মধুপুরে যাতায়াত করিতেছি। ৫ বৎসর পুর্ব্বেও ওখানে যে সব ঘি পাওয়া যাইত, সে সব খাঁটি। কিন্তু বনস্পতি-তৈলের অনুগ্রহে এখন মধুপুরে খাঁটি ঘি দুষ্প্রাপ্য জিনিস। এক জন নীচবুদ্ধি জুয়াচোর ব্যবসার নাম করিয়া পাড়াগেঁয়ে দেহাতি গয়লাদিগকে এই পদার্থ বেচিয়া উহা ঘির সহিত মিশাইতে শিখাইয়াছে। মধুপুর সহরে গোয়ালাদের জুয়াচুরি শিখাইয়া ছোট ছোট মাটীর ভাঁড়ে বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘি ফেরি করিতেছে, মুখে বলিতেছে, ইহা খাঁটি গব্যঘৃত, আমার বাটীতে তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাই আনিয়াছি। আর লোকেও সস্তা বলিয়া এই সকল মিশ্রিত ঘি ব্যবহার করিতেছে। খাঁটি ঘৃতের দর ২ টাকা হইতে ২।০ সের, আর এই মিশ্রিত ঘৃতের দর ৸০ আনা হইতে ১ টাকা সের।

খাঁ বাহাদুর আবদুল গফুর সাহেব আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কয় মাসের জন্য মধুপুরে গিয়াছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে পানিয়াখোলা রাস্তা হইতে দেখিলাম, তিনি বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তিনি শারীরিক অসুস্থ আছেন। অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—পেটটা কিছু খারাপ হইয়াছে। কাথায়

কথায় জানিলাম, তিনি ১।০ সিকা সেরের "খাঁটি" ঘি খাইয়া এই অবস্থায় আসিয়াছেন।

আমি।—আপনার এ অবস্থার কারণ হয় ত' বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘির ব্যবহার। ইহার গুণ নাই। চার্ব্বাক্ মুনি যখন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন, তখন তিনি খাঁটি পবিত্র গব্য ঘৃতের কথাই ভাবিয়াছিলেন, বনস্পতি-তৈল-মিশ্রিত ঘিয়ের কথা ভাবেন নাই। ভাবিলে এরূপ উক্তি করিয়া যাইতেন না। খাঁটি ঘিয়ের যে সব গুণ আছে, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এক জন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বনস্পতি-ঘৃতের কোন গুণ নাই, ইহা খাওয়া আর না খাওয়া দুই-ই সমান।

খাঁ বাহাদুর।—রায় বাহাদুর, আমার জামাতা এই ঘি কিনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কথামত এই ঘি কিনিয়াছিলাম।

আমি।—জামাতা শ্বশুর মহাশয়কে সস্তায় ঘি কিনিয়া দিয়া গিয়াছেন, জানিতেন না, এরূপ পরিণাম হইবে। যাহা হউক, অদ্য আহার বন্ধ করুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবেন। আর ১।০ সিকা সেরের ঘি খাইবেন না।

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল চলিতেছে। এই সব খাইয়াও এখনও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য। আমাদের দেশের যুবকরা দলবদ্ধ হইয়া যদি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানোর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে দেশের অনেক কাজ করা হইবে। খাঁটি জিনিস খাইতে পাইলেই মানুষ সুস্থশরীরে বাঁচিতে পারিবে। আমাদের সমাজের নেতারা কি এ দিকে মন দিবে? তাঁহারা এমন যুবকদের লইয়া একটি দল করুন, যাঁহারা প্রাণপণে ভেজাল মিশানোর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন।

———

দ্বাদশ কথা

জুলুমবাজ

জোর-জুলুম ও গুণ্ডামী করিয়া জীবনযাপন করা এক শ্রেণী লোকের নিজস্ব বৃত্তি। যেমন করিয়াই পারে, তাহারা জোর-জুলুম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অসভ্যদের মতে ত' কথাই নাই, সুসভ্য-দের দেশেও সুসভ্য সমাজে ইহার বেশ চলন আছে। সুসভ্য আমেরিকায় Gangster King বা Gangster Princeএর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা সকল শ্রেণীর সদ্‌ব্যবসায়ীদের উপর চৌথ আদায় করে। তুমি ব্যবসাদার, হয় এই বদমায়েসদের সর্দ্দারকে তোমার লভ্যাংশের বখরা দাও, তবে তোমাকে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য চালাইতে দিবে, নতুবা তোমার পক্ষে কার্য্য চালান অসম্ভব করিয়া তুলিবে। ইহারা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নিকট হইতে জুলুম করিয়া টাকা আদায় করে, থিয়েটার কোম্পানীর উপর ইহাদের অনুগ্রহ যথেষ্ট। সম্প্রতি আমেরিকার দুইটি থিয়েটার কোম্পানীকে ইহাদের উৎপাতে কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে। থিয়েটার ম্যানেজাররা দেখিয়াছে যে, ইহাদের উৎপাতজনক কর দিয়া তাহাদের পক্ষে ব্যবসা চালান অসম্ভব। সেই কারণে তাহারা বলিতেছে, এই সকল Gangsterএর দাবি বজায় রাখিয়া আমাদের পক্ষে কার্য্য করা সমূহ অলাভজনক। সুসভ্য দেশ, অতএব পুলিসের বন্দোবস্ত বিশেষরূপেই আছে, Gang-ster King দিগকে পুলিস কিছুই করিতে পারে না। পুলিসও

অনেক সময় ভয়ে ভয়ে ইহাদের সহিত ব্যবহার করে। "Les Miserable" যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, একজন বদমায়েসের একজন ভালমানুষের উপর কতদূর প্রভাব; সত্য বটে, সুসভ্য দেশে পুলিস আছে, কিন্তু প্রত্যেক লোকের জন্য ত পুলিস নাই বা হইতেও পারে না। সেই কারণে বদমায়েসের জুলুমের বিপক্ষে পুলিস প্রত্যেক লোককে সব সময় আশ্রয় দিতে পারে না। ইহা ত গেল সৎপুলিসের সম্বন্ধে কথা, ইহার উপর আবার পুলিস যদি অসৎ ও ঘুষখোর হয়, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই, সোনায় সোহাগা! ভাল মানুষের সকল সময়ই বিপদ, দুষ্ট ও বদমায়েসের হাতে ভাল মানুষ সকল সময়েই বিপদগ্রস্ত। সহর যত সুসভ্য ও বৃহৎ, বদমায়েসদের সংখ্যাও তদনুপাতে অধিক; সহরের সভ্যতা ও জনসংখ্যা যত বাড়িতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বদমায়েসদের দল অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতায় যত লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, বদমায়েসদের আড্ডাও তাহার চতুর্গুণ পরিমাণে বাড়িতেছে। অনেকেরই মনে পড়ে, ছেলেবেলায় কাফ্রী গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা। তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও তাহারা কোন কাজকর্ম্ম করিত না, অথচ বাবুগিরি করিয়া জীবন কাটাইয়া দিত। পেশোয়ারী গুণ্ডাদের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন ও শুনিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা বদমায়েস, তাহারা প্রকাশ্যভাবে ফল ও মেওয়ার দোকান করে ও অপ্রকাশ্যভাবে কোকেন ও আফিমের অবৈধভাবে ব্যবসা চালায়। মুসলমান গুণ্ডার সংখ্যাও কম নহে। যেখানে যেখানে বস্তি আছে, সেই সকল স্থানে এই সব মুসলমান গুণ্ডার যথেষ্ট আধিপত্য। হিন্দু গুণ্ডার সংখ্যাও কলিকাতায় কম নহে। ইহাদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লোকই অধিক। বেহারীর সংখ্যাও অল্প বলা চলে না। এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালী গুণ্ডার সংখ্যা

যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালী গুণ্ডা বলিয়া জীব কলিকাতার এখন নাই বলিলেও চলে। বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য সবই গিয়াছে, বাঙ্গালী ময়রার সংখ্যা, মুদীর সংখ্যা, ফল-ব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, রাজমিস্ত্রী, ছুতরমিস্ত্রী, কামারমিস্ত্রী, জল-গ্যাস-ড্রেণের মিস্ত্রী বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালীরা ব্যবসা গিয়াছে, চাষ গিয়াছে, দোকানপাট সব গিয়াছে, আছে কেবল অবিছিন্ন দারিদ্র, সীমাহীন দুঃখ, বর্ণনাতীত নিরবছিন্ন যাতনা। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহরে পূর্ব্বে কত হিন্দু বাঙ্গালী মাঝি ছিল, এখন তাহাদের সংখ্যা বিলোপ পাইয়াছে। সকল ব্যবসায়-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী গুণ্ডারও হ্রাস হইয়াছে। বিশেষ বলশালী বাঙ্গালী আর নাই, তা গুণ্ডা থাকিবে কোথা হইতে?

আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি তাহা ৩০ বৎসর পূর্ব্বের। আরা জেলার নিকবর্ত্তী স্থানে বলবন্তপ্রসাদের বাস। নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ তাঁহাকে দুইটি পুত্র দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠটির নাম কৃষ্ণপ্রসাদ, কনিষ্ঠটির নাম রামপ্রসাদ। যে গ্রামে তাঁহার বাস, সেখানে মাত্র তিন চারিখানি পাকা বাড়ী। দেখিতে দেখিতে ৩০।৩২ বৎসরের ভিতর বলবন্ত ধনে-মানে, কুলে-শীলে, বংশমর্য্যাদায় এবং ভাল ভাল ঘরে কুটুম্বিতা করিয়া সমাজে একজন বিশেষ বলবন্ত লোক হইয়া উঠিলেন। শুধু যে বলবন্ত হইলেন, তাহা নহে, যশোবন্তও হইলেন। ধনবান্ হওয়া হেতু সব বিষয়ে বিশেষ বলবান হইয়া উঠিলেন। তিনি খুব জবরদস্ত লোক ছিলেন, সেইজন্য লোক সাহস করিয়া সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দাবাদ করিত না। পরোপকারে বলবন্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তিনি গরীবের মা-বাপ ছিলেন এবং দয়ার পাত্র বিবেচনা করিলে, লোককে বিশেষ সাহায্য

করিতেন। দয়াপরবশ হইয়া তিনি এক দূর-আত্মীয়ের পুত্রকে বাটীতে রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম হরেকচাঁদ। হরেকের হরেক রকম গুণ। দেখিলে বোধ হয়, যেন ভিজে বিড়ালটি; কিন্তু তাহার অস্থি-চর্ম্ম দুষ্টামীতে মাখানো। যে তাহাকে জানে না, প্রথম দেখিলেই বলিবে, আহা! বেশ ছেলেটি। কিন্তু যে তাহার দুষ্টামীর কথা জানে, তাহারা সকলেই বলিয়া থাকে, "হরেকচাঁদ হইতে তফাৎ তফাৎ।" হরেক রকম দুষ্টামীতে সে সিদ্ধহস্ত। বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ভারী যাইতেছে, কাঁধে বাঁকে করিয়া দুইদিকে দুইটি জলপূর্ণ কলসী। হরেকচাঁদ টুক্ করিয়া একটি ছোট পাথর কলসীতে মারিল। এক দিকের কলসী যেমন ভাঙ্গিয়া গেল, অপর কলসীটি অমনই জমী গ্রহণ করিল। ফলে দুইটি কলসীর জলই পড়িয়া গেল। বাগানের মালী বাঁকে করিয়া জিনিষ লইয়া যাইতেছে; হরেকচাঁদ পিছনদিক্ হইতে যাইয়া এক তোড়া লিচু তুলিয়া লইল; সে নিজে খাইল এবং অপর অপর বন্ধুদের খাওয়াইল। এক দিন এক বৃদ্ধ বলবন্তের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল হঠাৎ হরেকচাঁদকে দেখিয়া বলিল, "বাবা আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি, আমাকে একটু তামাক দিতে পার?"

হরেকচাঁদ একটি চাকরকে তামাক দিতে বলিল, তবে তামাকের পরিবর্ত্তে মোমের কৃষ্ণবর্ণ গাদ সাজাইয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল। বৃদ্ধ দুই এক টান দিয়া খক্ খক্ করিযা কাসিতে লাগিল এবং বুঝিতে পারিল, তামাকের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিয়াছে। বৃদ্ধ গালি দিতে দিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। এ হেন হরেকচাঁদ রামপ্রসাদের বয়স্য ও বিশেষ বন্ধু।

প্রত্যেক জিনিষেরই শেষ আছে, পরিবর্ত্তন আছে—ধ্বংস আছে। বলবন্ত নামে ও কাজে বলবন্ত হইলেও তাঁহার সময় আসিল। তিনি

পুত্র-কন্যা, পরিবার, ধনসম্পত্তি রাখিয়া এক অজানা অচেনা স্থানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক আত্মীয় ও অনাত্মীয় আসিয়া পুত্রদ্বয়ের পরামর্শদাতা হইল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল, 'এ দুজন যদি আমার কথা শোনে, তা হ'লেই ইহাদের রক্ষা, নতুবা ইহাদের আর ভদ্রস্থ নাই।' ভ্রাতৃদ্বয় বাঁশবনে ডোম-কাণার ন্যায় কাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। প্রত্যেকেই বলিতেছিল, যেমন করিয়া পারে, তাহারা ভ্রাতৃদ্বয়ের উপকার করিবে। ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের কাহারও নিকট উপকার প্রার্থী নহে, তথাপি তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা পরামর্শের ধামা বোঝাই করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

ভ্রাতৃদ্বয় পরামর্শ চায় না, কিন্তু আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের দল পরামর্শ না দিয়া তাহাদিগকে তিষ্ঠতে দিবে না। এই রকম অবস্থায় এক দিন হরেকচাঁদ রামপ্রসাদকে পরামর্শ দিল, 'চল, আমরা একবার কলিকাতায় বেড়াইয়া আসি; শুনিয়াছি, এমন স্থান ভারতে আর কুত্রাপি নাই, যাহা চাও, তাহাই পাইবে। মনের ফোয়ারা ছুটাইয়া দাও, প্রাণ ভরিয়া মনের সাধ পুরাইতে পারিবে।'

এমন সময় মদনবাম বলিয়া, এক ব্যক্তি ধূমকেতুর ন্যায় এই গাঁয়ের আকাশে দেখা দিল। কোথা হইতে আসিল বা কেন আসিল, কেহই বলিতে পারে না। তবে সে যে আসিয়াছিল, সেটা ঠিক, অভ্রান্ত নিশ্চিত। পোষাক-পরিচ্ছদ ফিটফাট, গাঁয়ে ভাল রাস্তা না থাকিলেও তাহার পায়ে পেটেণ্ট লেদার সু (জুতা), এসেন্সের সৌগন্ধে যে স্থান দিয়া সে যাইতেছিল, সে স্থান সৌগন্ধে ভুর-ভুর করিতেছিল। সে বলবন্তের বাটীর সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করিতেছিল। রামপ্রসাদ ও হরেকচাঁদ এই লোককে দেখিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং অভ্যর্থনা করিয়া

বাটীর বাহিরের ঘরে তাহাকে আসিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, সে বিশেষ কাজে ব্যস্ত। এই গাঁয়ে আসিয়াছে গোঁহু কিনিবার জন্য। তাহার মালিকের কলিকাতায় বড় গদি আছে, ভূষা মালের খুব বড় রকম কারবার। তাহাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে খুব বেশী রকম গম উৎপন্ন হয়। সেই জন্য সে ঐ স্থানে আসিয়াছে। এই বলিয়া সে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে আসিল এবং একটা ঠোক্কর লাগিয়া তাহার পকেট হইতে নোট ও কতকগুলি টাকা জমিতে পড়িয়া গেল। অল্প কথায় সে হরেকচাঁদ ও রামপ্রসাদকে বুঝাইয়া দিল, তাহার মালিক একজন ক্রোরপতি। সে কলিকাতাতেই থাকে, পাটনা জেলার লোক, সে একদিন পরেই কলিকাতায় যাইতেছে, কলিকাতা যে কি মজার জায়গা, তাহা সে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। কলিকাতার ভিতর অনেক বড় বড় বাগান আছে, জমিতে ফুলের কার্পেট বিছানো, অধিকাংশ মানুষই কন্দর্প ঠাকুর, আর স্ত্রীলোকরা উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা। পয়সার কাছে দুষ্প্রাপ্য জিনিস কলিকাতায় কিছুই নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলে, তাহার মালিকের বাসা-বাটীতে পাঁচ সাত দশ দিন বিনা খরচায় থাকিতে পারিবে, কোন অসুবিধাই হইবে না, 'খালি খাও দাও, আর মজা উড়াও।'

হরেকচাঁদ রামপ্রসাদকে বুঝাইয়া দিল, এমন সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, চলো, আমরা ইহারই সহিত কলিকাতায় যাই।

হরেকচাঁদ।—মদন বাবু আমাদের সঙ্গে কি কি জিনিস লইব? তৈজসপত্র, চাল-ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য কত কত লইব? দাসদাসীও কিছু লইতে হইবে কি?

মদন।—আরে মশাই, আপনি আমার ধনীর বাড়ীতে অভ্যাগত ও অতিথি হইবেন, পাঁচ সাত দশ দিনের জন্য তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্যাদি কি

লইয়া যাইবেন ? ইচ্ছা করিলে, এক মাস থাকিতে পারিবেন। কত বড় ধনী আমার মালিক হরদম তাজারামের অতিথি হন। এই অতিথি-সৎকার-কার্য্যে তিনি বৎসরে হাজার হাজার টাকা ব্যায় করেন। দস্তুরমত অতিথি-সৎকারের জন্য তিনি থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সিনেমা প্রভৃতি কোন খরচাই অতিথিকে করিতে দেন না। সব তাঁহার তহবিল হইতে খরচ হয় এবং সেই সব খরচপত্র আমার তত্ত্বাবধানে হয়।

রামপ্রসাদ।—তবে কিছু টাকা সঙ্গে লইব ?

মদন।—লয়েন ভাল, না লয়েন, তাও ভাল ; টাকা লইয়া যাইবেন এবং বাড়ী আসিবার সময় ফিরাইয়া আনিবেন। তবে কলিকাতা সহর ভগবান কখন কোন সময়ে কি ভাবে "ছপ্পর ফুঁড়িয়া" টাকা পাওয়াইয়া দেন, তাহা বলা বড়ই শক্ত। সঙ্গে কিছু টাকা থাকিলে এইরূপ ভগবদ্দত্ত টাকা পাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, একদিন দুই দিন বা তিন দিনের জন্য বিশ হাজার টাকা কোন কাজে লাগাইতে পারিলে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা হইয়া যাইতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি, যখন বন্ধু হিসাবে আপনাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতেছি, বন্ধু হিসাবে পরামর্শ দিতেছি, ইচ্ছা করিলে বেশী করিয়া কিছু টাকা সঙ্গে লইবেন। টাকা আপনার সঙ্গেই থাকিবে, নারায়ণ সুবিধা করেন, উহা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া আসিবে। কলিকাতায় সবই বড় লোক, গরীব সেখানে থাকে না। উত্তর কলিকাতায় রাজেন্দ্র মল্লিক, মতিলাল শীল, সাগর দত্ত ইত্যাদি কয়জন খ্যাতনামা লোক বাস করিতেন, এখন কিন্তু দক্ষিণ-কলিকাতায় অলিতে গলিতে দাতা, হোতা ও ভোক্তা। সেখানে সোনা-রূপার ফোয়ারা ছোটে, টাকার নদী আছে, সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেই মাছের ন্যায় জাল ফেলো আর তোল। তবে একটা কথা, কলিকাতার লোক সোনার গহনা, হীরা-জহরত বড় পছন্দ করে, অতএব

যতদূর সম্ভব হীরা, জহরত, মুক্তা, পান্না শরীরে পরিয়া লও ও সঙ্গে বাক্স-তেও নাও। যৎকিঞ্চিৎ পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে লও।

রামপ্রসাদ।—কলিকাতা কি মজার দেশ! দশ কুড়ি দিন থাকিতে হইলে তৈজসপত্র প্রয়োজন হয় না, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না, খাও দাও মজা উড়াও, হরদম তাজারাম থাকিতে কোন কিছুরই অভাব হইবে না, জয় হরদম তাজারাম কী জয়!

তিন দিন পরে মদনরাম, রামপ্রসাদ ও হরেকচাঁদ আর এক জন দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল। সঙ্গে দুইটি ষ্টিল-ট্রাঙ্ক ও সামান্য বিছানা-পত্র। একটি ষ্টিল ট্রাঙ্কে নোট, টাকা ও গিনিতে প্রায় বিশ হাজার আর একটি ট্রাঙ্কে হীরা-জহরত, মুক্তা, পান্না, সোনা-রূপার গহনা প্রভৃতিতে প্রায় বিশ হাজার টাকা। রামপ্রসাদের গলায় এক চেন-হার ও হাতে দুটি হীরক-অঙ্গুরী, কাণে দুটি হীরার টপ। মদনরাম-কথিত তাহার মালিকের নিয়ম অনুসারে তাহার সঙ্গে গাড়ীতে অনেক ভাল ভাল ফল ও মিষ্টান্ন লইয়াছিল। মদনরাম হরেকচাঁদ ও রামপ্রসাদকে বুঝাইয়া দিল, যখন তোমারা হরদম তাজারাজের অতিথি, তখন সমস্ত খরচ হরদম তাজারামের হইবে; তোমাদের নয়, এমন কি, রেল ভাড়া, কুলী ভাড়া, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ইত্যাদি।

ষ্টেশনে ট্রেণে চড়িয়াই মদনরাম টেলিগ্রাম করিল—"আমি রামপ্রসাদ বাবু ও তাঁহার এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম, কলি-কাতায় ইঁহাদের থাকিবার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেই ব্যবস্থা করিবেন, রামপ্রসাদ বড় ঘরের সন্তান, ইঁহার অভ্যর্থনায় কোনরূপ ত্রুটি যেন না হয়, হাওড়া ষ্টেশনে লোক ও গাড়ী পাঠাইয়া দিবেন, পেয়ারী বিবিকে যেন খবর দেওয়া হয়।"

যথাসময়ে এই কয় জন হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিল। দেখিল, সেই-

থানে দুইখানি গাড়ী ও দুই জন কর্ম্মচারী তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহাবা সকলে মিলিয়া হরদম তাজারামের "নারায়ণ হাতায়" আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই "নারায়ণ হাতাটি" একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ইহা এক সরু গলির ভিতর অবস্থিত। এই বাড়ীর সহিত সংশ্লিষ্ট বড় রাস্তাটি সর্ব্বজন-বিদিত। এই বড় রাস্তাটিতে সর্ব্বরকম শ্রেণীর লোক বাস করে; সাধারণ লোক এই মহল্লাটিকে নারায়ণ মহল্লা বলিয়া জানে। প্রশস্ত চওড়া বড রাস্তা হইতে ক্রমে এই বাটীর সরু রাস্তাটি সরু হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ হাজার ফুট পরে এই সরু গলিটির শেষ হইয়াছে। এই ২ হাজার ফুট লম্বা রাস্তাটি ৪ ফুট চওড়ার বেশী নহে, চার পাঁচটি বাঁক আছে, রাস্তাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীটির চাব পাচটি বাহির হইবার পথ আছে। প্রত্যেক পথ অত্যন্ত সরু ও ২ হইতে ৪ হাজার ফুট লম্বা। বাড়ীটির প্রবেশপথ যেন গোলকধাঁধার ন্যায়, আর এই সরু রাস্তাগুলির ২ শত ফুট তফাতে একটি করিয়া লোক বসিয়া কিম্বা শুইয়া আছে, দেখিলে বোধ হয় না, তাহারা কোন কাজে নিযুক্ত আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় তাহাদের কোন কাজ নাই, তাহারা যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে বসিয়া আছে। বিভিন্ন বড় রাস্তা হইতে এই সরু লম্বা রাস্তাগুলি ঐ বাটীতে গিয়া শেষ হইয়াছে। বাটীতে একটি বৃহৎ সদর দরজা, তাহা ৪ ভাগে বিভক্ত। নীচের তলার এক কোণে একটি অংশ খোলা আছে, হেঁট হইয়া দরজার সেই অংশ দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আর চারিটি যে সরু সরু রাস্তা ঐ বাটীতে আসিয়া শেষ হইয়াছে; তাহার মুখে মুখে একটি করিয়া দরজা আজে, সেই দরজাগুলি ছে ট ও অপ্রশস্ত।

নীচের তলাটি অন্ধকার, সূর্য্যদেব যেন কথন প্রবেশ করেন নাই বা করিতে পারেন না। লোকজনের কুস্তি করিবার স্থান আছে, বাড়ীতে

ঢুকিয়া উপরে যাইবার সিঁড়িগুলি অপ্রশস্ত ও ঘোরফের-যুক্ত। বাটীর দোতলাতে খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত ও দুই পাঁচ জন লোক থাকিবার বন্দোবস্ত। বাটীর ত্রিতলে খুব প্রশস্ত ও লম্বা চারিখানি কামরা; দুই-খানি কামরা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত, দুগ্ধফেননিভ চাদরে মোড়া ঢালা ফরাস বিছানা, ২০।২৫টি তাকিয়া, ভাল কাপড়ের ধব্ধবে ওয়াড়, ছোট ছোট অনেকগুলি গালবালিস; সেই ঘরের বাহিরে লম্বা লম্বা লোহার বাঁধান লাঠি, সেই লাঠিগুলি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেগুলি অনেক যত্নে রোজ তেল মাখান হয়। আর দুটি ঘর অভ্যাগত ব্যক্তিদের জন্য; অভ্যাগতদের যত দূর সুন্দরভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, তত দূর করা হইয়াছে। দোতলায় আসিবার একটি সিঁড়ি; সেই সিঁড়ির মুখেই একটী ছোট ঘরে ঠাকুর থাকেন। প্রয়োজন হইলে যে সময়েই হউক ঠাকুরের পূজা হয়। সকলকে জানাইয়া দিবার জন্য ঠাকুরপূজার সঙ্গে জোর আওয়াজে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠে; দু তিনটি জোর আওয়াজওয়ালা ক্লারিওনেট আছে, ইহাও মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত বাজিয়া উঠে।

যে রাস্তা দিয়াই লোক আসুক না কেন, এই বাটীতে আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যেককেই, যে কয়টি অকেজো লোক রাস্তায় আছে, তাহাদিগের শ্যেন-চক্ষু এড়াইবার উপায় নাই। সরু গলির রাস্তা দিয়া যে সব পথ আছে, সেই সব গলির ভিতর যে কয়টি আছে, তাহার সদর-দরজার সম্মুখভাগ এই গলির দিকে নহে। যে কয়টি বাটীর সদর-দরজা এই গলির দিকে, সে বাটীগুলিতে হরদম তাজারামের লোকেরা বাস করে। হরদম তাজারামের বাটী—নারায়ণহাতা দেখিলে মনে হয় না যে, তাহার ভিতর মানুষ বাস করে; কোন শব্দ নাই, লোকজনের কোলাহলের অস্তিত্ব নাই, এমন কি, কোন ফেরিওয়ালার আওয়াজ এই পাঁচটি গলির

ভিতর পাওয়া যায় না। ভয়েই হউক, ভক্তিতেই হউক, আর গ্রাহকের অভাবেই হউক, ফিরিওয়ালারা এই রাস্তায় প্রবেশ করে না। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিকালে, সকল সময়েই এই গলিগুলি নিস্তব্ধ। প্রাতঃকালে ফিরিওয়ালাদের খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের আওয়াজ, মধ্যাহ্নে পিতল-কাঁসার বাসন "মা' জ কাপড়ওয়ালা"র আওয়াজ, বেলোয়ারী পুতুল ও খেলনা-বিক্রেতার আওয়াজ, বৈকালে আলুকাব্‌লি, মাংসের ঘুঘনি, নকলদানা-বিক্রেতার আওয়াজ ও সন্ধ্যাকালে কুল্পিবরফ, বেলফুল-বিক্রেতার আওয়াজ এই গলিতে শুনা যায় না। কলিকাতা সহর গোলযোগবিহীন ও গোলমালশূন্য এইরূপ স্থান অতি বিরল। যাঁহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শান্তি চান, তাঁহারা এরূপ স্থানে আসিলে বিশেষ আনন্দ পাইবেন।

তেতলার আর চৌতলার ঘরগুলি অতি সুন্দরভাবে রক্ষিত ও সজ্জিত, কিন্তু বাটীর বহির্ভাগগুলি দেখিলে মনে হয়, এ বাটীতে কেহ বাস করে না। অনেক স্থলেই চূণবালি নাই, ইট দেখা যাইতেছে, মনে হয়, ইহা যেন পোড়ো বাড়ী। ইহার চারিদিকে যে সব অপর অপর বাড়ী আছে, এই বাড়ী হইতে অনায়াসেই সেই সব বাড়ীতে যাওয়া যায়।

রামপ্রসাদ বাবু যখন এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তেতলার একটি ঘরে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইল; পাশে একটি ঘরেই স্নানের বন্দোবস্ত, সেখানে গরম ও ঠাণ্ডা জল সরবরাহ হইতে লাগিল। তাঁহার কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য তেতলা হইতে দোতলায় নামিবার দরকার হয় না।

উপরে তাস-পাশার জন্য লোক আসিতে লাগিল। পাশের একটি বড় ঘরে তাস-পাশা খেলা হইতে লাগিল।

চৌতলার ছাদে বেড়াইবার বন্দোবস্ত আছে। রামপ্রসাদ যখন

চৌতলার ছাদে বেড়াইবার জন্য উঠেন, সেই সময় এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী তাঁহার নিকট আসিয়া আলাপ করে।

রামপ্রসাদ যে দিন হইতে এই বাটীতে আসিয়াছেন, পেয়ারী বিবি নাম্নী এক নর্ত্তকী পাশের ঘরে আসিয়া আস্তানা লইয়াছে। তাহার দিবা-রাত্রিব্যাপী চেষ্টা রামপ্রসাদকে সুখী করা বা তাহাকে স্ফূর্ত্তি দেওয়া। খাবার সময় পেয়ারী বিবি খাদ্যদ্রব্যের থালা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসে, 'এটা খান ওটা খান' বলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করে। বাটীর প্রত্যেক লোকই পরস্পরের মধ্যে চেষ্টা করিতেছে—কে রামপ্রসাদকে অধিক সুখী করিতে পারে। এত সুখ বোধ হয় রামপ্রসাদের জীবনে কখনও হয় নাই। রামপ্রসাদ ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এই জীবন কিম্বা পূর্ব্ব-জীবনে কি এমন পুণ্য করিয়াছিলেন—যাহার কারণে এ জীবনে তাঁহার এত সুখ।

যে দিন রামপ্রসাদ এই বাটীকে আসিয়া উঠিলেন, সে দিন সন্ধ্যার সময় হরদম তাজারাম রামপ্রসাদকে বলিয়া গেল, "দেখুন, আপনি দেশ হইতে নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন, আপনার এই বাটী হইতে বাহির যাইবার প্রয়োজন নাই। আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনি হুকুম করিলেই পাইবেন। দশ পনর দিন থাকার পর আমার লোক আপনাকে কলিকাতার নানা স্থান দেখাইয়া আনিবে।"

হরেকচাঁদকে দোতলার একখানা ঘর দেওয়া রইয়াছে, তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, সব তাহাকে সেই স্থানে দেওয়া হইয়াছে। পদ্মা নামে এক যুবতীকে তাহার খিদ্‌মতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। অতএব সেও আতিথ্যের প্রাচুর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে।

তেতলার একটি বড় ঘরে প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাস ইত্যাদি খেলা হয়। সেখানে অনেক ধনীর সন্তান খেলা করেন, আমোদ করেন, স্ফূর্ত্তি

করেন এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া চলিয়া যান। সিঁড়িতে বারান্দায় দারোয়ানের পাহারা। প্রত্যেককেই দেখিলে যমদূত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহারা এত মিঠে হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা অতিশয় কঠিন। যাহারা হারিয়া চলিয়া যায়, এই দারোয়ানরা তাহাদিগকে বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। পুলিসে যাইলে তাহাদের কিছুই সুবিধা হয় না। সাব-ইন্সপেক্টার, এসিষ্টেণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার বা মুন্সীকে নালিশের কথা বলিলেই তাহারা বলে, "বাপু, জুয়া খেলিতে গিয়া হারিয়া আসিয়াছ, তাহার আবার মামলা কি? ভদ্রলোকের সন্তান, চুপচাপ ঘরে ফিরে যাও, না হইলে বিপদের সম্ভাবনা।"

ইহাদের মধ্যে এক জন লোক, যাহার নাম বাণীকান্ত ভট্ট, থানাতে গিয়া নিম্নলিখিতভাবে নালিশের কথা বলেন :—

"আমাকে বাড়ীর উপরে লইয়া গিয়া যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। আমি জুয়া খেলি নাই বা খেলিবার মতলবে সেখানে যাই নাই। Contractএ কাজ দিব বলিয়া সেই স্থানে লইয়া যায় এবং রাজাবাহাদুরের সঙ্গে বালীতে গঙ্গার ধারে বাটী তৈয়ারী করিবার Contractএর কথাবার্ত্তা হয়; যখন কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গেল, সেই সময় আর এক জন লোক সেই বাড়ীর Contract লইব বলিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। রাজাবাহাদুর তাহাকে বলিলেন, (আমাকে দেখাইয়া দিয়া) এই লোকের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গিয়াছে।

"তখন নব অভ্যাগত লোকটি বলিয়া উঠিল,—'আরে মশাই, আমি উঁহাকে খুব ভাল রকম চিনি, ইঁহার বাটী তৈয়ারী করিবার সামর্থ্য কোথায়? আপনি অগ্রিম টাকা তাহাকে না দিলে; সে কিছুতেই বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিতে পারিবে না। এই নিন্, আমি ৫ হাজার টাকা

জমা দিতেছি, ও যদি ১০ হাজার টাকা জমা দিতে পারে ত কাজটি ওকেই দিবেন, আর তা না পারিলে আমার এই ১০ হাজার টাকা জমা রহিল, কাজটা আমায় দিবেন।'

"সেই সময়ে বাটীর অপর একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, 'মহাশয় শীঘ্র করিয়া আপনি ৬ সহস্র টাকা জমা দিন, ও ৫ হাজার টাকা দিতেছে, আপনি ১ হাজার টাকা বেশী দিলে, কাজটা আপনিই পাইবেন। আমি বলিলাম, 'আমার কাছে মোট ৪ হাজার টাকা আছে, আমি ৬ সহস্র মুদ্রা কোথা হইতে দিব ?'

"তাহাতে, ফিস্-ফিস্ করিয়া পরামর্শদাতা বলিল, 'আমি তোমাকে ২ হাজার টাকা ধার দিতেছি, তুমি লাভ হইলে আমাকে ৩ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিও।'

"তাহার পর আমি ৬ হাজার টাকা বাহির করিলাম এবং বলিলাম, 'রাজাবাহাদুর, এই লোকটি বলিতেছে, আমার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ, আমার পুঁজিপাটা নাই। এই দেখুন, আমার ৬ হাজার টাকা আছে।'

"এই বলিয়া আমি ৬ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিলাম।

"এই দেখিয়া রাজাবাহাদুর 'কোই হ্যায়" বলিয়া আওয়াজ দিলেন, এবং দুই জন লোক আসিলে পর বলিলেন, 'খাতাঞ্জি।'

"এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পোষাক একটু নূতন ধরণের। পায়জামা, আচকান, লপেটা জুতা এবং মাথায় জরীর টুপী। তিনি আসিয়াই রাজাবাহাদুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'হুজুর, আপনি ডাকিতেছেন ?'

"রাজাবাহাদুর বলিলেন, 'হ্যাঁ, এই লোকটি বালীর বাটীর Contract নিলেন, ইহার নামে ৬ হাজার টাকা জমা করিয়া লও। ঠিক

সময়ে কার্য্য শেষ করিবার জন্য এই টাকাটা security deposit থাকিবে।'

"এমন সময় ঐ নব অভ্যাগত লোকটি বলিয়া উঠিল, 'হুজুর, আমি ৭ হাজার টাকা জমা দিব।' তাহাতে খাতাঞ্জিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে মশাই, এ কি চালাকির কথা? ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গিয়াছে, রাজাবাহাদুর কথা দিয়াছেন, তাহার উপর কি আর নূতন কথা চলে?'

আমি খাতাঞ্জির কাছে টাকা জমা দিলাম, মনে করিলাম, ইহাদের কি ধর্ম্মের সংসার; কথার নড়চড় হইবার উপায় নাই! সে রাত্রে দেওয়ানজী বলিলেন, 'কাল আসিবেন, আজ রাত্রি হইয়াছে, কাল প্রাতে আসিলে এই টাকার রসিদ দিব আর Contractএর লেখাপড়া করিয়া দিব।' এমন সময় যে লোকটি আমায় ২ হাজার টাকা সরবরাহ করিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল,—'খাতাঞ্জি বাবু, এই ৬ হাজারের ২ হাজার টাকা আমার, কার্য্যের বিল পাশ হইলে ইনি আমার ২ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ৩ হাজার টাকা দিবেন, আপনার খাতাতে এটুকু লিখিয়া লইবেন।'

এ ধর্ম্মের সংসার, এখানে সবই বিশ্বাসের উপর চলে!

ইহার পর দু'তিন দিন হাঁটিলাম, আজ না হয় কাল. 'আজ রাজাবাহাদুর বাহিরে গিয়াছেন,' 'আজ আমার শরীর খারাপ,' 'আজ আমার সময় নাই' ইত্যাদি নূতন নূতন ওজর আপত্তি দ্বারা আমার রসিদও পাইলাম না, Contract'ও পাইলাম না। ১০।১২ দিন বাদ এক দিন দেওয়ানজী আমাকে বলিলেন, 'মশাই, আপনি রসিদের জন্য এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? বালীতে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন, কার্য্য সুরু হইলে রসিদ দেওয়া হইবে।'

আমি তাহাতেই রাজি হইলাম; রাজাবাহাদুরের লোক যাইয়া বালীতে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেই জায়গায় যাইয়া প্ল্যান (Plan) তৈয়ারী করিবার জন্য মাপ-জোপ করিতেছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল, 'আপনি এ জায়গায় মাপ-জোপ করিতেছেন কেন?' তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি হরদম তাজারামের হুকুম মোতাবিক এ স্থানের প্ল্যান তৈয়ার করিতেছি, এখানে বাটী নির্ম্মাণ হইবে।'

ইহা শুনিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সে কি মশাই, এ জমি আমার। হরদমম তাজারাম কে? এ জমিতে তাহার অধিকারই বা কি?"

আমি শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খাতাঞ্জিকে সকল কথা বলিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, কে? টাক মাথা, ছিপছিপে, সুন্দর গৌরবর্ণ, মুখে বসন্তের দাগ, সেই লোকটি বলিয়াছে? সে লোকটি বিকৃতমস্তিষ্ক, সে প্রায়ই বলিয়া থাকে, এ জমি তাহার।'

এই কথা শুনিয়া আমি সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, হইতে পারে, বালীর লোকটি পাগল, দেওয়ানজী বাবু লোকটির যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে ইনি সে লোকটিকে বিশেষ-রূপে জানেন, তাহা না হইলে তিনি লোকটির আকৃতির ও অবয়বের কথা কিরূপ ভাবে বলিলেন?

এইরূপ করিয়া আরও ১৫ দিন চলিয়া গেল। শেষে এক দিন যখন আমি রসিদের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলাম, তখন আমায় দরোয়ান দিয়া তাড়াইয়া দিল।

ইহা শুনিয়া সাব-ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন, "আরে মশাই, কলকাতায় কি অরাজক? তাও কি হয়? আমাদের হদ্দায় এরূপ অন্যায় হইতে

পারে না, যাও, যাও, তুমি মিথ্যাবাদী, একটা গল্প বানাইয়া আনিয়াছ।”

এই বলিয়া সাব-ইন্‌স্পেক্টার তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

যেমন মহারণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, কাঠবেড়ালি, মূষিক, বাঘের মাসী বিড়াল এবং অজাগর সাপ ছোট বড় সকলেই বাস করে ইহাদের মধ্যে অনেকের হিংসাপ্রবৃত্তি থাকিলেও সকলে এক রকম সুখে-দুঃখে জীবন যাপন করে; কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতেও সেইরূপ সকল রকম লোকেরই বাস আছে। ধনকুবের ও নিঃস্ব ভিখারী, সাধু ও জুয়া-চোর, ডাকাত ও চোর এবং তাহাদের ধরিবার জন্য পুলিস ও লোকজন সকলেই এই মহানগরীতে বাস করে। পুণ্যশ্লোক লোকের বাস আছে বলিয়া যে অসতের স্থান নাই, তাহা নহে; এই নগরীতে সকলেরই বাস আছে. ভক্ষ্য ও ভক্ষক উভয়েরই স্থান আছে। প্রতারক ও প্রতারিত উভয়েরই স্থান আছে। কাজেই ভক্ষক হরদম তাজারামের এই সহরে স্থান আছে, এবং ধনীর বিপথগামী সন্তানদেরও এই নগরীতে স্থান আছে। এই স্থানে উকিল, কৌন্সলী ও মোক্তারদেরও স্থান আছে, আর যাহারা মোকর্দ্দমা করিয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইবে, সেই সর্ব্বহারাদেরও স্থান আছে।

রামপ্রসাদের এই বাটীতে আসার পর ১২ দিন বাদে এক দিন হঠাৎ তাহার নজর পড়িল, তাহার দুইটি ষ্টিল-ট্রাঙ্ক, যাহাতে টাকা ও গহনার বাক্স আনিয়াছিল, সে দুইটিই তাহার ঘরে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে তদনুরূপ অপর দুইটি ষ্টিল-ট্রাঙ্ক আছে, যাহা দেখিতে তাহার ষ্টিল-ট্রাঙ্কের অনুরূপ। তাহার নিকটে যে চাবি দু'টি ছিল, তাহার দ্বারাই সেই ষ্টিল-ট্রাঙ্ক খোলা গেল। একটি খোলা হইলে দেখা গেল, পাঁচ ছয় হাজার টাকা নোটে ও টাকায় সেই বাক্সে আছে। আর একটি খুলিয়া দেখা

গেল, তাহাতে কতকগুলি কেমিক্যালের গহনা ও নকল ঝুটা হীরা-মুক্তা আছে। ইহা দেখিয়াই তাহার মন খারাপ হইয়া গেল, ভাবিতে লাগিল, এ কি!

এই বাটিতে আসিবার ৮ দিন বাদে মদনরামের নামে এক টেলিগ্রাম আসিল। সেই টেলিগ্রাম পাইবার পর মদনরাম হরেকচাঁদকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিল। তাহারা বাঁকিপুরে চলিয়া গেল। যখন রামপ্রসাদ দেখিল, তাহার অধিকাংশ টাকা ও গহনা নাই, সে একটু চিন্তিত হইল। তাহার ষ্টিল ট্রাঙ্কে গহনা ও টাকা না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের এই অতিথিসৎকারে কোনরূপ তারতম্য হয় নাই, কিন্তু তাহা না হইলেও রামপ্রসাদের আহারে সেরূপ রুচি নাই, আর সে পেয়ারীর সোহাগে সেরূপ বিভোর হয় না। তখনও আসল ব্যাপার সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার মনের কথা পেয়ারীকে সমস্তই বলিল। পেয়ারী শুনিয়া বলিল, "রাজা বাবু, পেয়ারী রামপ্রসাদকে রাজা বাবু বলিয়াই সম্ভাষণ করিত) হরদম তাজারাম বাবু খুব ভাল লোক। তিনি অতিশয় ধাম্মিক, দয়ার্দ্রচিত্ত ও দয়ালু। তবে মদন বাবু, যিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি তত ভাল লোক নন। হরদম তাজারাম বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলে, তিনি সেই অভ্যাগতটিকে এক মাসের পূর্ব্বে যাইতে দেন না। যাহাই হউক, আপনি আরও ১০।১৫ দিন এখানে থাকুন। ইহার পর আমরা দুজনে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার দেশে যাইব। সেখান হইতে লোকজন লইয়া মদনের সন্ধানে যাইব। সম্ভবতঃ আপনার জিনিসগুলি মদনের ওখানে পাওয়া যাইবে। মদন একটু লোভী লোক। তাহার বাড়ীতে যাইলেই আপনার সব জিনিসপত্র পাওয়া যাইবে।"

পেয়ারী আরও বলিল, "আর আমার নিজের কথা বলিতেছেন, আপনি

আমাকে যে ফাঁসে ফেলিয়াছেন, আপনাকে ছাড়িয়া আমি কোনমতেই জীবন রক্ষা করিতে পারিব না। পেয়ারী রাজাবাবুর পেয়ারী, অন্যের উপভোগ্য হইতে পারে না।"

এইরূপ ভাবে আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল। শেষে এক দিন রামপ্রসাদ ঐ দুইটি বাক্স লইয়া পেয়ারীর সাহায্যে সেই বাটী পরিত্যাগ করিল। ষ্টেশনে পৌছিবার কিয়ৎক্ষণ পরে মদন পুলিস সমভিব্যাহারে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল এবং পুলিসকে দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করাইল। বাক্স দুইটি খুলিলে দেখা গেল, তাহার ভিতর মদনের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নাম-লেখা জামা ও তৈজসপত্র আছে। মদন সেই সব জিনিস সনাক্ত করিল। পেয়ারী তাহার সাক্ষী। পেয়ারী বলিল, "হাঁ, এই লোকটি এই সব জিনিস লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও ভুলাইয়া তাহার বাটী হইতে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।" রামপ্রসাদের কাণের টপ ও গলার হার পেয়ারীর গলায় দেখা গেল। বাড়ী হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিবার সময় পেয়ারী সেই সকল মূল্যবান্ গহনা নিজের অধিকারে লইযাছিল। সে পুলিসের সম্মুখে বলিল, "এই শেঠজি আমার নিকট এক হাজার টাকা ধারে। কলিকাতায় আসিয়া কাপ্তেনী করিবার জন্য আমার কাছে ধার লইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, দেশে যাইবার পূর্ব্বে টাকা মিটাইয়া দিয়া যাইবে। আজ যখন শুনিলাম, দেশে যাইবেন, তাহাতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমার সহিত ষ্টেশনে আসিও, দেশ হইতে আমার লোক আসিবে, তাহাকে আমি লিখিয়াছি, সে তোমার হাজার টাকা লইয়া আসিবে।' তিনি আমার সঙ্গে সময় কাটাইয়াছেন, সেই জন্য এই গহনা গুলি উপহার দিয়াছেন।"

পুলিশ মদনের নালিশে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং থানায় চালান দিল। যখন হাওড়ার ষ্টেশনে গোলমাল হইতেছিল, জগঝম্প চোবে নামে

শিবঠাকুর গলিস্থিত এক চোবে রামপ্রসাদকে দেখিতে পাইল। সে রামপ্রসাদ ও তাহার আত্মীয়স্বজনকে চিনিত। রামপ্রসাদের মাতুলবংশের সে বিশেষ অনুগত। সঙ্গে সঙ্গে সে থানায় গেল, এবং সেখান হইতে মোটামুটি সব খবর সংগ্রহ করিল, এবং রামপ্রসাদের মাতুলকে টেলিগ্রাম করিল—

"তোমার ভাগিনেয় রামপ্রসাদের মহাবিপদ, সে কলিকাতায় জোড়াসাঁকো থানায় বন্দী আছে, তুমি টেলিগ্রাম পাইবামাত্র আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইতি

জগঝম্প চোবে।

৩নং শিবঠাকুরের গলি, কলিকাতা।"

সুখের সময় আত্মীয়স্বজন আত্মীয়ের মত ব্যবহার পায় না! লোকে মনে করে, তাহাদের নিজ নিজ সুবিধার জন্য আত্মীয়েরা আত্মীয়তা করে। ইহার মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও বিপদের সময় আত্মীয়রাই সাহায্য করে, বাহিরের লোক নহে।

মাতুল চিঠি পাইয়া জগঝম্প চোবের বাসায় আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, উকিল নিযুক্ত করিল আমাকে, তাহারও কারণও ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমি উঠিতেছি। কাজেই 'ফি' খুব বাড়ে নাই। দুই একটা কেসে মোটা ফি পাইতেছি, অধিকাংশ কেসেই সাধারণ ফি পাইতেছি। তবে কাজ করিতেছি Seniorদের মত। সন্ধান লইয়া দেখিলাম, ফরিয়াদী এক জন প্রবলপ্রতাপন্বিত, নামে লোক ভীতিপ্রদ, অনেক জবরদস্ত গুণ্ডার মালিক ঘুষখোর পুলিস-কর্ম্মচারীর ত কথাই নাই, যাহারা সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পুলিস-কর্ম্মচারী, তাহারাও তাহাকে ঘাঁটাতে চাহে না, কি জানি উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করিয়া কি বিপদে ফেলিবে।

আমি মামলা লইলাম বটে, কিন্তু কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেই সময়ে এ মামলাটি যে হাকিমের ঘরে পড়িল, তিনি একজন জবরদস্ত হাকিম। ফরিয়াদীর তরফ হইতে কোর্ট-ইন্সপেক্টার মামলা চালাইতেছে, তথাপি ফরিয়াদীর মালিকের তরফ হইতে ৩ জন নামজাদা উকিল নিযুক্ত আছেন—মোকর্দ্দমাটির গতি দেখিবার জন্য।

আসামী এত দিন হাজতেই ছিল। পুলিস ১৬ আনার অধিক ২০ আনা ফরিয়াদীর দিকে। আসামীর লাঞ্ছনার শেষ নাই। মামা ও জগ-ঝম্পর পিছনে লোক লাগিল, তাহারা সকলেই তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে লাগিল, রামপ্রসাদ দোষী, পাপী ও নারকী। নিশ্চয়ই চিরকাল এই কার্য্যই করিয়া আসিতেছে। এইবার হরদম তাজারামের লোকের জিনিষ চুরি করিয়া বিপদে পড়িয়াছে। 'বার বার মোরগ খেয়ে যাও ধান, এইবার মোরগ যাবে তোর প্রাণ।'

আসামীকে সাহায্য করিবার জন্য যে কেহ চেষ্টা করিতেছে, তাহারই বিপদ, তবে চেষ্টা করিবার লোকও বেশী নাই। এক দিন তাহারা চোর বাগানস্থিত আমার বাড়ী আসিতেছে, এমন সময় ৩ জন লোক রাম-প্রসাদের মাতুলের পিছু লইল এবং কথাচ্ছলে তাহার মাতুল এবং শিব-ঠাকুর গলিস্থিত জগঝম্পকে বুঝাইয়া দিল, রামপ্রসাদের নিজকৃত পাপের সাজা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। তবে তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহারা কেন মারা যায়। যখন নৌকাটি ডুবিতেছে, মূষিকও নিজ প্রাণরক্ষার্থ সে নৌকা পরিত্যাগ করে। জনঝম্প চোবে অনেক দিন কলিকাতায় আছে, সে কলিকাতায় হরদম তাজারামের কি ক্ষমতা, তাহা জানে। তবে জানিয়া শুনিয়া কেন এ সর্পের গহ্বরে পা দিতেছে। কেন বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে? কিন্তু যখন দেখিল, তাহারা তাহাদের

কথায় কোন সায় দিতেছে না, তখন গালি দিতে দিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

নূতন হাকিমের কাছে মামলা চালান হইয়াছিল, আমি অপেক্ষাকৃত এক জন নূতন উকিল, সেই মামলা করিতেছি, আর আসামী ত নূতন বটেই। ফরিয়াদী এক জন পুরাতন লোক। পুলিস-কর্ম্মচারী এক জন পুরাতন অফিসার, আর তাহার তরফের উকিলেরা ত পুরাতন বটেই। মামলা ডাক হইলে আসামীকে হাজত হইতে আনা হইল, আমিও তাহার উকিলরূপে উপস্থিত হইলাম। কোর্ট-ইন্সপেক্টারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"ইহা একটা কৃতঘ্ন লোক কর্তৃক চুরির মামলা। আজকালকার দিনে কৃতঘ্ন লোকেরই দল বেশী। কাহারও উপকার করিলে সে উপকার না মানিয়া উপকারকের অপকার করিতেই চেষ্টা করে, আর পুলিস না থাকিলে সেই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হয়।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার মোকর্দ্দমাটি বিশেষভাবে বিবৃত করিলেন। আমি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম, "যদিও সাধারণতঃ আসামী তাহার মামলার অবস্থা প্রথম হইতেই আদালতকে ও অপর পক্ষকে জানায় না, আমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে চাই। কারণ তাহা না হইলে আমি আপনার সহানুভূতি পাইতে পারিব না। এই মোকর্দ্দমাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া এই মামলাটি চালান হইয়াছে।"

এই বলিয়া মোকর্দ্দমাটির আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সমস্ত হাকিমকে জানাইলাম। আমি আরও বলিলাম যে, "আসামীর জবাব, সুরু হইতে না বলিলে চুরির মামলায় আপনি জামীন নাও দিতে পারেন। কিন্তু যদি আসামীর জামীন না পাই, তাহা হইলে মামলা চালান আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িবে।"

আসামীর জবাবের কথা শুনিয়া কলিকাতার নূতন হাকিম প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই চাহেন না যে, এই সব কথা সত্য হইতে পারে। ক্রমেই যখন আমি জোর করিয়া বলিলাম, হুজুর, আপনি ভাল করিয়া এই মামালার বিচার করুন, আসামী'দের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া জানিতে পারিবেন। ফরিয়াদী এক জন জবরদস্ত ধনী লোক, পুলিসও যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দন, এরূপ অবস্থায় আসামী জামীন না পাইলে মামলা চালাইতে পারিবে না।"

কোর্ট-ইন্সপেক্টার।—হুজুর, কলিকাতার পুলিস কোর্টের আসামীরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের বংশধর। আর ফরিয়াদী ও পুলিস ইহারাই অন্যায়ের অবতার। যাহা হউক, আসামীদের নিন্দাবাদ সত্ত্বেও পুলিস এখনও বাঁচিয়া আছে ও বোধ হয় ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে।

ইহার পর ফরিয়াদী ও ৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। আসামীর মামলার কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া হাকিম প্রত্যেক সাক্ষীকে দু'দশটি করিয়া প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার ফলে আমার জামীনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। জামীন হইল জগঝম্প চোবে।

দিনের পর দিন ধরিয়া মামলা চলিতে লাগিল। মামলার শেষে আসামী খালাস হইল।

মামলা সুরু হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দিন আমি ভগবানের নাম লইয়া প্রার্থনা করিতাম, "দেখো প্রভু, যেন আমার দোষে এই লোকটির সাজা না হয়। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, এ লোকটি নির্দ্দোষ ; বিনা কারণে বিপদে পড়িয়াছে, দেখো প্রভু, তোমার বিপদভঞ্জন নামে যেন কালিমা না পড়ে।"

যতদূর ক্ষমতা, চেষ্টা করিয়া জেরা করিতে লাগিলাম, ভগবানের দিকে ও বিবেকের দিক কেবল তাকাইয়াছিলাম, অন্য কোন দিকে

তাকাই নাই। যত আমি ফরিয়াদীকে জেরা করি, তত সে বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিতে লাগিল এবং স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল যে, সে সিধা জবাব দিতেছে না।

যাহাই হউক, সত্যের জয় হয়। এই নিরাপরাধ আসামীর খালাস হইল এবং ফরিয়াদী ও অপর অপর তাহার দুই জন পৃষ্ঠপোষকের নামে মিথ্যা মোকর্দ্দমা চালাইবার হুকুম হইয়া গেল।

আদালত হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় রামপ্রসাদ বলিল, "ভগবান্, তাজা রক্তের জোরে আমি বরাবর মনে করিয়াছি, পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, ভগবান্ নাই, এ সংসারে জোর যার মুল্লুক তার। এখন দেখছি, এ বিশ্বাস অমূলক। এ রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য, যথা ধর্ম্ম তথা জয়। আর যদিও আত্মীয়রা অনেক সময়ে অনাত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ঘোর বিপদে আত্মীয়রাই সাহায্যে রত হয়। আর কলিকাতা সহর,—ইহা অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে যেমন ধূলামুঠা ধরিলে কড়ি-মুঠা হয়, সেইরূপ সর্ব্বসময়েই এই স্থানটি বিপৎসঙ্কুল। গাড়ী চাপা পড়িয়া মরা ও মোটর চাপা পড়িয়া মরা ত আছেই, বদমায়েসদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া চাপিয়া মরা প্রত্যহ ঘটিতেছে। তবে ইহার কুহক এমন যে, লোক ঠকিতেছে, দেখিতেছে, মরিতেছে, আর সেই সব দেখিয়াও মৃত ব্যক্তির পার্শ্বস্থিত লোকের চৈতন্য হইতেছে না, সে ঠেকিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া বিপদের মধ্যে পড়িতেছে, আর চক্রীর চক্রতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে।

———

ত্রয়োদশ কথা

"বন্ধুরূপে অরি।"

"বন্ধুর পোষাকে অরি অতি ভয়ঙ্কর।" যিনি বন্ধু, তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, যাহা আমার পক্ষে মঙ্গলকর, তিনি সর্ব্বদা তাহাই করিবেন আমার সুখে তিনি সুখী, আমার দুঃখে তিনি দুঃখী, আমার উন্নতিতে তিনি উল্লসিত, আমার বিপদে তিনি ভগ্নচিত্ত।

বন্ধু সকলের কাম্য। জগতে যতগুলি শুভ অনুষ্ঠান আছে, বন্ধুত্ব সেগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রকাশ্য শত্রুতা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, শত্রু সব সময়েই আমার অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আমার অশুভে তাহার আনন্দ, আমার অমঙ্গলে তাহার কৌতুক।

বন্ধুকেও বুঝা যায়, শত্রুকেও বুঝা যায়, কিন্তু বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া যে শত্রুতা করে, তাহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্বসময়ে কষ্টসাধ্য। বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া আমার নিকট আসিতে পারিতেছে এবং আমার গলা জড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা পাইতেছে; সেই সুযোগ পাইয়া যদি অপর পক্ষ আমার গলা চাপিয়া ধরে, সেইরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন। আমি শত্রুপক্ষকে চিনিতে পারিয়াই পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে পারি এবং পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষা হেতু বিশেষ সতর্ক হই; কিন্তু যিনি বন্ধুভাবে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমার গলা চাপিয়া আমাকে মারিতে চান, তাঁহা হইতে আত্মরক্ষা করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

বন্ধুরূপে অরি

সমাজে এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহিরে বন্ধুত্বের ভাণ করে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিষকুম্ভের ন্যায় আমার সর্ব্বনাশসাধন করে। এই প্রকার 'মুখে মধু, হৃদে বিষ' লোক লইয়া জীবনযাত্রা করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। এই সব কারণেই বলিতে-ছিলাম, বন্ধুত্বের আবরণে শত্রু অতি ভয়ঙ্কর।

এ জগতে প্রত্যহ ছদ্মবেশী বন্ধুর হাতে লোক লাঞ্ছিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে, তাহারই একটি উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি।

মিসেস এলাইজা যখন মিস্ টফি ছিলেন, তখন মিঃ এলাইজা তাঁহাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর ১০ বৎসরকাল সুখে দুঃখে উভয়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের দুইটি পুত্র-সন্তান ও দুইটি কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল। পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না।

এক দিন রাত্রি ২টার সময় মিসেস্ এলাইজাকে একটা কাঁকড়াবিছা দংশন করিল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির। কাঁকড়াবিছার দংশনে যদিও মানুষ মরে না, তথাপি এত যন্ত্রণা পায় যে, তাহা অসহ্য।

রাত্রি ২টার সময়েই মিঃ এলাইজা ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই ডাক্তারের দরজা বন্ধ। এইরূপ করিয়া এক ডাক্তারের দরজা হইতে অপর ডাক্তারের দরজায় যাইলেন, কিন্তু কোন ডাক্তারকেই পাইলেন না। শেষ রাত্রি ৫টার সময় নূতন ডাক্তার মিষ্টার মুখার্জীকে পাওয়া গেল এবং মিঃ এলাইজা ঐ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহাদের প্রতিবাসী মিসেস গোমেস মিসেস্ এলাইজার ক্রন্দন শুনিয়া সেই স্থানে

আসিয়া টোটকা ঔষধ দিয়া তাঁহার যন্ত্রণার অনেক উপশম করিয়া দিলেন।

এখন যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে লোক টোটকা ঔষধে বিশ্বাস হারাইতেছে। ইদানীং কথায় কথায় সামান্য কারণে ডাক্তার ডাকা হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী নাড়ী দেখিতে পারিতেন, সামান্য সামান্য অসুখে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিতেন, ফলে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে হইত না; আর ডাক্তার ডাকিবার আনুসঙ্গিক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। অনর্থক ডাক্তারের দর্শনী দেওয়ার হাত হইতে গৃহস্থ রক্ষা পাইত। অধুনা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দর সস্তা হওয়ায় গৃহস্থের দরকার হইলেই প্রতিবাসী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ লন, আর না হয় বিনা ব্যয়ে, না হয় অতি স্বল্পব্যয়ে ঔষধ পান। অসময়ে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইলে তাহাকে না পাওয়া ও একটি চিকিৎসকের জন্য দ্বারে দ্বারে রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়ান অতিশয় কষ্টদায়ক। রাত্রিকালে Senior Doctor ত পাওয়া যায়ই না, Junior Doctor পাওয়াও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য।

বিলাতবাসীদের কিন্তু এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। প্রত্যেক Countyতেই কতকগুলি করিয়া ডাক্তারের একটি Panel আছে। সেই তালিকায় যে যে ডাক্তারের নাম আছে, রোগীর তরফ হইতে ডাক পড়িলে তাঁহাদের যাইতেই হইবে। দর্শনীর টাকাও ঠিক করিয়া দেওয়া আছে। রাত্রিকাল বলিয়া কোন ডাক্তার অধিক ফি চাহিতে পারিবেন না, আর রোগীর তরফ হইতে তাঁহাকে ডাকিতে যাইলে তিনি আসিতে বাধ্য। যদি আসিতে অস্বীকার করেন, তাহার পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিলে ঐ ডাক্তারের নামে শমন বাহির হইবে এবং না আসিবার যোগ্যতর ও উপযুক্ত কারণ দেখাইতে

না পারিলে তাঁহার জরিমানা হইবে। ইহা অতি সুন্দর নিয়ম। এই নিয়মের দরুণ ডাক্তাররা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে পারেন না, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দর্শনী লইয়া অতি গভীর রাত্রিতেও রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য। তবে সব সুনিয়মেই ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার আছে।

এক সময়ে গভীর রাত্রিতে একটি লোকের অনেক দূরে যাইবার প্রয়োজন ছিল, ট্যাক্সি গাড়ী খুঁজিতে গেল, পাওয়া গেল না; যাহা একখানা পাওয়া গেল, সেও অত্যন্ত অধিক ভাড়া চাহিল। যে লোকটি গাড়ী খুঁজিতেছিল, সে খুব হুঁসিয়ার; হঠাৎ সে এক ডাক্তারের বাড়ী গিয়া উঠিল, ঘণ্টা বাজাইয়া ডাক্তারকে ডাকিলে ডাক্তার উপস্থিত হইল। তখন সে ডাক্তারকে বলিল, তাহার এক আত্মীয়ের অসুখ হইয়াছে সেই আত্মীয়ের বাটী সেই Countyর শেষভাগে।

এই বলিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়াই তাহারই মোটরে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ডাক্তারের যাহা ন্যায্য ফি, তাহা ডাক্তারকে দিয়া বলিল,—"ডাক্তার, রোগী এখন ভাল আছে, আপনাকে কষ্ট করিয়া উপরে যাইতে হইবে না।" এই বলিয়া ডাক্তারের হাতে ভিজিটের টাকা দিল এবং বিদায় লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। মোটরে আসিতে যে ভাড়া লাগিত, ডাক্তারের ফি তাহা অপেক্ষা কম লাগিল।

রাত্রিতে লোক খোঁজা অতিশয় কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। আমি এক সময়ে খুনী মামলার কাগজ পড়িতেছিলাম, তাহাতে দেখিলাম, সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি লোক আহত হইয়াছিল, তার পরদিন ভোরে ৫টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। এই দশ ঘণ্টার মধ্যে আহত ব্যক্তির জীবনের শেষ জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। আমি ইহা দেখিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলাম এবং ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তাহার শেষ

জবানবন্দী কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লন নাই কেন? অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ত কম নয় এবং প্রত্যেক পাড়ায় চার পাঁচ জন করিয়া অনারারী হাকিম আছেন।"

তখন ইন্‌স্পেক্টার তাহার একটি রিপোর্ট দেখাইল। তাহাতে দেখা গেল, সে তাহার উপরওয়ালাদিগকে লিখিতেছে, যদিও সে দশ বারো জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে গিয়াছিল, কেহই কার্য্য করিতে রাজী হন নাই; কাহারও মাথা ধরিয়াছে, কাহারও স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছেন, কাহারও ভাই বাটীতে ফিরিয়া আসেন নাই, কাহারও বাত হইয়াছে, কাহারও ডাক্তারের বারণ ইত্যাদি নানাপ্রকার অজুহাতে কেহই আসিলেন না।

এই শ্রেণীর অবৈতনিম হাকিমরা হাকিমি করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। হাকিম-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার বিশেষ আগ্রহ, কিন্তু ভর্ত্তি হইবার পর সেই আগ্রহের এক-চতুর্থাংশও থাকে না। তাঁহারা অনেকেই নামের জন্য ব্যস্ত, কামের জন্য খুব কম।

আমার মতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানেই ডাক্তারের একটি করিয়া panel বা তালিকা থাকি উচিত। যে সকল ডাক্তারের নাম ঐ panelএ থাকিবে, সেই সকল ডাক্তারকে রোগীর জন্য ডাক পড়িলে যাইতেই হইবে, না যাইলে তাঁহাদের নামে মামলা চলিবে এবং বিশেষ কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাঁহাদের সাজাও গ্রহণ করিতে হইবে।

অবৈতনিক হাকিমদের পক্ষেও নিয়ম করা উচিত যে, তাঁহাদের ডাক পড়িলে তাঁহারা সর্ব্বসময়ে চরম জবানবন্দী লইতে ও আসামীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য। বিনা কারণে তিন চার দফায় যাইতে অস্বীকার করিলে অবৈতনিক হাকিমদের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম সরাইয়া দেওয়া উচিত।

কিছু দিন পরে এক দিন রাত্রিতে মিঃ এলাইজার প্রস্রাবের দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। মিঃ ও মিসেস্ এলাইজা দুই জনেই অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং মিসেস্ এলাইজা সেই রাত্রিতেই ডাক্তার আনিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া দুই ঘণ্টাকাল ঘুরিয়া মিষ্টার দে বলিয়া এক জন ডাক্তারকে আনিলেন। ডাক্তার প্রথমে লম্বা-চওড়া ফি হাঁকিলেন, শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া ডাঃ দেকে ন্যায্য Visitএ আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

লোক হিসাবে ডাঃ দে পাষাণ-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, তাহার উপর এক জন যুবতী তাঁহার দয়া-ভিক্ষা করিতেছেন। এক জন মানুষের তাঁহার দ্বারা যন্ত্রণার উপশম হইতে পারিবে, এইরূপ ভাবিয়া ডাঃ দে মিসেস্ এলাইজার সহিত আসিলেন। রোগীকে দেখিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং যন্ত্রণারও কথঞ্চিৎ উপশম হইল।

অধুনাতন উকিলদিগের মত ডাক্তারদেরও 'fancy fee' হইয়াছে। মুলতুবিও উকিলদের মত চলিয়াছে, অধিক অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা মানুষের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করেন না, অধিক ফি আদায় করিবার জন্য অনেকে অবৈধ পথ অবলম্বন করেন। বাড়ীতে স্ত্রীলোক প্রসব হইতে পারিতেছে না, ধাত্রী-ডাক্তারের বাটীতে গৃহকর্ত্তা গেলেন। ধাত্রী-ডাক্তার ঘরের বাহিরের বারান্দায় আসিয়া একটা লম্বা-চওড়া ফি'র কথা বলিলেন, "এই ফি না পাইলে আমি যাইব না।"

পূর্ব্বে ডাক্তারদের ও কবিরাজদের দয়া-মায়া ছিল। কবিরাজরা অতি অল্প প্রণামী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ঔষধের দাম অতি যৎসামান্যই গ্রহণ করিতেন। এখন ডাক্তারদের ফি ছাড়াও আরও অনেক খরচার ব্যবস্থা আছে—জুনিয়ার নম্বর ১, জুনিয়ার নম্বর ২, জুনিয়ার নম্বর ৩, ঔষধের তালিকাও একটি ছোট-খাটো অবৈতনিক ঔষধালয়ে যতগুলি

ঔষধ থাকে, প্রায় ততগুলি। পূর্ব্বে কবিরাজদের ঔষধ সপ্তাহে এক টাকা, পাঁচ সিকা,—খুব বেশী দুই টাকা ছিল, এখন সেই স্থলে ১২৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত কবিরাজদের সাপ্তাহিক ঔষধের দাম! ডাক্তাররা যেমন তিন চার জনে মিলিয়া রোগীর পাশের ঘরে বসিয়া পরামর্শ করেন, কবিরাজদেরও এখন তাহাই হইয়াছে। "সপাপিষ্ঠ-স্ততোঽধিকঃ। তাই বলিতেছিলাম, সরকার বাহাদুর প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তারদের একটি করিয়া panel করিয়া দিন। দিনেই হউক, রাত্রিতেই হউক, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ফি'তে রোগী দেখিতে যাইতে বাধ্য; না যাইলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। আজকাল মানুষের মনোবৃত্তি যেরূপ হীন হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত মুদ্গরের প্রয়োজন।

যাহা হউক, এলাইজা-দম্পতি সুখে-দুঃখে এক রকম সুন্দরভাবেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ১০ বৎসর এইরূপভাবে কাটিয়া গেল। শেষ তাঁহাদের শনিরূপে মিষ্টার ভেঙ্কার বলিয়া এক জন তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে উদয় হইল। সে এক দিন মিঃ এলাইজার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত, পরিচয় দিল, Toffyগণ তাহার নিকট-আত্মীয়। সে বলিল, মিসেস্ এলাইজা এক জন Miss Toffy ছিলেন। সেই জন্য সে পূর্ব্বকার আত্মীয়তাসূত্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই বাপের বাড়ীর নাম শুনিলে জিহ্বা হইতে লালা নিঃসৃত হয়।

মিঃ ভেঙ্কারের কথা শুনিয়া মিসেস্ এলাইজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুবিধা পাইলে সময়ে সময়ে তাঁহাদের বাসস্থানে আসিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

"সেদো ভাত খাবি?—না হাত ধোব কোথায়?"—মিঃ ভেঙ্কারের এইরূপ মানসিক অবস্থা। নিমন্ত্রণ পাইয়া নিজেকে অতিশয় ধন্য মনে

করিল এবং সে যে এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছে, তাহা সুন্দর ভাষায় মিসেস্ এলাইজাকে বুঝাইয়া দিল। এইরূপ করিয়া মিঃ ভেঞ্চার এলাইজাদের বন্ধুরূপে যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে মিঃ এলাইজার সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল এবং সে ঘন ঘন এলাইজাধামে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই জগতে অনেক বেকার লোক আছে, তাহারা কোনই কাজকর্ম্ম করে না, অথচ বেশ সুখে জীবন কাটাইয়া দেয়।

মিঃ এলাইজাকে সংসার চালাইবার জন্য সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। স্ত্রী-পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হয়।

মিঃ ভেঞ্চার কোনই কাজকর্ম্ম করে না। সে কি রকম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা বলা বড় শক্ত। কিন্তু এটা ঠিক, যখনই মিঃ এলাইজা কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতেন, মিঃ ভেঞ্চার তখনই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইত এবং মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই সে করিত—অবশ্য মিঃ এলাইজার অর্থে। সে প্রায় বলিত, মিসেস্ এলাইজা স্ত্রীরত্ন; তাঁহাকে সুখী করা প্রত্যেকমানুষেরই কর্ত্তব্য। মিঃ এলাইজা কাজ লইয়াই পাগল, মিসেস্ এলাইজার সন্তুষ্টির জন্য তিনি কি করেন? যে ব্যক্তি অর্থ উপায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিবার অধিকার নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসেস্ এলাইজা তাহা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিতেন, "আমার স্বামীর ত কোন দোষ নাই। তিনি আমাকে প্রগাঢ়রূপে ভালবাসেন, আমার সুখশান্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তিনি করেন। তিনি যে কর্ম্মক্ষেত্রে অধিক সময় অতিবাহিত করেন, তাহাও আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। তিনি অর্থ উপার্জ্জন না করিলে আমাদের খরচপত্র কোথা হইতে চলিবে? শুধু ত 'প্রেমসুধারস-পানে' বাড়ীওয়ালার

ভাড়া, মুদির বিল, চাকর-বাকরের মাহিনা, ধোবার খরচা কিছুই চলিবে না?"

মিঃ ভেঞ্চার।—মাপ করিবেন মিসেস্ এলাইজা। আপনার ন্যায় স্ত্রী-রত্ন আমার ভাগ্যে জুটিলে, আমি আমার মাথাটি আপনার পদতলে লুটাইয়া দিতাম। আপনার মত স্ত্রীরত্ন পাওয়া খুব অল্প মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

মিসেস্ এলাইজা।—আমাকে মাপ করিবেন। মোহের ছায়া আমার কাছে ধরিবেন না। আমি বেশ সুখে আছি, ইহা অপেক্ষা সুখ আমার ভাগ্যে সম্ভব নয়।

মিঃ ভেঞ্চার।—আপনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুর্লভ পদার্থ, সর্ব্বসময়েই স্বামীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যস্ত। আপনি ধন্যা, আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ধন্য। আপনি নারীকুলের দুষ্প্রাপ্য পদ্মরাণী।

এই সময় হইতেই মিঃ ভেঞ্চার প্রায়ই এলাইজা-ভবনে আসিত এবং মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত।

এক দিন মিসেস্ এলাইজার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিল। তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, সেই সময়ে ভেঞ্চার সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কথোপকথনে জ্ঞাত হইল, মিসেস্ এলাইজা অসুস্থ; তাহার হাত-পায়ে বেদনা অনুভব করিতেছেন। এই শুনিয়াই মিঃ ভেঞ্চার তাঁহার অসুস্থতার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং মিসেস্ এলাইজার পা দুইটি নিজের পায়ের উপর রাখিয়া টিপিয়া দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমার এক নিকট-আত্মীয় বড় ডাক্তার, তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, গা-পা কামড়াইলে, সেই স্থান টিপিয়া দিলে রোগী সুস্থ বোধ করিবে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার গা-হাত টিপিয়া দিবার অধিকার পাইয়াছি।"

মিসেস্ এলাইজা মিঃ ভেঙ্কারের হস্তদ্বয় হইতে তাঁহার পা দুটি বাহির করিয়া বলিলেন,—"মিঃ ভেঙ্কার! মাপ করিবেন,—আপনাকে দিয়া পা টিপাইতে আমি পারিব না। আপনারা সদিচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ইহার অধিক নয়।"

এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে প্রত্যেক স্বামীকেই, সুচারুরূপে সংসার চালাইবার জন্য ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত করিতে হয়। বাটীতে স্ত্রীর সহিত খোসগল্প করিয়া সময় কাটাইতে একবারেই সুবিধা হয় না, আর এই বেকারের দিনে অনেক বেকার যুবকেরই কাছে সময়ের কোনরূপ মূল্য নাই। তাহাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে, সেটুকু স্ত্রীলোকের সহিত গল্পগুজব করিয়া ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে। সর্ব্বদাই স্বামী যে সেই স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত নয়, তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। স্ত্রীলোকদের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সমস্ত সময়েই তাহারা তাহাদের কাছে হাজির থাকে, আর সয়তান-শিশুর ন্যায় সর্ব্বদাই অপরের স্ত্রীর সন্তুষ্টি-সাধনের জন্য নিজেকে তাহাদের চরণে বিকাইয়া দেয়। এই সব সময়ে আত্মরক্ষা করিতে গেলে ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই ঐ সকল স্ত্রীলোককে সাহায্য করিতে পারে না। ধর্ম্মশিক্ষাই আত্মরক্ষার একমাত্র ভিত্তি। ধর্ম্মের সাহায্য বিনা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই সৎপথে থাকিতে পারে না। সৎপথে থাকিবার জন্য ধর্ম্মই তাহার প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

এইরূপে কিছু কাল কাটিয়া যায়। মিসেস্ এলাইজাকে প্রাপ্তির স্পৃহা ভেঙ্কারের মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আজকাল সে প্রত্যহই মিসেস্ এলাইজার নিকট উপস্থিত থাকে এবং তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে থাকে। এই সব নীচ শ্রেণীর লোকের উদ্দেশ্য একই। যে কোন উপায়ে অপরের স্ত্রীকে ভুলাইয়া নিজ কবলে লইয়া আসা, আর কবলে আনিবার পর তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা।

সয়তান ক্রমশঃ মিঃ এলাইজার বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করিতে সুরু করিল। লোকটা এলাইজা-দম্পতির বন্ধু। তাঁহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে ভেঙ্কার বেদনা পায়, কিন্তু মনে মনে সে এলাইজার পরম শত্রু। কোন গতিকে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। অনেক অনুসন্ধানের পর সে মিষ্টার নস্‌ট্রাম নামে এক ব্যক্তিতে খুঁজিয়া পাইল। কথায় কথায় সে জানিতে পারিল, যখন নস্‌ট্রামের ভাগ্য ভাল ছিল, যখন দুঃখ-দৈন্য তাহাকে আক্রমণ করে নাই, তখন সে মিঃ এলাইজার কাছে ১ হাজার টাকা জমা রাখিয়াছিল। মিঃ এলাইজা মিঃ নস্‌ট্রামকে এই টাকার একখানি স্বীকারোক্তি দিয়াছিলেন। মিঃ নস্‌ট্রাম চাহে নাই, তবুও তিনি জোর করিয়া একখানি রসিদ দিয়াছিলেন। সময়ে মিঃ নস্‌ট্রাম সেই টাকাটি মিঃ এলাইজার কাছ হইতে ফিরাইয়া পাইয়াছিল, কিন্তু রসিদটি তাহার কাছেই রহিয়া গিয়াছিল। মিঃ নস্‌ট্রামের সময় তখন খুব খারাপ, অর্থকৃতচ্ছ্রতা তাহাকে চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময়ে কুমতি ভেঙ্কার তাহাকে বুঝাইয়া দিল, মিঃ এলাইজার অবস্থা এখন খুব ভাল, সে একটু চালাকি করিলেই তাঁহার কাছ হইতে কিছু টাকা আদায় করিতে পারে। অতএব অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া মিঃ এলাইজার নামে নালিশ করিতে নস্‌ট্রামকে সে রাজি করিল।

মিঃ ভেঙ্কারের অনেক উকিল-কৌন্সিলীর সহিত আলাপ। এক জন জুনিয়র কৌন্সিলী ও জুনিয়র উকিলের মুরুব্বি সাজিয়া তাহাদিগকে দিয়া বিশ্বাসঘাতকতার এক মামলা রুজু করিয়া দিল। দরখাস্তে লিখিয়া দিল, টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে এক বৎসর পূর্ব্বে। টাকাটি এলাইজার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়, আর পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াও সে টাকাটি ফেরত পায় নাই। ও দিকে মিঃ নস্‌ট্রামের বন্ধুরূপে তাহাকে দিয়া সে মামলা

রুজু করাইল এবং এলাইজা-দম্পতির বন্ধুরূপে তাঁহাদের ভাগ্যগগনে উদয় হইয়া আসামীর তরফে মামলার তদ্‌বির করিতে লাগিল।

মিঃ এলাইজা আমাকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং তিনি আমাকে তাঁহার উকিলরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি যখন আমার চোরবাগানস্থ বাটীতে আসিয়া মামলার বিষয় আমাকে সব বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, মিঃ ভেঙ্কারও সেই সময়ে উপস্থিত ছিল, সে মোকদ্দমার বিষয় বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "মিঃ সাধু, মিঃ এলাইজা আমার ভাইয়ের অধিক, আর মিসেস্ এলাইজা যদিও আমার সহোদরা নয়, তত্রাপি তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি নিজেকে বলিদান দিতে রাজি। এমন কিছু কার্য্য নাই, যাহা আমি মিসেস্ এলাইজাকে সুখী করিবার জন্য করিতে পারি না।"

মিঃ এলাইজা, মিসেস্ এলাইজা ও মিঃ ভেঙ্কার তিন জনে আসিয়া আমাকে মোকদ্দমার বিষয় বুঝাইয়া দেন। মিঃ ভেঙ্কার এক দিন এলাইজা-দম্পতির সম্মুখেই আমাকে বুঝাইতে লাগিল, "দেখুন মিঃ সাধু! ইঁহারা ধর্ম্মভীরু লোক, কোন কারণেই ইঁহারা মিথ্যা বলিবেন না। মিঃ নস্‌ট্রাম যে তাঁহার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা সত্য কথা, তিনি সে কথা কোনমতেই অস্বীকার করিবেন না, তবে এ কথাও সত্য, তিনি ঐ টাকা তাহাকে ফেরত দিয়াছেন।"

মিঃ এলাইজা।—মিঃ ভেঙ্কার যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মিঃ নস্‌ট্রাম আমার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহার পর সে সেই টাকা ফেরত লইয়া গিয়াছে।

আমি।—তাহা হইলে ত পাপ চুকিয়া গিয়াছে। টাকা যখন ফেরত দেওয়া হয়, সে সময়ে কি রসিদ লওয়া হয়?

মিঃ এলাইজা।—না।

আমি।—তাহার কোন সাক্ষী-সাবুদ আছে ?

মিঃ এলাইজা।—না।

মিঃ ভেঞ্চার।—তুমি অত্যন্ত নির্ব্বোধের ন্যায় উত্তর করিতেছ। (আমার দিকে ফিরিয়া) মিঃ সাধু! আমার বন্ধু, মিঃ এলাইজা বিপদে পড়িয়া সব ভুলিয়া যাইতেছেন। যখন টাকা ফেরত দেওয়া হয়, তিন জন লোক সাক্ষী আছে। মিঃ চিক্, মিঃ ডিক্, মিঃ টিক্।

মিঃ এলাইজা।—আমি ত ইহাদের চিনি না।

মিঃ ভেঞ্চার।—তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, এ তিন জনেই তোমাকে চেনে, আর তুমি যখন টাকা ফেরত দাও, তাহারা উপস্থিত ছিল।

মিঃ ভেঞ্চার এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন সে সবই জানে। মিসেস্ এলাইজাও স্বামীর বিপদে বিশেষ বিপন্না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, "মিঃ ভেঞ্চার যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুন,বিপদে পড়িয়া তুমি সব ভুলিয়া যাইতেছ।"

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। আমি আসামী পক্ষের উকিল। মিসেস্ এলাইজা, মিঃ এলাইজা ও মিঃ ভেঞ্চার আমাকে মোকর্দ্দমার সাক্ষী-সাবুদ বিষয় ওয়াকিভাল করিতে লাগিল। আমি তাহাদের তিন জনকার নিকট হইতেই মোকর্দ্দমার অবস্থা অবগত হইতে লাগিলাম।

মামলা চলিতে লাগিল। চার পাঁচ দিন মামলা চলিবার পর ফরিয়াদীর উকিল আমাকে বলিলেন,"আপনি আপনার মক্কেলকে বলিয়া আমার মক্কেলকে কিছু টাকা পাওয়াইয়া দিন, তাহা হইলে সে মামলা তুলিয়া লইবে।" কথায় কথায় তিনি আরও বলিলেন, ১ শত টাকা পাইলেই তাঁহার মক্কেল মামলা তুলিয়া লইতে রাজি আছে।

প্রথম হইতেই আমার এ শিক্ষা হইয়াছিল যে, ফৌজদারী মামলায় আসামী হইয়া কখন জোর করিয়া মামলা চালাইতে নাই। আসামীর পক্ষে খুব ভাল মামলা হইলেও ফৌজদারী মামলা চালান সব সময়েই বিপজ্জনক। এই সম্বন্ধে আমি একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা বলিতেছি।

আমি তখন নূতন উকিল। এক জন স্বর্ণকারের পক্ষে উকিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। তাহার নামে নালিশ যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে এক জন ভদ্রলোকের জন্য একটি গহনা প্রস্তুত করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে সেই গহনা ভাঙ্গিলে দেখা গেল, তাহাতে অত্যধিক পান আছে, আর ভিতরে একটা লোহার পাতও আছে। ফরিয়াদী পুলিস-আদালতে নালিশ করিল প্রতারণার অজুহাতে। আমি তখন জুনিয়র উকিল। এক জন প্রবীণ উকিল ফরিয়াদীর তরফে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোকর্দ্দমায় নিয়োজিত হইয়া আমার মহা আনন্দ যে, এ মামলা জিতিবই। কারণ, ফরিয়াদী কেমন করিয়া প্রমাণ করিবে যে, আমার মক্কেল ঐ লোহা দিয়াছে ও পান দিয়াছে। দুই এক জন অপর উকিলকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও বলিলেন, আপনার মক্কেলের বিপক্ষে মামলা প্রমাণ করা ফরিয়াদীর পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু পাশে এক জন বৃদ্ধ উকিল বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তারক বাবু ও প্রমাণ ফ্রমাণের কথা শুনিবেন না, ফৌজদারী মামলায় আসামীর তরফে থাকিয়া মেটামিটির কথায় কখন বাধা দিবেন না।"

যাহাই হউক, ফরিয়াদীর উকিল আমাকে বলিলেন,—"দেখুন, সেকরারা এরূপ কার্য্য করিয়াই থাকে। প্রবাদ আছে, মাতার অলঙ্কার প্রস্তুতকালেও সোনা চুরি করে। যাহা হউক, আপনি আপনার মক্কেলকে বলিয়া আমার মক্কেলকে ৪০৲ টাকা দেওয়াইয়া দিন, আমি মামলা তুলিয়া লইব।"

আমি দেখিলাম, আমার মোকর্দ্দমা ভাল আছে। ফরিয়াদীর পক্ষে এই মামলা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, অতএব আমি এ প্রস্তাবে রাজি হইলাম না।

ম্যাজিষ্ট্রেট এক জন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার। পসার যে নাই, এ কথা বলার কোন সার্থকতা নাই; কেন নিজের পসার থাকিলে বিনা "ফি"য়ে কার্য করিতে আসিবেন?

মোকর্দ্দমা ডাক হইলে, ফরিয়াদীর উকিল মোকর্দ্দমার বিষয়টি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইলেন। আমি তখন বলিলাম, "হুজুর, গহনার ভিতর লোহার পাত থাকিতে পারে বা সোনায় অধিক পান থাকিতে পারে, কিন্তু এ গহনা যে আমার মক্কেলই প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়?

অবৈতনিক হাকিম।—তারকবাবু, আপনি যাহাই বলুন, আমার অন্ধ বিশ্বাস, আপনার মক্কেল এ বিষয়ে দোষী। আমি নিজে সেকরার হাতে এইরূপ নিগৃহীত হইয়াছি। আপনি যাহাই বলুন, আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়িব না।

পাশে এক জন আমার অপেক্ষাও জুনিয়র উকিল বসিয়াছিল, সে হাকিমের এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিল,—"তারক বাবু, আপনি মোকর্দ্দমা স্থানান্তরিত করিবার জন্য দরখাস্ত করুন।"

আমি আস্তে আস্তে তাহাকে বলিলাম,—"মোকর্দ্দমা স্থানান্তরিত করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে, কিন্তু খরচা?" অতএব সেই দিন মোকর্দ্দমাব মুলতুবী লইয়া ফরিয়াদীর প্রবীণ উকিলকে ধরিয়া ৮০ টাকা দিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া লইলাম। মামলা শুনানীর প্রথম দিনের প্রাতঃকালে ফরিয়াদী ৪০ টাকা চাহিয়াছিল, হয় ত ২০৲ টাকায় মিটিয়া যাইত, কিন্তু আমি একগুঁয়েমি করিয়া মামলা মিটাইয়া লইলাম না।

হাকিমের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া ফরিয়াদী আর সস্তায় মিটাইল না, ফলে ৮০ টাকা দিয়া মিটাইতে হইল।

আর একটি ঘটনা ঘটে। নূতনবাজারে একটি মৎস্যবিক্রেতা একটি ভদ্রলোককে ওজনে কম দিয়া মাছ বেচিয়াছিল। ক্রেতা কম টের পাইয়া মাছ-বিক্রেতাকে, কমটি পূরণ করিয়া দিতে বলিল। সে কিছুতেই রাজি হইল না; ফলে পুলিসে খবর দিল। পুলিস আসিয়া তাহার সমস্ত বাটখারা ইত্যাদি লইয়া গেল এবং আসামীকে চালান দিল। আমি আসামীর উকিল। আমার বক্তব্য ঐ কম ওজনের বাটখারাগুলি, মফঃস্বলে মাছ চালান দিবার সময় যে বরফ ব্যবহার করিতে হয়, সেই বরফ ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হাকিম এক জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তারক বাবু, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়িব না। আমি শ্যামবাজারের বাজারে মাছ কিনতে গিয়া নিজে এইরূপ ঠকিয়াছিলাম।" এই সব কারণে হাকিমের মনে মামলা সম্বন্ধে কি ধারণা হইবে, যাহার যখন স্থিরনিশ্চয় নাই, তখন ফৌজদারী মামলায় আসামীর তরফ হইতে মেটামিটিতে বাধা দেওয়া দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক।

কাজেই অপর পক্ষের উকিলের প্রস্তাবটি মিঃ এলাইজাকে বলিলাম। মিঃ এলাইজা বলিলেন, "মিঃ সাধু, যদি ১ শত টাকা দিলে এই ছেঁড়া লেঠা হইতে অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে আমি দিতে রাজি আছি।"

ইহা শুনিয়া মিঃ ভেঙ্কার বলিল, "তুমি এত কাপুরুষ, এই মিথ্যা মোকর্দ্দমাটি টাকা দিয়া মিটাইবে? লোকে বলিবে, তুমি দোষী; সেই জন্যই ভয়ে মামলা মিটাইতেছ, আমি থাকিতে তাহা কখনই হইতে দিব না।"

মিসেস্ এলাইজাও নিমরাজি ছিলেন, কিন্তু মিঃ ভেঞ্চারের স্থির প্রতিজ্ঞা ও মনোভাব দর্শন করিয়া আর কিছু বলিলেন না। সে প্রস্তাবটি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। আসামীর পক্ষে মোকর্দ্দমা এই যে, টাকা লইয়াছিলাম, কিন্তু ফিরাইয়া দিয়াছি। কাজেই টাকা লওয়ার সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল না, কারণ,আসামী স্বীকার করিতেছে সামান্য প্রমাণই যথেষ্ট হইল। টাকা ফেরত দেওয়ার প্রমাণ করার ভার আমাদের হাতে পড়িল। মিঃ ভেঞ্চার যে তিন জন সাক্ষীর নাম দিয়াছিল, একে একে তাহাদের ডাকা হইল। তিন জনেই বলিল, টাকা ফেরত দিবার কথা তাহারা কিছুই জানে না। হরি, হরি, সব অন্ধকার!

আসামীকে বাঁচাইবার কোন উপায় রহিল না। পূর্ব্ব হইতেই আসামীর কথা এই ছিল যে, সে টাকা ফেরত দিয়াছে, তাহাই সে প্রমাণ করিতে পারিল না। আমার আর কিছু বলিবার রহিল না। ফলে আসামীর চারি মাসের জেল হইল। বাহিরে আসিয়া দেখি, মিসেস্ এলাইজা ও মিঃ ভেঞ্চার দুই জনেই উধাও! আমি এই মামলার আসল তথ্য ও গূঢ়তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রমাণ-ভার কেন আমরা ইচ্ছা করিয়া আমাদের ঘাড়ে লইলাম? যাহা হউক, তিন দিন ধরিয়া আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল, অবশ্য তখন আমি প্রবীণ উকিল হই নাই।

পাঁচ মাস পরে মিঃ এলাইজা আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলাম। তিনি আমাকে আমাকে এইরূপ অপ্রতিভ দেখিয়া বলিলেন, "মিঃ সাধু! আপনি আমার মোকর্দ্দমায় যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছি। আমার যে জল হইয়াছে, তাহার কারণ বন্ধুরূপে শত্রুর ব্যবহার। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভেঞ্চারের আমার স্ত্রীর উপর নজর

পড়িয়াছিল। আমার স্ত্রী বরাবরই ভাল ছিল। শেষে সয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া তাহার কুমতি হইল। ভেঙ্কার বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইয়া চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ঘোর শত্রুর কার্য্য করিল, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, টাকা যখন ফেরত দিই, তখন সাক্ষী কেহই ছিল না। ভেঙ্কারই এই তিনটি সাক্ষীর নাম দেয় ও জোগাড় করিয়া আনে। আমি ইহাকে ভদ্রলোক ও বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা, মিটাইবার কথা বলিয়াছিলেন, এই শত্রুই তাহাতে বাধা দেয়। আমার জেলে যাইবার পর আমার যাহা কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল ও নগদ টাকাকড়ি ছিল, সেই সমস্ত লইয়া ও আমার স্ত্রীকে লইয়া ভেঙ্কার মুসৌরিতে চলিয়া যায়। তিন মাস সেইখানে স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস করিয়া যখন টাকাকড়ি সব শেষ হইয়া গেল, মিসেস্ এলাইজাকে রাখিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান নাই। লোকটা নররূপী সয়তান। আমার সংসার নষ্ট করিয়া সে অন্য সংসার নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নূতন নূতন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভগবান্ কি কারণে এই সব নররূপী পিশাচকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি ইহার কোন কারণই বুঝিয়া পাই নাই। আমার নিজের তরফের লোক যদি সয়তানী করিয়া আপনাকে ভুল পথে লইয়া যায়, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন? আপনি জানেন না, এইরূপ বন্ধুবেশে নরপিশাচ প্রত্যেক ভদ্রলোকের পশ্চাতে লাগিয়া আছে। আমার স্ত্রী এইরূপ লোকের কথায় প্রলোভিত ও প্রতারিত হন। নরনারী সকলেই ভুল করে, তিনিও করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছি, তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে পুনরায় গ্রহণ করিব। দোষ তাঁহার নয়, দোষ সেই নরপিশাচের।"

কয়েক বৎসর পরে এলাইজা-দম্পতি এক দিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে খবর দিলেন যে আফ্রিকায় মিঃ ভেঞ্চারকে বাঘে খাইয়াছে। এলাইজা-পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মিঃ সাধু! এরূপ নরপিশাচের পরিণাম এইরূপই হওয়া উচিত। আমি চিরকালই পতিব্রতা ছিলাম এই নরপিশাচ আমার ও আমার স্বামীর মাঝখানে আসিয়া আমার উপর কিরূপ নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন। ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের সুবিধা সাময়িকই হইয়া থাকে, বেশী দিন চলে না।"

———

চতুর্দ্দশ কথা

এলাচি খেলা

পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতাদেরই জানা নাই, মানুষের অজ্ঞেয় ত বটেই। কত মানুষ সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া কত উন্নতিসাধন করিতেছে;—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, ঈশ্বরজ্ঞানে কত উন্নতিলাভ করিতেছে, আর কত কুলাঙ্গার ঈশ্বরপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু, উন্নতমনা বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই বংশমর্য্যাদাকে উচ্চস্থান হইতে টানিয়া আনিয়া পঙ্কে ডুবাইয়া দিতেছে। এইরূপ হইবার কারণ নিরাকরণ করা অসম্ভব। মানুষ যেখানে বিচারের দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না, সেইখানেই ভাগ্যের দোহাই দিবে। ভাগ্যের দোহাই দেওয়া আর কারণ-নির্দ্দেশের অক্ষমতা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই।

কন্দর্প আচার্য্য কলিকাতার এক বিখ্যাত পল্লীতে আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। চরম উৎকর্ষের পূর্ব্বতন ভাবের মতে আচার্য্যবংশে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ হইত। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অপর অপর জনসাধারণের সেবার জন্য এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। পল্লীস্থ অভুক্তদের দৈনিক অবস্থার সংবাদ না লইয়া কর্ত্তা ও গৃহিণী কখন জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের পরিচিত বা অপরিচিত প্রতিবাসী এক জনও অভুক্ত থাকিলে, তাঁহারা তাহাকে ভোজন করাইয়া, তবে নিজেরা ভোজন করিতেন। এই বংশের দানের কথা অনেক শুনা যায়। তাঁহারা গোপনে দুঃস্থের দুঃখ হরণ করিতেন, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন। নিঃশব্দে দানকার্য্য হইত। যাহাকে দান করিতেন, সেই-ই দানের কথা

জানিত, অন্য কেহ জানিত না। এক টাকার বিজ্ঞাপন জারি করিয়া আধ পয়সার দান দিতেন না। গুপ্তদান মহাপূণ্য, এ কথার সারবত্তা আচার্য্য-বংশের লোক বুঝিয়াছিলেন।

সেই আচার্য্য-বংশের যশোরবি যখন সেই বংশের শিরোপরি বিভাসিত হইয়াছিল, সেই সময়ে একদিন কন্দর্প আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিল। অতি সুপুরুষ ছিল বলিয়াই, পিতামাতা ও আত্মীয়রা তাহার নাম রাখিলেন কন্দর্প। সে বাস্তবিকই কন্দর্পবৎ রূপবান্ ছিল।

আচার্য্য-বংশের যে শুধু সুনাম ছিল, তাহা নহে, তাঁহাদের সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। যে পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন, সেই পল্লীর অনেকগুলি বাটী, বস্তি ও ভূসম্পত্তি তাহাদেরই ছিল। মোটের উপর অন্যত্র অপর আচার্য্য-পরিবার থাকিলেও আচার্য্যগোষ্ঠীর কথা হইলেই, সাধারণে এই আচার্য্য-পরিবারের কথাই ধরিয়া লইত। সৎ ও উচ্চবংশে কেহ জন্মগ্রহণ করিলে সেই লোকের অনেক সুবিধা হয়। প্রথমতঃ মানুষ ধরিয়া লয় যে, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করা হেতু তিনিও এক জন উচ্চমনা ও উচ্চকর্ম্মে অভ্যস্ত ব্যক্তি। সাধারণতঃ নীচকর্ম্ম করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। যেমন নিঃস্ব বংশে জন্মগ্রহণ করিলে মানুষের অনেক অসুবিধা, প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া হয়, সে ব্যক্তি অভাবগ্রস্থ, সেই কারণে অন্যায় কার্য্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না।

জন্মগ্রহণের পর হইতেই উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকদের সহিতই কন্দর্পের বন্ধুত্ব হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসকালেও উচ্চবংশীয় বালকদের সহিত তাহার মেলামেশা। এই সব সুবিধা সত্বেও পাঠ্যাবস্থায় কতকগুলি নীচমনা যুবকের সহিত তাহার আলাপ হইল এবং আলাপসূত্রে কতকটা ঘনিষ্টতা জন্মিল। এই সব যুবকের মধ্যে এক জন যুবক ধনী জুয়ারীর বংশধর। ঘনিষ্টতা হেতু সে জুয়ার আমোঘ ও ঐন্দ্রজালিক

শক্তির কথা তাহার নিকট হইতে অবগত হইতে লাগিল। এবং কন্দর্প মনে মনে স্থির করিল, অর্থ উপার্জ্জনের ইহা একটি বিস্তৃত পথ। যদিও সাধারণতঃ লোক বলে, "যেমন বীজ, তার তেমনই গাছ," কন্দর্পের পক্ষে কিন্তু এ কথাটি খাটিল না। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মতিগতি অতিশয় নীচপথগামী হইল। সময়ে বা অসময়ে কন্দর্পের পিতার মৃত্যু হইল। কন্দর্প আচার্য্য-বংশের সম্পত্তির ও সুনামের প্রতিনিধির স্থান অধিকার করিল। কিন্তু তাহার নীচ প্রবৃত্তি-গুলি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই কারণে আচার্য্য বংশের প্রতিনিধি হইয়াও ঐ বংশের উন্নতমনের অধিকারী সে হইল না।

যদিও আচার্য্য-বংশের বাসবাটি কলিকাতার এক পল্লীতে, কিন্তু তাহাদের পুরাতন আবাসস্থান কলিকাতার বাহিরে বল্লভপুর উপনগরে। কন্দর্প কখনও সেইখানে থাকে, কখনও কলিকাতায় থাকে।

তাহার এক বন্ধু জুটিল, তাহার নাম সর্ব্বভূক্। পাটনা নগরে তাহার জন্মস্থান। উচ্চবংশে সেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু নিজ দোষে তাহার সমস্ত প্রবৃত্তি নীচগামী হইয়াছিল। তাহার মৃতুর পর সে অনেক অর্থের মালিক হইয়াছিল। কিন্তু প্রবৃত্তির অগ্নিতে সমস্ত সম্পত্তি ইন্ধন দিয়া সে রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় কন্দর্পের বন্ধুরূপে আবির্ভূত হইল, তখন তাহার কিছুই ছিল না। ছিল কেবল পূর্ব্ব-স্মৃতি আর আত্মগ্লানি। জুয়া খেলিয়াই এই সমস্ত সম্পত্তি সে নিঃশেষ করিয়াছিল। অন্য লোক তাহাকে প্রতারণা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহার মন মনুষ্যজাতির প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। মানুষ মাত্রকেই সে শত্রু বলিয়া মনে করিত। সে সংকল্প করিয়াছিল, অপরকে প্রতারণা করিয়া ধ্বংস করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবে না; বরং প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

এই মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল এবং কন্দর্পের উপর তাহার চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করিল। অপরিণামদর্শী কন্দর্প শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বভুকের কাছে কতক্ষণ টিকিবে ? কাজেই সর্বভুক্ ও তাহার শ্রেণীস্থ লোকের হাতে পড়িয়া কন্দর্প যথাসর্ব্বস্ব হারাইল।

শ্রীভ্রষ্ট ও সর্ব্বভ্রষ্ট হইয়া তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক "নওসেরিয়া" দল সৃষ্টি করিল। এ দলে অনেকগুলি লোকের প্রয়োজন—বৈঠক অর্থাৎ রাজা, খাজাঞ্চী, ম্যানেজার, Tryman অর্থাৎ যে লোক বৈঠকের কাছে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম খেলার প্রস্তাবনা করে, বৈঠককে সর্ব্বপ্রথম তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে উত্তেজিত করে, দালাল অনেকগুলি করিয়া দরকার Tryman'ও একের অধিক প্রয়োজন, কেন না, এক লোক ক্রমান্বয়ে এ কার্য্য করিলে লোকের সন্দেহ উদ্রেক করিতে পারে। প্রত্যেক দলে দুই জন কিংবা তিন জন করিয়া Tryman থাকে। চার জন কি পাঁচ জন করিয়া দালাল থাকে। ম্যানেজার ও সময়ে সময়ে একের অধিক থাকে, বৈঠকও সময়ে সময়ে একের অধিক থাকে।

জুয়া অনেক রকম আছে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন নামে আখ্যাত হয়। সাধারণতঃ এই দলগুলিকে "নওসেরিয়া" দল বলে, অর্থাৎ একশত রকম জুয়াচুরির ফন্দী। নওসেরিয়া দলের মধ্যে একশত প্রকার জুয়ার পদ্ধতি আছে।

আজ এই প্রবন্ধে যে জুয়ার কথা বলিব, তাহা এলাচি খেলা বা Chinese Table race নামে অভিহিত। এলাচি খেলা আর Chinese Table raceএর মধ্যে তফাৎ এই যে, এলাচি খেলায় ঘুঁটি-গুলির পরিবর্ত্তে এলাচি ব্যবহার হয়, আর Chinese Table raceএ ছোট ছোট কাচের বিড (Bead) ব্যবহৃত হয়। নওসেরিয়া দলের

খেলার মধ্যে পিতলকে স্বর্ণ বলিয়া চালান, কাগজের একখানি নোটকে তাহা অধিকতর মূল্যবান করিবার ভানে যে ঠকান হয়, তাহাকে সচরাচর **Note-doubling trick** খেলা বলে।

প্রায় দেখা যায়, এলাচি খেলা বা কাচের বিডের ঘোড়দৌড় খেলায় যাহারা সিদ্ধহস্ত, তাহারা জীবনের প্রথম সময়ে ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত ও বিত্তসম্পন্ন, পরে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর ধূর্ত্ত লোকের হাতে হৃতসর্ব্বস্ব। বাল্যকাল হইতে সুখে লালিত-পালিত, অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, পরে বিত্তহীন, এরূপ অবস্থায় আর অন্য কিছু কর্ম্ম করিতে অনভিজ্ঞ হেতু যে খেলায় তাহারা নিজে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, সেই খেলাকেই জীবনের অপর ভাগে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বলিয়া অবলম্বন করে।

এই সব দলের যাহারা রাজা সাজে, তাহারা সকলেই সুপুরুষ ও সুন্দর। কন্দর্প তাহার দলের রাজা বা বৈঠক ছিল, সর্ব্বভুক্ সেই দলের ম্যানেজার। দলের সব লোকই খুব চালাক, এবং বাল্যকাল হইতে অপর কোন পেশা না শিখিয়া, যে খেলায় তাহারা সব হারাইয়াছে, সেই খেলার দ্বারাই জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইহাদের ম্যানেজারের (সর্ব্বভূক) সহিত আমার একবার কথাবার্ত্তা হয়। কথোপকথনে জানিলাম, লোকটি ভদ্রবংশজাত, মোটামুটি শিক্ষিত, এক সময়ে বিত্তশালী ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার এ প্রবৃত্তি কেন হইল?" তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তরে আমায় বলিল, "মহাশয়, প্রবাদবাক্য আছে, 'যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে, আমিও তাহাই করিয়াছি। ভদ্রসন্তান, অন্য কোন কাজকর্ম্ম শিখি নাই, অল্পবয়স হইতেই জুয়া খেলিয়া সব হারাইয়াছি। জীবনযাপনের অন্য কোন উপায় জানি না, কাজেই যে ক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি, সেই ক্রীড়ার দ্বারাই অপরকে বিত্তহীন করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ক্রীড়া অন্যায়

ও বে-আইনী বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারেন না। কারণ, উদ্দেশ্য দুপক্ষেরই মহৎ। প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে ঠকাইবার জন্য ব্যস্ত। সকল ধর্ম্মই বলে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। বিনা পরিশ্রমে এক পক্ষকে ঠকাইয়া অর্থার্জ্জনকে সৎ অবলম্বন কখনই বলা যাইতে পারে না। যে আমার সহিত খেলিতে আসিতেছে, তাহারও উদ্দেশ্য ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জ্জন করা। এই অন্যায় যুদ্ধে যদি এক জন অপর জনকে হারায়, তবে কেন আপনি এক পক্ষকে দোষ দিবেন, অপর পক্ষকে দোষ দিবেন না?—এক পক্ষকে ভক্ষ্য বলিলেন, অপর পক্ষকে ভক্ষক বলিবে? বাস্তবিক বলিতে গেলে, দুপক্ষই ভক্ষক, দুপক্ষই ভক্ষ্য। তবে আপনাদের আইন একচোখো; এক পক্ষের জন্য, দুপক্ষের জন্য নয়। তাহা যদি হইত, তবে জুয়া খেলার দরুণ দুপক্ষেরই সাজা হওয়া উচিত। আইনে দুপক্ষকেই সাজা দেওয়া উচিত ছিল, কারণ, দুপক্ষেরই উদ্দেশ্য এক, অতি হীন, অতি নীচ ও অতি অন্যায়। সেই কারণে আইন এ রকম হওয়া উচিত —যাহাতে দুপক্ষেরই সাজা দেওয়া হয়।”

আমি তাহার কথার সারগভতা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক, এই প্রকার জুয়া ও Note Doubling caseএ দুপক্ষেরই সাজা হওয়া উচিত। কারণ, দুপক্ষই অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, প্রত্যেক পক্ষের উদ্দেশ্য অপর পক্ষকে ঠকাইবে। আর যাই ঠকাইতে পারিল না, বরং ঠকিয়া গেল, অমনি কাঁদুনে ছেলের মত আদালত ও আইনের আশ্রয় লইতে গেল।

যাহা হউক, সর্ব্বভুক্ ও কন্দর্প দুজনে মিলিয়া এক দল পাকাইল। এইরূপ দল করিতে গেলে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আট দশ জন লোকের প্রয়োজন, আর একটি উত্তমরূপে সজ্জিত, প্রশস্ত, মনোমুগ্ধকর খেলিবার

স্থানের প্রয়োজন। প্রায় দেখা যায়, যিনি খেলিবার পাণ্ডা, তাঁহার নিজের খুব ভাল বাড়ী আছে, ধন-সম্পত্তি সব গিয়াছে, কেবলমাত্র বাড়ীটি রহিয়া গিয়াছে, আর না হয়, সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূত কোন ভদ্রলোকের রাজপ্রাসাদস্বরূপ অট্টালিকা খুব মোটা ভাড়ায় প্রত্যহ ত্বঘণ্টা করিয়া ব্যবহারের জন্য ভাড়া লওয়া হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার সেই রাজপ্রাসাদের ন্যায় বাটী ভাড়া দেন, তিনি হয় ত সব সময় মোটা ভাড়া দিয়া অল্প-সময়ের জন্য কেন লইতেছেন, তাহার কারণ জানেন না। জুয়াড়িদের দলপতি এই সুন্দর ও প্রশস্ত অট্টালিকার মালিকের কাছে গিয়া বলে, আমরা সায়ংকালে তুই ঘণ্টা করিয়া পাঁচ জন ভদ্রলোক লইয়া তোমার বৈঠকখানায় আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়াদি করিব। মাসে ১ হাজার টাকা করিয়া ভাড়া দিব। যে বাটীর মালিকের নিকট এই প্রস্তাব হয়, প্রস্তাবের সময়েও হয়ত তাহার অবস্থা ভাল, তবে অবস্থাকে অধিকতর ভাল করিবার জন্য এই টাকার লোভ সংবরণ করেন না। অনেক সময় উচ্চ বংশধরের অবস্থা মলিন হইয়াছে, অর্থের প্রয়োজন, প্রত্যহ তুই ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য মাসিক হাজার টাকা, এ লোভ সংবরণ করিতে পারেন না, ভাডা দিয়া বসেন। রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা, সুন্দরভাবে সজ্জিত, আসবাব-পোষাক খুব ভাল ; অনেক সময় বাড়ীর নাম-ডাকও আছে। সুতরাং কেহ সন্দেহও করে না যে, এখানে কোন অপকর্ম্ম হইতে পারে। শিকার সহজেই জালে পড়ে।

শিকার সংগ্রহ করিবার জন্য অনেকগুলি করিয়া দালাল থাকে। সেই দালালের অধীনে আবার ছোট ছোট দালাল থাকে, তাহারাও শিকার সংগ্রহ করে।

যত দিন মানুষের অবৈধ ধনলিপ্সা থাকিবে, তত দিন শিকারের কোন অভাব হইবে না। পতঙ্গ যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বা আলোকের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে, মানুষও তেমনই নিজে এই জুয়াড়িদের স্থানে গিয়া পৌছিবে। দালাল যাইয়া এক জন ডাক্তারকে তাহাদের আড্ডায় লইয়া গিয়া তুলিল। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, "মহাশয়, চিকিৎসা-বিষয়ে আপনার বেশ পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতি আছে। আমার রাজা বা জমিদার আপনার সুখ্যাতির কথা লোকমুখে শুনিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে পীড়িত লোক আছে, আপনাকে যাইয়া তাহার চিকিৎসা হইবে।"

সেই ডাক্তার বাবু এই সব কথা শুনিয়া গলিয়া গেলেন,—তাঁহার সুখ্যাতির কথা ও রোগী হাতে পাইবার আশু সুবিধা ভাবিয়া মাতোয়ারা হইলেন। পড়ার লোক তাঁহাকে ২৲ টাকা দিয়াও ডাকে না, দালাল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, তিনি ৮৲টাকা হিসেবে ফি পাইবেন।

প্রথম দিন রাজার বাটীতে গিয়া, রাজার সহিতও দেখা হইল না, রোগীর সহিতও দেখা হইল না, তথাপি তিনি তাঁহার ফি পাইলেন। ডাক্তার আনন্দে অধীর যইয়া নিজের ভাগ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁচ সাত দিন ঐরূপ যাইয়া আর ফাঁকি দিয়া ৬।৭টি ফি পাইয়া তিনি সেই নওসেরিয়া দলের শিকার হইলেন। সেইরূপ ইঞ্জিনিয়ার, কন্‌ট্রাক্টর ও অন্যান্য পেশার লোক, যাহাদের কাজকর্ম্ম ভাল চলে না, সেইরূপ লোক ধরিয়া আড্ডা-স্থানে আনিয়া জোটায়। অভাবগ্রস্ত ইঞ্জিনিয়ারকে বুঝাইয়া দেয়, রাজার অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী হইবে, তাঁহাকে ইঞ্জিনিয়র রাখা হইবে। যে পারিশ্রমিক তিনি পাইবেন, তাহাও প্রচুর। কন্‌ট্রাক্টরকেও ঐরূপ প্রলোভন দেখাইয়া সংগ্রহ করা হয়। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইবে কিম্বা বাজার বসান হইবে, তাহার মাল তাহাকে যোগাইতে হইবে। তবে সে যে মাল জোগইতে পারিবে, ইহার কারণে অর্থ গচ্ছিত রাখিতে হইবে, না পারিলে তাহার

গচ্ছিত টাকা হইতে তাহার খেসারত কাটিয়া লওয়া হইবে। ডাক্তার যেরূপভাবে সংগ্রহ করা হয়, কবিরাজগণকেও ঠিক সেইরূপভাবে সংগৃহীত করা হয়।

সাধারণতঃ যেরূপভাবে শিকারকে ধোঁকা দেওয়া হয়, তাহা এই স্থানে দেখাইতেছি। ধরুন, এক জন কবিরাজকে শিকার স্থির করা হইয়াছে। দালাল রামচন্দ্র ইহাকে জালে ফেলিবার ভার লইল। কবিরাজের নাম কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী। বেচারী একখানি ভাড়াবাড়ীতে থাকেন। টাকা কুড়ি বাটীর ভাড়া দেন। ঔষধ বেচিয়া ও রোগী দেখিয়া কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করেন। সংসারে ছেলে-মেয়ে লইয়া ৪।৫টি; দুইটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েগুলি দেখিতে ভাল, কাজেই অবস্থাপন্ন ঘরে পড়িয়াছে।

দালাল রামচন্দ্র সেই অখ্যাত কবিরাজের পাড়ায় গিয়া উপস্থিত। খবর লইয়া জানিল, সেই পাড়ায় এক জন কবিরাজ বাস করেন। তাঁহার নিজ অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহার অনেকগুলি আত্মীয়স্বজনের অবস্থা ভাল। কবিরাজটি প্রবীণ। দুই পাঁচটি পুরান ঘর আছে; সেই সব বাটীর লোকরা তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে।

রামচন্দ্র এক দিন কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী কি না?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারই নাম কৈলাস শাস্ত্রী।"

রামচন্দ্র একটি ৯০ ডিগ্রীর প্রণাম ছাড়িল এবং বলিল, "মহাশয়, আজ আমার সুপ্রভাত, আমি ক'দিন ধ'রে আপনার খোঁজ করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হই নাই। লোকমুখে আপনার গুণগ্রামের কথা শুনিয়াছি, আপনার হাতযশের

কথাও শুনিয়াছি। পরিতাপের বিষয়, জনসাধারণ আপনাকে এখনও চিনিল না, আপনি মহাশয় এক জন সুচিকিৎসক। তবে নিজের ঢোল নিজে বাজাতে পারেন না, সেই কারণে আপনাকে এখনও লোকে চিনিল না। কয়েক জন আমাকে বলে, চড়কবাগানের কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত। আমার মনিব রাজা তছনছ সিং সারসবাগানে থাকেন। তাঁহার এক আত্মীয়ের রক্ত-আমাশয়ের পীড়া, বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। তাঁহাকে কে বলিয়া দিয়াছে, চড়কবাগানের কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী এইরূপ ব্যারামে ধন্বন্তরি। তা কবিরাজ মহাশয়, আপনি বেশ জানেন, বড় লোকের খেয়াল, যাহা যখন ধরিবেন, তাহা আর ছাড়িবার নয়। তাহা না হইলে ধরুন না কেন, ভিখারীর কন্যা এলাহিজান ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের নজরে পড়িবে কেন? খেয়াল, মশাই, খেয়াল। শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার সংসারে দেখেন। তা সত্ত্বেও তিনি ধরিয়া বসিয়াছেন, কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রীকে চাই। আর দেখুন, তাঁহার কতকগুলি নিজেরও ব্যারাম আছে, সেই কারণে তিনি কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করাইবেন। সোনা, হীরা, পান্না, পলা ইত্যাদি অনেকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তা যদি মহাশয়ের সুবিধা হয়, শ্যামাদাস বাচস্পতিকে দিয়া কেন, আপনাকে দিয়াই ঔষধ প্রস্তুত করান হইবে। বাচস্পতি মহাশয় প্রভূত অর্থের মালিক, তিনি ত এখন আর নিজে আগুন-তাপে যাইবেন না। আপনি এখনও বাচস্পতি মহাশয়ের সমান ধনবান্ হন নাই, অতএব আপনার দ্বারা এসব ঔষধ প্রস্তুত করান ভাল।"

কৈলাস।—তা বাপু, তোমার রাজাবাবু যখন আমাকে পছন্দ করিয়াছেন, আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিব। তবে বাপু, আমার হাতে রোগী খুব কম মরে।

রামচন্দ্র।—তা নিশ্চয়ই। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজরা বিনা ওজরে ও বিনা আপত্তিতে যত লোক মারিবার সুবিধা পায়, তত সুবিধা ত সকলেই পায় না? কথায় বলে, "সহস্রমারী চিকিৎসক।" তবে কবিরাজ মহাশয়, আসুন, রোগী দেখা হয় ভালই, না হ'লে আপনার ফি ত আর মারা যাবে না?

এই বলিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া একখানা ট্যাক্সি চড়িয়া সারসবাগানের রাজপ্রাসাদে আ'সয়া উপস্থিত। কবিরাজ মহাশয় ও রামচন্দ্র ট্যাক্সি হইতে নামিলেন। দ্বারে সেপাই জমি স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। দুজনে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত কামরায় উপস্থিত হইলেন। খবর লইয়া জানিলেন, রাজাবাবু ভিতরে আছেন, তবে তাঁহার শরীর একটু বে-একতার, সে দিন তিনি আর বাহিরে আসিবেন না। শুনিয়া তিনি ম্যানেজার রসিকলাল বাবুকে (সর্ব্বভুক্‌কে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, জাঁহাপনা কি আর আজ বাহিরে আসিবেন না?" তাহা শুনিয়া ম্যানেজার উত্তর করিলেন—"না।"

রামচন্দ্র।—আমি সেই কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়াছি।

রসিক।—আরে ভাই,—মহারাণীর সহিত জাঁহাপানার কি খিটিমিটি হইয়াছে। বড়লোকের বাড়ীতে একটু খিটিমিটি হইলেই সব বিষয়ে গোলযোগ। গৃহিণীর সহিত মনকষা হইলেই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমন কি, উকিল বাবুদেরও রক্ষা নাই। অফিসের বড় বাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী গোঁসাঘরে গেলেন, গরীব কেরাণী-কুলের সে দিন প্রাণ অতিষ্ঠ। এ মেজাজে কি আর কবিরাজ মহাশয়ের সহিত দেখা করিবেন? যাহা হউক, কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার দর্শনী

দিয়া আজকের মত বিদায় দাও, পুনরায় পরশ্ব ৪টার সময় আসিতে বলিয়া দাও। কেমন হে, ইহার ফি ত ৮৲ আট টাকা?

এই বলিয়া রসিক কেসিয়ারকে ৮৲ দিতে হুকুম দিলেন।

কবিরাজ মহাশয়কে কেহ কখন দুই টাকার অধিক দেয় নাই আজ রাজবাড়ীতে আসিয়া ৮৲ টাকা ফি পাইলেন। মনে মনে মহাখুসি। ভাবিতে লাগিলেন, আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?

এইরূপ ভাবে কবিরাজ মহাশয় আরও তিন দিন সারসবাগানে রাজার নন্দনকাননে আসিলেন। এক দিনও রাজার সহিত দেখা হইল না, তবে দর্শনী পাইলেন প্রত্যেক দিনে। কবিরাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাজারাজড়া হবে এই রকমের। পঞ্চম দিনে কবিরাজ মহাশয় নন্দনকাননে আসিয়া দেখিলেন, রাজা সশরীরে উপস্থিত। রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়াই, 'আসুন আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিল, আর রাজা বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাজা বাহাদুর! কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন, তিনি আজ পাঁচ দিন ধরিয়া আনাগোনা করিতেছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে না, বিমল বাবুর চিকিৎসারও বন্দোবস্ত হইতেছে না।"

রাজাবাবু।—তোমরা সকলে মিলে দেখছি আমাকে আর বাঁচতে দেবে না। দাঁড়াও বাপু, একটু সুস্থ হই, তার পর কবিরাজ মহাশয়, ডাক্তার মহাশয়, সকলকার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেখিতেছ ত শেষ বৈশাখে কি দুর্দ্ধর্ষ গরম! বেঁচে থাকাই অতি কষ্টদায়ক, তার উপর রাজকার্য্য!

(রমেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া)—কেমন হে রমেন, ঐ গঙ্গামণ্ডলের জমিদারীর যে অংশ বিক্রীত হবে, তা কিনবার বন্দোবস্ত কি করলে? টাকার জন্যে ভেব না। সম্পত্তিটি চাই।

(অভয় নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া)—ওহে, সেই নেকলেসটা সওয়া লক্ষ টাকা বলিলাম, তাতেও ঠিক করিতে পারিলে না ? বাজারে ঐরূপ নেকলেস সচরাচর পঁচাত্তর হাজার বা এক লক্ষ টাকায় পাওয়া যায়। তোমাদের রাণীমার ঐটি পছন্দ হইয়াছে। আমি সওয়া লক্ষ টাকা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দেড় লক্ষ পর্য্যন্ত উঠিতে রাজি আছি।

(রমণ চোবেকে লক্ষ্য করিয়া)—গঙ্গার ধারের বাগানটা কি হইল ? দেড় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি, আজকাল এত দামের খরিদ্দার পাইবে না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় অজাতশ্মশ্রু শিবরাম (Tryman) আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও রাজাবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"রাজাবাহাদুর, আজ এক নূতন খেলা শিখিয়া আসিয়াছি, আপনাকে দেখাইয়া জীবন সার্থক করিব। ইহা glass bead (কাচের ঘুঁটি) লইয়া খেলিতে হয়। ইহাকে Chinese Table Race বলে।"

রাজাবাহাদুর।—শিবরাম, আজ যাও, মনটা তত ভাল নয়, আর এক দিন আসিও।

শিবরাম।—তাও কি হয় হুজুর ? ভাল কিছু পাইলেই প্রাপ্তমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ। আপনাকে এ খেলা দেখাবই।

রাজাবাহাদুর।—আমি ১০ মিনিটের অধিক সময় দিতে পারিব না। ইহাতে হারই হউক, জিতই হউক।

রাজাবাহাদুর শিবরামের সহিত খেলিলেন, প্রথমবারেই ৫ হাজার টাকা হারিলেন। আর ম্যানেজার বাবুকে বলিয়া দিলেন, উহাকে ৫ হাজার টাকা দিয়া দাও। বলিবামাত্র ম্যানেজোর বাবু ৫ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া দিলেন, আর সঙ্কেত করিয়া তাঁহার প্রাপ্য

বকশিস চাহিলেন। শিবরাম টাকাগুলি হাতে করিয়া বলিল, "রস্থন না মশাই, দিচ্ছি।"

রাজাবাহাদুর বলিলেন, "আমার আর সময় নাই, আমি আর আজ খেলিব না।" সকলের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা আজ সকলে বিদায় হও, অন্য এক সময়ে সুবিধামত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

এই বলিতে বলিতে কবিরাজের দিকে একটা কটাক্ষ করিলেন। মুখে কিন্তু কিছু বলিলেন না। সকলেই তখন গাত্রোত্থান করিল। কবিরাজও গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ম্যানেজার বাবু ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

রাজাবাহাদুর চলিয়া গেলে ম্যানেজার শিবরাম বাবুর নিকট হইতে তাঁহার বকশিসের টাকা প্রার্থনা করিলেন। তখন শিবরাম কথঞ্চিৎ গরম হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি খেলিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, তোমাকে তার বখরা দিব কেন? হারিলে কি তুমি আমাকে দিতে?"

এই বলিয়া শিবরাম সে স্থান পরিত্যাগ কবিল। তখন রসিকলাল কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখলেন মশাই, কলির ধর্ম্ম দেখলেন? যাতায়াত লইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁচ সহস্র টাকা উপায় করিয়া লইলেন, আর আমার বেলাই ফাঁকি! দেশে আর ধর্ম্ম নাই! মশাই, দেশে আর ধর্ম্ম নাই! আর চাকরীর চেয়ে হীনকার্য্য জগতে আর কিছু নাই। আমি যদি রাজাবাহাদুরের চাকর না হইতাম উহার সহিত খেলিতে পারিতাম, আর এই সব টাকা অন্য লোকে না পাইয়া আমিই পাইতাম! মাড়োয়ারীরা বলে, নকরি করা আর নসীব বেচডালা দুই-ই এক জিনিস! যাহাতক নকরি করিয়াছ, তাঁহাতক নসীব বেচিয়াছ। এ কার্য্য অতি নীচ। দেখুন না মশাই, আমাদের দেশে গন্ধবণিক্‌রা কোন অবস্থায় নকরি করিবে না, ফিরি করিয়া দাঁতের মাজন

কুসুম-ফুলের রং বেচিবে, তবু চাকরি করিবে না। দেখুন মশাই, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, আপনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আধুনিক দাগাবাজি ও জুয়াচুরি আপনাকে এখনও স্পর্শ করে নাই। আপনি কিছু টাকা লইয়া আসুন, আপনাকে আমি সাহায্য করিব। এই বোকাচন্দ্র রাজাবাহাদুরের নিকট হইতে কিছু টাকা উপায় করিয়া যান, আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন, তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইব। আমি নিজের জন্য ভাবি না, আমার এক চৌদ্দ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা। যেখানেই যাই, সাত আট হাজারের কম কেহ বলে না। কলির ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। বরের বাপের পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেও কিছু দয়ার উদ্রেক হয় না।"

কৈলাস শাস্ত্রী।—প্রথম, আমি খেলা জানি না। দ্বিতীয়, টাকা কোথায় পাইব?

রসিকলাল।—মশাই, খেলার কথা যাহা বলিলেন, আমি আপনাকে শিখাইয়া দিব। অতি সহজ জিনিষ। আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচক্ষণ লোক ১০ মিনিটের মধ্যেই শিখিয়া লইবেন। আর যে টাকার কথা বলিলেন, উদ্দেশ্য মহৎ হইলে টাকার কখন অভাব হয় না। আমার ন্যায় সৎব্রাহ্মণের কন্যাদায়ের সাহায্য করিবেন, আপনার টাকা জুটিয়া যাইবেই যাইবে। আর টাকা প্রয়োজন চার পাঁচ ঘণ্টার জন্য। আপনি টাকা লইয়া আসিবেন, খেলিবেন, জিতিবেন আর বাড়ী ফিরিয়া গিয়া সুদ সমেত যাহার টাকা, তাহাকে গিয়া ফেরত দিবেন।

কৈলাস।—মশাই, অল্পসময়ের জন্য টাকা কোথায় পাইব? স্ত্রীর গায়ে তত অলঙ্কারপাতি নাই—যাহা হইতে চার পাঁচ হাজার টাকা হইতে পারে। দুইটি বিবাহিতা কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে,

তাহাদের গহনাপত্র আছে ; কিন্তু তাহাদের গা হইতে ত গহনা খুলিয়া লইব না।

রসিক।—কেন মশাই, তাতে দোষটা কি ? আপনি ত একেবারেই লইতেছেন না। মনে করিবেন, বাক্সতেই তোলা আছে। আর এ খেলায় হারজিত নাই ; নিরবচ্ছিন্ন জিত। যেমন মৃত্যুই ধ্রুব সত্য, মানুষ জন্মালেই মরিবেই মরিবে, তেমনই এই হবচন্দ্র রাজার সহিত খেলিলে জিত ধ্রুব সত্য—জিত হইবেই হইবে। আপনি জানেন, দুই আর দুইয়ে চার হয়, কখন সাড়ে তিনও হয় না, সাড়ে চারও হয় না, ইহা গণিত শাস্ত্রের অভ্রান্ত সত্য। সেইরূপ আপনি ৫ হাজার টাকা লইয়া আসিলে ৪ বাজী খেলিয়া ১০ হাজার টাকা। ১ হাজার টাকা আমার কন্যাদায়ের জন্য, বাকি হাতে থাকিবে ৯ হাজার টাকা। যাহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিবেন, তাহাদের পূরো টাকা ফেরৎ দিলেও ও সুদ দিলেও প্রায় কিছু কম চার সহস্র টাকা আপনার কাছে থাকিবে। দেখুন মশাই, আপনি যদি ৫ হাজার টাকা পূরা জোগাড় করিতে না পারেন, ৪ হাজার টাকা জোগাড় করিয়া লইয়া আসুন। আমি এই হবচন্দ্র রাজার তহবিল হইতে হাজার টাকা আপনাকে ধার দিব। যাক্ মশাই, কার্য্য ফতে। জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী ! পরশ্ব বেলা ৩টার সময় আসিবেন। ইতিমধ্যে টাকা জোগাড় করিবেন। আর আপনার কেন ক্ষতি হইবে ? অদ্যকার দর্শনী ৮৲ আট টাকাও লইয়া যান।

কৈলাস শাস্ত্রী এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী যাইবার সময় অনেক কথা ভাবিতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার টাকা ! এ ত কখন শোনা যায় নাই। আমি চির-জীবনে ৫ হাজার টাকা সংস্থান করিতে পারি নাই, আর ঐ আগন্তুকটি আসিল, খেলিল, জিতিল, পাঁচ হাজার টাকা লইয়া গেল। যাহাই হউক, আমি যেমন করিয়া পারি, টাকা জোগাড়

করিব। গৃহিণীকে বলিয়া তাহার গহনা ও কন্যা দুইটির গহনা বন্ধক দিয়া ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিব। সুদ খালি একদিনেরই যাবে। যাহারা টাকার বাচ্ছা পাড়ায়, সুদখোর মহাজন. তাহারা ত তাহাদের প্রাণ ছাড়িতে পারিবে, কিন্তু সুদ ছাড়িতে পারিবে না। তাহারা ত আর দু ঘণ্টার সুদ লইবে না, এক দিনেরই পূরা সুদ লইবে। যাহা হউক, রাজবাহাদুরের সংসারটি ধর্ম্মের সংসার। লোকগুলিও সব খুব ভাল। আজকের দর্শনী আমি চাহি নাই, তবু দিলে।

এই ভাবিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। স্থিরীকৃত দিনে রাজবাহাদুরের প্রাসাদে আসিলেন; ম্যানেজারের (রসিক বাবুর) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পূর্ব্ব-কথামত কবিরাজ মহাশয়কে ১ হাজার টাকার নোট দিলেন, আর খেলাটি শিখাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন আমি, পাশেই থাকিব, আপনার খেলার ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।" তারপর রাজবাহাদুরকে খবর দেওয়া হইল। পূর্ব্বেকার দিনের মত দালাল সব সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল—বাড়ীর দালাল, জমিদারী দালাল, জহরতের দালাল, নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দালাল উপস্থিত ছিল।

রাজবাহাদুর আসিলে পর খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমেই রাজা-বাহাদুর হারিলেন। কবিরাজ মহাশয় ২ হাজার টাকা জিতিলেন। তাহার পর রাজাবাহাদুর পুনরায় হারিলেন ৬ সহস্র টাকা, দুই দফা খেলায় ৮ হাজার টাকা লাভ। রাজাবাহাদুর বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই খেলায় ভুল করিতেছি, দুবারই হারিলাম, আজ আর খেলিব না, আপনি আগামী কল্য আসিবেন।"

রসিক বাবু কৈলাস শাস্ত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, "এ সুযোগ ছাড়িবেন না খবরদার খবরদার, রাজাকে খেলিবার জন্য পুনরায়

অনুরোধ করুন, আমরাও বলিতেছি।" শেষ অনেক ধস্তাধস্তির পর রাজাবাহাদুর আর দুবার খেলিতে রাজি হইলেন। খেলা হইল। প্রথমবারে রাজাবাহাদুর ৮ হাজার টাকা জিতিলেন। দ্বিতীয়বারের জিতও ৮ হাজার টাকা। কবিরাজ মহাশয়ের মোট জিত ৮ হাজার টাকা, নিজের পাঁচ হাজার টাকা, একুনে জমা তের হাজার, হার ১৬ হাজার, ফাজিল ৩ হাজার অর্থাৎ ৩ হাজার টাকা দেনা।

ঠিক এই সময়ে ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ফুট চওড়া, কাল মিশমিশে এক বৃহদাকার পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল হাতে লোহাবাঁধান লাঠি। সে নিঃশব্দে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব। তখন ম্যানেজার রসিক বাবু বলিলেন, "আজ যা হবার তা হইয়া গেল, বাকি টাকার একটি লেখাপড়া করিয়া দিন। রাজাবাহাদুরের নিয়মমত এই বৃহদাকার লোকটি আপনার স্বাক্ষরিত লেখাপড়াটি লইতে আসিয়াছে। দেরী করিবেন না, শীঘ্র লিখিয়া দিন। ভগবান্ মুখ তুলে চান ত অপর কোন দিন জিতিয়া অদ্যকার শোধ লইবেন।"

কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় দেখিলেন, বাগবিতণ্ডা করা বৃথা। এই যম-দূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, শীঘ্র লেখাপড়া করিয়া দেওয়াই ভাল। কৈলাস শাস্ত্রী মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন। রসিক বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ম্যানেজার মশাই, এ কি হইল? আমি এ টাকা কোথা হইতে দিব? আমাকে বেচিলেও এ টাকা হইবে না। আর আপনার কথামতই গৃহিণীর ও কন্যাদের গহনা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। কন্যা দুইই চার দিন বাদে শ্বশুরবাড়ী যাইবে। কোথা হইতে তাহাদের গহনাগুলি ফেরত আনিয়া দিব? ম্যানেজার বাবু; এ কি হইল? ভগবান্ এ কি করিলেন?"

ম্যানেজার।—কবিরাজ মহাশয়, যা হবার, তা হইয়া গিয়াছে। অপর এক দিন হৃত অর্থের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন। এই সেরেস্তার নিয়মমত একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিন। ইহাতে লেখা থাকিবে, আপনি স্বইচ্ছায় এই খেলা খেলিয়াছেন। কাহারও অনুরোধে উপরোধে নয়। ৩ হাজার টাকা আপনার নাই, সেই জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছেন, সুবিধা হইলে আপনি টাকা দিয়া হ্যাণ্ডনোট উদ্ধার করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়, এ ধর্ম্মের সংসার, হ্যাণ্ডনোটের যাহাতে শীঘ্র নালিস না হয়, তাহা দেখিব। আর একদিন খেলিয়া এই টাকা শোধ দিবেন। আর নগদও পাঁচ সাত দশ হাজার লইয়া যাইবেন। কি বলেন ?

শাস্ত্রী মহাশয় হতভম্ব হইয়া বহিলেন এবং খাজাঞ্জি মহাশয় ৩ হাজার টাকার একটি হ্যাণ্ডনোট প্রস্তুত করিয়া আনিলে যমদূতের দিকে চাহিলেন আর বিনা বাক্যব্যয়ে হ্যাণ্ডনোটটি সই করিয়া দিলেন।

এই খেলাটি এইরূপ যে, ঠিক খেলা হইলেই বাহিরের খেলোয়াড় প্রত্যেক দানেই জিতিবে ; কিন্তু খেলার ঘুঁটির মধ্যে দুই একটি সরাইয়া লইলে আগন্তুকের অব্যর্থ হার, রাজাবাহাদুরের অব্যর্থ জিত। কিরূপ করিয়া প্রত্যেক আগন্তুক হারিয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য খেলার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

এমন কোন সংখ্যা—যাহাকে ৪ দিয়া ভাগ দেওয়া যায় এবং কোন অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ সংখ্যার ঘুঁটি লইয়া খেলা আরম্ভ হয়। তাহার মধ্যে একটি ঘুঁটি প্রথম নম্বর ঘোড়া, দুইটি ঘুঁটি দ্বিতীয় নম্বর ঘোড়া এবং তিনটি ঘুঁটি তৃতীয় নম্বর ঘোড়া বলিয়া ধরা হয়। যথা—৪৮টি ঘুঁটি লওয়া হইল। ইহা হইতে একটি ঘুঁটি এক নম্বর, দুইটি দুই নম্বর, তিনটি তিন নম্বর, এই ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর মিলিয়া ৬টি ঘুঁটি ৪৮টি ঘুঁটি

হইতে লইয়া তিনটি পৃথক্ পৃথক্ থাকে টেবিলের উপর রাখা হইল। অবশিষ্ট ৪২টি ঘুঁটি রাজাবাবুর কোঁচড়ে থাকিল। টেবিলটিকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ হিসাবে ধরা হইল। যে বাবুটি খেলিতে আসিলেন, তাঁহাকে ঐ ১, ২, ৩ নম্বর ঘোড়ার যে কোনটি ধরিতে বলা হইল। এখন তিনি যদি ১ নম্বর ঘোড়া ধরেন, এই একটি ঘুঁটি অন্য ঘুঁটির (যাহা কোঁচড়ে ছিল) সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকেই Running the race বলে। কোঁচড়ের ৪২টি ও ১ নম্বর ১টি মিশাইয়া ৪৩টি হইল। এখন এই ৪৩কে যদি ৪ দিয়া ভাগ করা হয়, তাহা হইলে ৩ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তিন নম্বরের ঘোড়া মাঠে পড়িয়া রহিল। অতএব বাবুটি ১ নম্বর ঘোড়া ধরায় এবং সেই ঘোড়া মাঠে পড়িয়া না থাকায় তিনি খেলায় জিতিলেন!

এখন যদি তিনি ২ নম্বরের ঘোড়া ধরেন, তাহা হইলে সেই দুইটি ঘুঁটি ৪২টি ঘুঁটির সহিত মিলিয়া ৪৪টি হইল। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রে কেহই জিতিল না। কারণ, কোন ঘোড়াই মাঠে পড়িয়া রহিল না।

এখন ধরুন, বাবুটি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ৪২টি আর ৩টি ঘুঁটি লইয়া ৪৫টি হইল। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ১ নম্বরের ঘোড়া মাঠে পড়িয়া রহিল, বাবুটি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরায় তিনি জিতিলেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বাবুটি ১ নম্বরের কিম্বা ৩ নম্বরের ঘোড়া যেটিই ধরুন, সেইটাতেই জিতিবেন। আর যদি ২ নম্বরের ঘোড়া ধরেন, তাহাতে তাঁহার কোন লোকসান হইবে না। বাবুটি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হারিবার কোন রকম সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি খেলিতে রাজি হন।

এইবার রাজাবাবুর দলের লোক রাজাকে খেলিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিয়া ডাকিয়া আনে। যদি বাবুটির কাছে নগদ টাকা থাকে, তবেই রাজাবাবু খেলাতে মত দেন। তখন বাবুটির সঙ্গে রাজাবাবুর খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম প্রতি খেলাতেই আগন্তুক বাবুটি স্বতঃসিদ্ধভাবে জিতিতে থাকিলে, তিনি একটু বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তখন ম্যানেজার বাবু বাবুটিকে ঘুঁটি গুণিতে এবং ৪ দিয়া ভাগ করিতে সাহায্য করেন। এই সময় ম্যানেজার বাবু কয়েকটি ঘুঁটি সরাইয়া ফেলেন। কয়টি ঘুঁটি সরাইতে হইবে, তাহা ম্যানেজার বাবুর ভালরূপেই জানা আছে। যেমন উল্লিখিত কোঁচড়ের ৪২টি ঘুটি হইতে ম্যানেজার বাবু ২টি ঘুঁটি সরাইলেন,কেন না, বাকী ৪০ ঘুটি ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রে বাবুটি যদি এক নম্বরের ঘোড়া ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ৪০টি ঘুটির সহিত তাঁর ঘোড়াটি অর্থাৎ একটি ঘুঁটি মিশাইলে ৪১টি হয়। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ এক থাকে অর্থাৎ এক নম্বরের ঘোড়া মাঠে পিছাইয়া পড়িয়া রহিল এবং কাজেই বাবুটিকে হারিতে হইল।

যদি তিনি দুই নম্বরের ঘোড়া ধরিতেন, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ৪০+২=৪২ রহিল, ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ২ই অবশিষ্ট থাকিল, অর্থাৎ ২ নম্বরের ঘোড়া মাঠে পিছাইয়া পড়িয়া রহিল, এ ক্ষেত্রেও বাবুটি হারিলেন।

যদি ৩ নম্বরের ঘোড়া ধরিতেন, তাহা হইলে ঐরূপ ৪০+৩=৪৩, ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে ৩ ভাগশেষ থাকে, অর্থাৎ ৩ নম্বরের ঘোড়া পিছাইয়া পড়িল। বাবুটি আবার হারিলেন।

এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, বাবুটি যে কোন ঘোড়াই ধরুন, দুইটি ঘুঁটি সরাইয়া লওয়ার দরুণ প্রতিবারেই বাবুটি হারিলেন।

কন্দর্প আচার্য্য ও সর্ব্বভুক্ অনেক দিন ধরিয়া এইরূপ নওসেরিয়া দল চালাইল। সব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত রাখায় এইরূপে দিনে ডাকাতি করিয়াও ধরা পড়িল না। এইরূপ অসদুপায়ে বহু লোককে ঠকাইয়া প্রভূত অর্থো পার্জ্জন করিল। কিন্তু অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ প্রায় থাকে না। যখন তাহাদের নাম বিশেষ জাহির হইয়া পড়িল, অবস্থাবিশেষে তাহাদের নামে দুই একটি মামলাও রুজু হইল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে এবং যথেষ্ট অর্থ খরচের বলে তাহাদের অব্যাহতিলাভ হইল। ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া এইরূপ জুলুম করিয়া তাহারা দুজনে বেশ কারবার চালাইয়া দিল। কিন্তু ভগবানের রাজত্বে ইহা প্রায় দেখা যায়, ঘোর পাপী ও নারকী আইনের হাত হইতে অনেকবার অব্যাহতি পাইয়াছে, অনেক ঘোরতর পাপ করিয়া মনুষ্য-বিচারালয়ে খালাস পাইয়াছে; কিন্তু যখন পাপের বোঝা পূর্ণ হইল, তখন সামান্য অপরাধে অধিক সাজা পাইল।

যখন পাপী ভাবিতেছে, আমি ক্রমান্বয়ে মানুষ-বিচারককে ফাঁকি দিয়া আসিতেছি, মানুষের চোখে ধূলা দিয়া ক্রমান্বয়ে অব্যাহতি পাইয়া আসিতেছি, যখন পাপী এই ভাবে বিভোর, আত্মপ্রসাদে মজগুল হইয়া আছে, তখন একটা অতি সামান্য অপকর্ম্মে সে সাজা পায়। ক্রমান্বয়ে গুরুপাপে অব্যাহতি পাইয়া শেষে অতি সামান্য—লঘুপাপে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয়। পাপের বোঝা ক্রমান্বয়ে ভরপুর হইয়া সে সামান্য একটা ভুলে আজন্ম-পাপের সাজা একেবারে পায়। কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে; তবে দুদিন পূর্ব্বে কিম্বা দুদিন পরে। ১৬ বৎসর ধরিয়া মানুষ ঠকাইয়া কন্দর্প অব্যাহতি পাইল। সর্ব্বশেষে এক জন চীনা কন্‌ট্রাক্টরকে রাজ-প্রাসাদ প্রস্তুত করিবার জন্য বল্লভপুরে লইয়া গেল এবং গঙ্গার গর্ভে এক প্রকাণ্ড জমিখণ্ড দেখাইয়া বলিল, ইহাতে অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে। সেই চীনা মিস্ত্রীকে কাঠের কাজের জন্য Contract দেওয়া হইবে। তবে

পূর্ব্ব হইতে তাহাকে জানা নাই, সেই কারণে কন্দর্পের কাছে তাহার ৩ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে। এইরূপ টাকা জমা লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। লেখাপড়া হইবার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই। চীনা কন্‌ট্রাক্টরটি অনেক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন দেখিল, টাকা আদায়ের কোন সুবিধা হইল না, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টের নালিশ করিয়া দিল —প্রতারণার অজুহাতে।

নালিশও রুজু হইল, ওয়ারেণ্টও বাহির হইল ; কিন্তু আসামী আর ধরা পড়ে না, আমি ফরিয়াদীর উকিল ছিলাম। ৩ মাস ধরিয়া যখন আসামীর ধরা পড়ে না, তখন আমি ডিটেক্‌টিভ ডিপাটমেণ্টের ডেপুটী কমিশনার স্বর্গীয় বার্ড (Mr. L. N. Bird.) সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, যখন পুলিশ-কর্ম্মচারীদের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে হুগলী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত দেখা হইবে, তখন যেন এই ওয়ারেণ্টের জারি না হওয়ার কথা তাঁহার কর্ণগোচর করেন। বার্ড সাহেব তাহাই করিলেন। ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হুকুম দিলেন যে স্থানীয় ইনস্পেক্টার যদি ৭ দিনের মধ্যে কন্দর্পকে গ্রেপ্তার না করে, তবে তিনি বিশেষ রুষ্ট হইবেন। এই হুকুমের ফলে ৩ দিনের মধ্যে কন্দর্প কোর্টে হাজির হইল।

মোকর্দ্দমা চলিল। তাহার জবাব হইল, চীনেম্যান ৩ হাজার টাকা জুয়ায় হারিয়ে গিয়াছে, কার্য্যের জন্য জমা দেয় নাই।

প্রথমে শুনা গেল, জুয়া প্রমাণ করিতে এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আসামীর সাক্ষিরূপে আসিতেছেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার সরকার আসিল, তিনি নিজে আসিলেন না। জেরায় সরকারটি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইল। কন্দর্পের সহিত আমার পরিচয় ছিল। কোন এক সভায় আমরা দুইজনেই ছিলাম। কন্দর্প আসিয়া এই মামলার কথা

তুলিলে আমি বলিলাম,—"কন্দর্পবাবু, আমাকে মাপ করিবেন। আমি ফরিয়াদীর উকিল হইয়া এ মামলার কথা কহিতে পারিব না। তবে আপনার খাতিরে আমি এইটি করিতে পারি, যদি আপনি চীনাকে ১৫ শত টাকা দেন, আমি অনুরোধ করিয়া মামলা তুলিয়া লইতে পারিব। কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে, আমি ফরিয়াদীর উকিলরূপে আপনার উপর চাপ দিয়া এই টাকাটি আদায় করিয়া দিলাম, তাহা হইলে এই টাকা দিবেন না।"

সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আর কোন দিন আসিল না। শেষে মামলা চলিল। কন্দর্প দোষী সাব্যস্ত হইল এবং তাহার সশ্রম ১৮ মাস কারাদন্ডের আদেশ হইল। এই রায়ের বিরুদ্ধে কন্দর্প হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল এবং আরও কিছু খরচ হইয়াছিল; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। নিম্ন আদালতের রায় বজায় রহিল। নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালত মিলাইয়া তাহার ৮ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। অধিকাংশ ঘৃণিত পাপীদের শেষ সাজা এইরূপই হইয়া থাকে।

পাঠক-পাঠিকাগণ বলিতে পারেন, প্রকাশ্যভাবে এই জুয়াচুরি চলিতেছে, হাজার হাজার লোক ঠকিতেছে, সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তথাপি ইহার দমন হইতেছে না, এত বড় রাজার রাজত্বে পাপকার্য্য বন্ধ হইতেছে না কেন? তাহার কারণ—

প্রথম।—এই নওসেরিয়া দলের লোকরা এমনভাবে কার্য্য করে, সে ব্যতীত অন্য কেহ কাহার দলের লোক এখানে উপস্থিত থাকে না। কাজেই সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব হয়। জুয়া খেলা প্রমাণ করিতে হইলে যে সব সাক্ষ্যের প্রয়োজন, তাহার অভাব। কারণ, সব লোকই অপর পক্ষের।

দ্বিতীয়।—প্রতারণার ধারায় (Section 420 I. P. C.) ইহাদের চালান দিলেও প্রমাণের অভাব। কারণ, জুয়ারীরা এক জনের অধিক অপর পক্ষের লোককে সে স্থানে রাখে না।

তৃতীয়।—যাহাদের মনে মনে নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান আছে, তাহারা ঠকিয়াও প্রকাশ করিতে চাহে না যে, তাহারা ঠকিয়াছে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিতে চায়। সেয়ানা বলিয়া অভিমান, কাজেই প্রতারিত হইয়াছে বলিয়া কাহারও নিকট নিজ স্বল্পবুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে চায় না।

চতুর্থ।—এই নওসেরিয়া দলের চর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, তুমি থানায় যাইতেছ, তুমি উপরওয়ালাদের নিকট নালিশ করিতেছ, সব তাহারা খবর রাখে। যতদূর পারে, প্রতারিতকে স্তোক দিয়া রাখে। যখন দেখে, "শিকার" কিছুতেই বাগ মানিতেছে না, কিম্বা তাহার পিছনে লোক জুটিয়াছে, তখনই বলে, "মাছি লাগিয়াছে, জাল তোলো।" লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিঞ্চিৎ অংশ ফিরাইয়া দিয়া প্রতারিত ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা করে।

পঞ্চম।—আইন ঠিক আছে, কিন্তু সেই আইনটি বলবৎ করিতে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহার লোকের অভাব কিম্বা সেই সব লোক অন্য কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকার দরুণ এসবগুলি দেখিতে সময় পায় না।

ষষ্ঠ।—জুয়া খেলিয়া সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হয়, ইহা সকলেই জানে। সকল সময়েই সকল যুগেই শকুনির আধিপত্য আছে। মহাভারতের সময়েই যে শকুনির প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা নয়, এখনও পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব আছে। ভদ্রলোকও জুয়া খেলিতে ব্যস্ত। মহাভারতের সময় কুরুপাণ্ডব ছিল, এখন তাঁহাদের বংশধররা বা স্থলাভিষিক্ত লোকরা আছেন। জুয়া খেলিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত, ইচ্ছা করিয়া পতঙ্গরূপে আগুনে ঝাঁপাইয়া

পড়িতেছে। সেই কারণে যত দিন না মানুষের শিক্ষার উন্নতিলাভ হয়, যত দিন মানুষ বিশেষরূপে ধর্ম্মশিক্ষা পায়, তত দিন কোন আইনই এই বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যত দিন না মানুষ বুঝিবে, ভগবানের ইহা অভিপ্রেত নহে যে, মানুষ বিনা পরিশ্রমে বিনা চেষ্টায়, বিনা কর্ম্মে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তত দিন মানুষ লাভ করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই হইবে।

এই জুয়াচুরি খেলায় হার ত' নিশ্চয়। তাহার উপর লাভ প্রহার, কাড়িয়া লওয়া, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রত্যহ লোক শুনিতেছে, জানিতেছে, হারিতেছে, তথাপি এই নওসেরিয়া দলের "শিকারের" অভাব হইতেছে না; তাহার কারণ, লোকের প্রভূত ধনলিপ্সা, ধর্ম্মহীন শিক্ষা, যেন তেন প্রকারেন অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা, ভগবানে বিশ্বাসের অভাব, নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর অগাধ বিশ্বাস। ধারণা, যেন তেন প্রকারেণ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই সুখী হইতে পারিবে। তাহা হয় না, তাহা হইবার নহে। জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যে অধর্ম্মের উপর অধিষ্ঠিত ভিত্তিতে সাময়িক কিছু সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ শান্তিপ্রদ ফল পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ কথা

হতভাগিনী

চক্‌চক্‌ করিলেই সোনা হয় না, এই বাক্যটি অনেক বিষয়েই খাটে। বাহ্য চাক্‌চিক্য দেখিয়া ভিতরে প্রকৃত বস্তু আছে, এইরূপ বোধ করার অপেক্ষা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর হইতেই পারে না। হতভাগিনী বারবনিতাদের সম্বন্ধে এই কথা বিশেষরূপে খাটে। তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয়, তাহারা না জানি কতই সুখে আছে! পয়সাতে যাহা পাওয়া যায়, সে সমস্তই বিশেষরূপ উপভোগ করিতেছে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে নামে ও কামে উভয়েই তাহারা অতিশয় হতভাগিনী। তাহাদের জীবন মরুভূমি অপেক্ষাও ধূ ধূ করিতেছে, কুত্রাপি সুখ-শান্তি নাই। দুই পাঁচ জন পুরুষকে তাহারা যেমন কুব্যবহার করে, অনেক পুরুষের ব্যবহারেও তাহাদের বিষময় জীবনকে আরও বিষময় করিয়া তোলে। অনেক অনভিজ্ঞ যুবক তাহাদের রূপের মোহে তাহাদের কবলে পতিত হয় এবং যথাসর্ব্বস্ব হৃত হয়। অপর পক্ষে তাহাদের যৎসামান্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার বদমায়েস ও খুনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে, তিন জন চার জন ও ততোধিক বদমায়েস একত্র হইয়া পরামর্শ করিতেছে, কি করিয়া চুরি-ডাকাতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে। এইরূপ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহারা দেখিল —অর্থ-উপার্জ্জনের এক বিশেষ সহজ উপায় আছে। আত্মীয় বলিতে এ জগতে বেশ্যাদের কেহই নাই। অনেক সময়েই বেশ্যাদের যে মাতা থাকে, তাহারা উপমাতা অর্থাৎ গর্ভধারিণী মাতা নহে, পালনকারিণী

মাতা। এই শ্রেণীর মাতাকে স্নেহ-মমতা কখন পীড়া দেয় না। স্নেহ, ভালবাসা, মমতা কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। জানে কেবল গোগ্রাসে আহার করিতে, আর বালিকাদের উপর অত্যাচার করিতে; আর কদর্য্য ব্যবহার করিয়া, এই সব বালিকা আত্মবিক্রয় দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, সেই টাকা দিয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ পশুবৃত্তির জন্য মানুষ ক্রয় করিতে। এই হতভাগিনীদের মধ্যে অধিকাংশ সরস্বতী ও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। জীবনের মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ আভরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং সেই অলঙ্কারগুলি অধিক সময়ে অন্যত্র রাখিবার স্থানাভাবে,—জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল তাহাদের অর্জ্জিত অলঙ্কারগুলি নিজের শরীরেই রাখিয়া দেয়। রাখিবার অন্য স্থান নাই, অপরকে বিশ্বাসও করে না, সেই হেতু নিজ শরীরে অলঙ্কারগুলি ধারণ করিয়া রাখে।

আজ প্রায় গত ২০ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি, কতকগুলি চোখা চোখা বদমায়েস অর্থ উপার্জ্জনের জন্য এই শ্রেণীর বারবনিতাদের অলঙ্কারাদির উপর নজর দিয়াছে। এই দলের মধ্যে যাহারা নেতা, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহাদের নামধামের তথ্য সংগ্রহ করে। তাহার পর যাহাদের সহিত একমত হইয়া কাজ করিবে, তাহাদের এক জন বা দুই জনকে এই সংবাদ-সংগ্রহের কথা বলে, উহাদের মধ্যে যখন ঠিক হয় যে, কোন্ কোন্‌টি তাহাদের বধ্য হইবে, তখন তাহাদের দলে তিন চার জন মিলিয়া প্রথম কামিনীর ঘরে, তাহার পর জটিলার ঘরে দুই এক দিন আনাগোনা করে। অনোগোনা করিয়া ঠিক করিয়া লয়—কোন্ সময় ঐ বাটীতে আসিবে এবং কখন্ কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ বাটী পরিত্যাগ করিবে। প্রথম দুই দিন বা তিন দিন কামিনীর ঘরে আসে, মদ্যাদি পান করে, কিঞ্চিৎ খাবারও খায় এবং এক জন বাবু সাজিয়া

তথায় রাত্রির কিয়দংশ যাপন করে! অপর দুইটিকে তাহার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কামিনীর ঘরের মেঝের বিছানায় ঐ সময়টি কাটাইয়া দেয়।

অধিকাংশ সময়েই যে রমণীর অঙ্গে অনেকগুলি আভরণ আছে, তাহাকেই তাহাদের বধ্য বলিয়া ঠিক করিয়া লয়। দুই এক দিন কামিনীর ঘরে যাইবার পর, শেষ দিনে তাহারা খাদ্যের সহিত ধুতুরা, ভাঙ্গ বা অন্য কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশাইয়া দেয় এবং স্ত্রীলোকটি অজ্ঞান হইলে, তাহারা যাহা কিছু তাহার গাত্রে গহনা ছিল, সেই সব লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করে এবং গহনাগুলি হস্তগত হইবার অব্যবহিত পরেই সেইগুলি বেচিয়া যাহা হয়, নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এই সব লোকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অধিকাংশ বাটীতেই বাড়ীওয়ালী রাত্রি ১২টার পর ভিতর-দিক হইতে সদর-দরজায় চাবি লাগাইয়া দেয়, আর ভোর ৫টায় সে নিজে কিম্বা অপর কোন ভাড়াটিয়ার দ্বারা চাবি খুলিয়া দেয়। এই কারণে মধ্যরাত্রিতে বাড়ী হইতে কেহ বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বদমায়েসেরা দেখিয়া লয় যে, রাত্রিতে সদর-দরজায় চাবি দেওয়া হয় কি না এবং যদি জানিতে পারে, চাবি দেওয়া হয়, তবে সেই তালার একটি চাবি তৈয়ারী করিয়া, তাহাদের নিজেদের কাছে রাখে।

পূর্ব্বে মোটামুটি এইরূপ ভাবেই ঐ বেশ্যাগুলিকে অজ্ঞান করা হইত এবং তাহাদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব করা হইত। কিন্তু অধুনা সর্ব্ববিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বেশ্যাদিগকে খুন করিবার পদ্ধতিও অনেক হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া কাড়িয়া লয়, গলায় ফাঁস লাগাইয়াও মারিয়া ফেলে; তবে অনেক সময়েই তাহাদের চেষ্টা থাকে, শিকারকে অনেকক্ষণ অজ্ঞান রাখিয়া তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা।

সব বিষয়ের একটা করিয়া মরশুম আসে। বারবণিতাকে অজ্ঞান করিয়া তাহাদের গহনা চুরিরও একটা মরশুম মাঝে মাঝে দেখা দেয়। উপর্য্যুপরি দুই চার পাঁচ মাস এইরূপ ঘটনা ঘন ঘন ঘটিয়া থাকে। আবার দুই বৎসরের মধ্যেও এরূপ একটি ঘটনাও ঘটে না। কিন্তু যখন একবার প্রকৃতির প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন বেশ্যা ও পুলিসকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আজ রামবাগান, কাল সোনাগছি, পরশ্ব রূপোগাছি, তার পর ভবানীপুর, হরিবর্দ্ধনের গলি, মানিকতলা স্পার ইত্যাদি স্থানে স্থানে যেখানে এই শ্রেণীর হতভাগিনীরা বাস করে, সেই সকল স্থানে এই সব ঘটনা ঘটে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে খাদ্যের সহিত ধুতুরা মিশাইয়া ইহাদিগকে অজ্ঞান করা হইত এবং ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করা হইত। তার পর, মদের সহিত মর্ফিয়ার বড়ী মিশাইয়া ইহাদিগকে অজ্ঞান করাইবার চেষ্টা করা হইত, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মদের সহিত মর্ফিয়া খাইয়া ইহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িত না, বরং উত্তেজিত হইয়া অধিক মাত্রায় চেঁচামেচি, চিল্লাচিল্লি করিত। অতঃপর আর একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল। ইহাদিগকে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া শেষে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ার-মদ্যের সহিত Potassium Cyanide মিশাইয়া ইহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইত এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের জীবনলীলা শেষ হইত। Potassium Cyanide ভয়ঙ্কর বিষ। ডাক্তারদের মতে, যে হতভাগ্য বা হতভাগিনী ইহা গলাধঃকরণ করিয়াছে, সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, এই বিষের কার্য্য খুব শীঘ্র হয়—২ হইতে ১০ মিনিটের মধ্যে কার্য্যশেষ। এই বিষটি মারাত্মক।

১৯২০ খৃঃ অব্দে লালমোহন কর্ম্মকার এবং শচীনন্দন শাহা ও আর এক জন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ওরফে জয়ন্তীকুমার ভৌমিক, এই তিন

জন আসামী একসঙ্গে মতলব করিয়া, ছয়টি খুন করার অপরাধে ধৃত হয় ও তাহাদিগকে আদালতে চালান দেওয়া হয়। তাহারা যে অপরাধগুলি করে, সেগুলির ঘটনা ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃঃ অব্দে। প্রত্যেক ঘটনার তারিখগুলি, ও যে ছয়টি স্ত্রীলোক খুন হয়, তাহাদের নাম ও ঠিকানা এইরূপ :—

(১) মানদাবালা দেবী, ৩০৭, আপার চিৎপুর রোড, ২-৯-১৭।

(২) সুরবালা, ৪০নং শিবতলা লেন, ঢাকাপটী, ২১-২-১৮।

(৩) কৃষ্ণা, ২৯৫এ, আপার চিৎপুর রোড, ৪-৬-১৮।

(৪) ননীবালা, ৪৭নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, ৯-৪-১৯।

(৫) সুবাসিনী দাসী, ২০নং দয়াল মিত্র লেন, ৩-১২-১৯।

(৬) যামিনী, সত্যপীরতলা, কালীঘাট, ৪-১০-১৮।

ইহাদের প্রত্যেকেরই গায়ে অলঙ্কার ছিল, সেই জন্য দুর্ব্বৃত্তরা ইহাদিগকে বাছিয়া লইয়াছিল।

যেমন যেমন ঘটনাগুলি ঘটে, থানাতে রিপোর্ট হয়, কিন্তু কেহই তখন আসামীর নাম দিতে পারে নাই, শেষ ঘটনাটি সম্বন্ধে আসামীর নাম পাওয়া যায় এবং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মহেন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায়, যিনি তার পর Assistant Commissioner, North District হন ও পরে রায়সাহেব হন। তিনি তদারক করিবার সময় দেখিলেন, সব ঘটনা একই রকমের। অর্থাৎ প্রত্যেকটিতেই অলঙ্কারাদি দেখিয়া বধ্যকে বাছিয়া লওয়া হয় এবং তাহাদিগকে প্রাণে হত্যা করিয়া সমস্ত অলঙ্কার চুরি করা হয়। আর প্রত্যেক নিহত নারীর ঘরে দুই তিন দিন দুই তিন জনে যাইয়া তবে এ কার্য্য সমাধা হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এইরূপ খুন করিয়া চুরির যতগুলি মামলা হইয়াছিল, সবগুলির রিপোর্ট বাহির করিয়া, তিনি পুনরায় নূতন করিয়া তদারক

আরম্ভ করিলেন। যে যে বাড়ীতে এই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, সেই সেই বাটীর লোকরা আসামীদিগকে সনাক্ত করে এবং তাহারা বলে, "যে রাত্রিতে এই বাটীর স্ত্রীলোক খুন হয়, সেই রাত্রিতে ইহারাই সেই হতভাগিনীর ঘরে আসিয়াছিল।" কতকগুলি চোরাই গহনাও ইহাদের রক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করা হয়। আসামীদের মধ্যে এক জনকে সরকারী তরফের সাক্ষী করিয়া লওয়া হইল। সে তদারকের সময় সমস্ত স্বীকার করিল এবং অন্যান্য আসামীর সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া দিল।

এই মোকর্দ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেসন-সোপর্দ্দ করেন এবং সেখানে আসামীরা দোষ স্বীকার করিয়া ফাঁসির হাত হইতে অব্যাহতি পায় এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হয়। তাহারা বলে, "খুন করিব বলিয়া খুন করি নাই, খুন করিবার মতলবে খুন করি নাই, তবে এই খুনের জন্য আমরা দায়ী।"

এই মোকর্দ্দমায় তৎসাময়িক পুলিস-সার্জ্জেন মেজর এস্, পি, সিংহ যে এজাহার দেন, তাহা হইতে জানা যায়, প্রত্যেক বধ্যটিকে কিরূপ ভাবে বধ করা হইয়াছে। ইহা হইতে আরও জানা যায়, সেই ছয়টি হতভাগিনী জীবিত অবস্থায় প্রত্যেকেই দুরারোগ্য পীড়ায় ভুগিতেছিল। আসামীরা এই ছয় জন স্ত্রীলোককে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাছিয়া লয়। পুলিস-সার্জ্জেনের রিপোর্টে যে সব লোকের বারটান আছে, তাহাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। পুলিস-সার্জ্জেন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে এজাহার দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

"আমি কলিকাতার পুলিস-সার্জ্জেন (ডাক্তার)।

আমি গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মানদাবালা দেবী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের শবদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। উঁহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর।

উক্ত লাস আমার নিকট জমাদার মহম্মদ সফি খাঁ কর্ত্তৃক সনাক্ত হইয়াছিল। দেহটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার নাসিকার ভিতর রক্ত দেখিয়াছিলাম, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং দাঁতের উপর দাঁত পড়িয়াছিল। মুখগহ্বরের ভিতর এক খিলি পান অচর্ব্বিত অবস্থায় ও এক সারি কৃত্রিম দন্ত আল্‌গা অবস্থায় ছিল। গলার সামনে পৌনে দশ ইঞ্চি লম্বা সূত্র-বন্ধনের অস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। বেশীর ভাগই ইহা বাম দিকে প্রতীয়-মান হইয়াছিল, শবব্যবচ্ছেদের পরে দেখা গেল, ইহা শক্ত শ্বেতবর্ণ এবং মোম-কাগজের ন্যায়। তাহার শরীরে কোন কালশিরার দাগ ছিল না, সূত্রবন্ধনীর চিহ্নের মধ্যস্থিত শিরার কিম্বা উপশিরার উপরে থেঁৎলে যাওয়ার কোনরূপ লক্ষণ ছিল না, কিম্বা চর্ম্মের উপর কেবলমাত্র দুই স্থান ব্যতীত আঁচড়ের দাগ ছিল না। বক্ষ এবং স্কন্ধের সম্মুখভাগস্থ শিরাগুলি অতি স্পষ্ট ছিল। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত অন্ত্রগুলি রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। হৃৎপিণ্ডটি চর্ব্বিযুক্ত এবং সুবিস্তৃত। পাকস্থলী সুরার গন্ধযুক্ত অর্দ্ধপরিপক্ক অন্নে এবং গাঢ় রক্তে পরিপূর্ণ। দেহে পুরাতন রোগের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। আমার মতে ইহার মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক গলনালী বন্ধ করার দরুণ শ্বাসরোধ হয়।

সন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জমাদার রঘুবীর ওঝা কর্ত্তৃক সনাক্ত প্রায় ৩০ বৎসর-বয়স্কা সুরবালার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া-ছিলাম। দেহটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। নাক এবং মুখ ফেনযুক্ত রক্তে পূর্ণ ছিল। মুখমণ্ডল, বক্ষের সম্মুখভাগ, বাহুদ্বয় এবং হস্তের তালুদ্বয় নীলাভ ছিল। গলদেশ পরিহিত সাড়ীর দুই অঞ্চলের প্রান্ত দ্বারা আবদ্ধ ছিল। ইহা অপসারণ করিলে পরে দেখা গেল যে, দুইটি হরিদ্রাভবর্ণের চিহ্ন গলদেশ সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করিয়াছে এবং ঐ চিহ্নের মধ্যবর্ত্তী ½ ইঞ্চি অংশ বিস্তৃত। গলদেশের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত উক্ত ½ ইঞ্চি অংশ বিস্তৃত স্থানে ফোস্কা দেখা

গেল। উহা ব্যবচ্ছেদের পর উহার ভিতর কোনরূপ রসবর্ষণ বা দুষ্টব্রণ দেখা যায় নাই। আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়স্থ সমস্ত রক্ত জমাট হইয়া গিয়াছিল। অন্ননালীর ভিতর চর্ব্বিত পাণ বর্ত্তমান ছিল। পাকস্থলীতে গন্ধহীন অপরিপক্ক ভাত, ডাল ও তরকারী ছিল। শ্বাসরোধই ইহার মৃত্যুর কারণ। এই স্ত্রীলোকের নাকে একটি মুক্তাসংযুক্ত সোনার নাকছাবি ছিল, তাহা উক্ত জমাদারের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে জমাদার রামকুমার সিংহের দ্বারা সনাক্ত প্রায় ত্রিংশবর্ষীয়া কৃষ্ণা-নাম্নী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মৃতদেহটি হৃষ্টপুষ্ট থাকা সত্ত্বেও পচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মুখমণ্ডল নীলাভ এবং স্ফীত। উপরার্দ্ধের উভয় পার্শ্বেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নীলাভ, কিন্তু উহা বামদিকে অতিশয় নিবিড়ভাবে দেখা গেল। নাসারন্ধ্রের ভিতর কৃষ্ণবর্ণের তরল শোণিত দৃষ্ট হইল। সাধারণ গামছার সাড়ে তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য অংশ মুখগহ্বরে ভিতরে রুদ্ধাবস্থায় পাওয়া গেল। ইহা অপসারেণ পর দেখা গেল যে, সেই গামছার কতকটা অংশ রক্ত-রঞ্জিত এবং সেই গামছাটি প্রায় ½ ইঞ্চি পুরু করিয়া ভাঁজ করা। একটি লাল পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী সাড়ীর এক অংশ তাহার কোমরের নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপর অংশটি গলদেশকে সুদৃঢ় বেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, উহার দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি সুদৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত দেখা গেল। এই বন্ধনী খুলিয়া লইবার পর ত্বকের উপর কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ব্যবচ্ছেদের পর দেখা গেল যে, উক্ত বন্ধনীর নিম্নস্থিত শিরাগুলি ছিন্ন হইয়া রক্ত বহির্গত হইতেছে। আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়স্থ সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়াছিল। পাকস্থলীতে সুরার গন্ধযুক্ত অর্দ্ধপক্ক অন্ন ও পীতবর্ণবিশিষ্ট তরল পদার্থ বর্ত্তমান ছিল। যকৃৎটি রোগগ্রস্ত। শ্বাসরোধে ইহার মৃত্যু সাধিত হইয়াছে। যদি কোন স্ত্রীলোকের মুখগহ্বরের ভিতর

গামছা বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় এবং তৎসহিত যদি তাহার গলদেশ চাপিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব মনে হয় যে; মুখ-গহ্বরের ভিতর বলপূর্ব্বক গামছা প্রবিষ্ট করিয়া শ্বাসরোধ করা অপেক্ষা কেবলমাত্র গলদেশ চাপিয়া রাখাতে মৃত্যু খুব শীঘ্র সাধিত হয়। শবব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে, গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলে গলত্বকের নিম্নস্থ শিরা ও উপশিরার উপর যেরূপ কঠিন ক্ষত ও যেরূপ রক্তমোক্ষণ হইতে দেখা যায়, আর মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তে যদি কোন লোকের গলদেশ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হয়, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদের সময় একরূপই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ কৃষ্ণা-নাম্নী এই স্ত্রীলোকটির প্রথমে গলদেশ প্রবল বিক্রমে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সহিত মুখের ভিতর বলপূর্ব্বক কাপড় বা গামছা প্রবেশ করানর ফলে মৃত্যু হইয়াছে এবং মৃত্যুর পরক্ষণেই উক্ত শাড়ীর দ্বারা তাহার গলদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করা হইয়াছিল। আমার মনে হয় যে, এইরূপ একই উপায়ে মানদার এবং সুরবালার মৃত্যু সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমে তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল এবং পরক্ষণেই শাড়ীর দ্বারা তাহাদের গলদেশ উত্তমরূপে বন্ধন করা হইয়াছিল।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে রামসুন্দর সিং নামক জমাদার কর্ত্তৃক সনাক্ত পঞ্চবিংশবর্ষীয়া ননীবালা নাম্নী জনৈকা বার-বণিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মৃতের মুখবিবর হইতে চিবুকের বাম কোণ পর্য্যন্ত বরাবর শুষ্ক লালা বিদ্যমান ছিল। তাহার গলদেশ একটি শাড়ীর প্রান্তভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ঃ—গলদেশের সম্মুখভাগে তাহা গ্রন্থিযুক্ত অবস্থায় দেখিলাম। গ্রন্থি উন্মোচনের পর দেখা গেল যে, একটি বক্র চিহ্ন গলদেশের চতুর্দ্দিঃক ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সম্মুখ-ভাগে পূর্ব্ববর্ণিত বন্ধনীর চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে কোন উল্লেখযোগ্য চিহ্ন ছিল না। ব্যবচ্ছেদের পর উক্ত স্থানের নিম্নাবস্থিত শিরা বা উপশিরার উপর ঘর্ষণজনিত কোনরূপ ক্ষত বা তাহা হইতে শ্রোণিতস্রাব হইতে দেখা যায় নাই। দেহের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। অন্তরেন্দ্রিয়-সমূহে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। পাকস্থলীতে কোনরূপ গন্ধবিযুক্ত স্বল্প আম বর্ত্তমান। বস্ত্র গলদেশ সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া শ্বাসনালী রোধ করায় এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে শ্বাসরোধই ইহার মৃত্যুর কারণ। যদি এই স্ত্রীলোকটিকে প্রথমে কেবল হাত দিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়া পরমুহূর্ত্তে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করা হইত, তাহা হইলেও শবব্যবচ্ছেদের সময়ে পূর্ব্ববর্ণিত অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভবপর হইত না। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে যদি কোন স্ত্রীলোককে মৃত্যুপথের পথিক করা যায়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সাধিত করা যায়।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহম্মদ খান্ নামক জনৈক জমাদার কর্তৃক সনাক্ত ত্রিংশদ্‌বর্ষীয়া স্বকুমারী-নাম্নী জনৈকা বারবণিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। শাড়ীর অঞ্চলভাগ দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত এবং নিম্ন-চোয়ালের বামপ্রান্ত বরাবর উহার গ্রন্থি বিদ্যমান ছিল। উক্ত বন্ধনমোচনের পর দেখা গেল যে, একটি প্রশস্ত ঘর্ষণের চিহ্ন গলদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই চিহ্ন কেবলমাত্র গ্রীবাদেশের উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখভাগে বিদ্যমান, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে এই চিহ্ন অত্যন্ত অস্পষ্ট। শাড়ীটির এক প্রান্ত মৃতার কটিদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বামস্কন্ধ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং অপর প্রান্তটি গ্রীবাদেশকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নাসারন্ধ্রের ভিতর শুষ্ক শোণিত এবং দক্ষিণ বাহুর পশ্চাদ্ভাগে একটি পুরাতন ক্ষত বিদ্যমান।

শ্বাসনালী এবং তাহার শাখাপ্রশাখার মধ্যে শুষ্ক শোণিত বিদ্যমান। পাকস্থলীতে শোণিত এবং কোনরূপ উল্লেখযোগ্য গন্ধবিযুক্ত অপরিপক্ক অন্ন, ডাল, মাংস, ডিম্ব, লঙ্কা এবং ব্যঞ্জনাদি সঞ্চিত ছিল না। শ্বাসরোধেই এই স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার উপর আমার পূর্ব্ববর্ণিত মন্তব্য বহাল রাখিলাম।

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে আলী মহম্মদ খাঁ নামক কনষ্টেবলের সনাক্তে ত্রয়োবিংশবর্ষীয়া সুবাসিনী দাসী নাম্নী জনৈকা বার-বণিতার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ইহার শরীরের গঠন মধ্যম প্রকারের। দেহটি পরীক্ষায় দেখা গেল যে, মৃতার মুখটি একটি তোয়ালের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং গ্রীবাদেশ শাড়ীর প্রান্তভাগ দ্বারা বেষ্টন করা এবং গ্রীবার-পুরোভাগে উক্ত বেষ্টনীর গ্রন্থিটি বিদ্যমান। গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বে চারিটি আঁচড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান এবং বামপার্শ্বে উক্ত প্রকারের পাঁচটি চিহ্ন বিদ্যমান। ঐ চিহ্নগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহার মাপ লওয়া একরূপ অসম্ভব। ত্বকের উক্ত চিহ্নে জমাট রক্ত দেখা গেল। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে আর একটি আঁচড় হইতে রক্তমোক্ষণ হইয়াছিল দেখা গেল। অন্তরেন্দ্রিয়গুলিতে শোণিত সঞ্চিত রহিয়াছে। পাকস্থলীতে দুই আউন্স-পরিমিত গন্ধহীন হরিদ্রাবর্ণের ঘন পদার্থ ছিল। শ্বাসরোধে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই ঘটনায়ও স্ত্রীলোকটির গ্রীবাদেশ পেষণে এবং বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে এবং পরে তাহার গ্রীবাদেশে শাড়ীর প্রান্তভাগ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব্বে যদি কেহ সুরা পান করে, তাহা হইলে শবব্যবচ্ছেদকালীন সেই সুরার গন্ধ পাকস্থলীতে সকল সময় বিদ্যমান থাকে না।

স্বাক্ষর—এস, পি, সিংহ।"

এই ঘটনায় যে আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার জবান-

বন্দি নিম্নে লিখিত হইল। তাহাব জবানবন্দি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—ঘটনাটি কিরূপ।

নাম—জ্ঞা'নন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ওরফে জয়ন্তীকুমাব ভৌমিক। আমি ২৬ নং হাটখোলায় থাকি, বর্ত্তমানে আমি বেকার।

১ নং আসামী লালমোহন কর্ম্মকারকে প্রায় ৭।৮ বৎসর যাবৎ জানি। সে তারক চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে থাকে এবং সোনারূপাব কার্য্য কবে। ১৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে (সোনাগাছি) তাহার দোকান। সন ১৩২৪ সাল হইতে আমি ২ নং আসামী শচীনন্দন সাহাকে জানি। পূর্ব্বে সে ১৩ নং অভয়চন্দ্র মিত্র ষ্ট্রীটে থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সে ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেবশ্রী গ্রামে বাস কবে। সে আমায় বলিয়াছিল যে, সে কোন পাট-ব্যবসায়ীর অধীনে চাকুরী কবে। আমি প্রবেশিকা ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। ঢাকা জিলাব অন্তর্গত তেজপুর গ্রামে আমাব বসতবাড়ী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় এবং গ্রামে কোন একটি ফৌজদাবী মামলায় জড়িত হওয়ায়, আমি সে স্থান হইতে কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসি এবং এ স্থানে (কলিকাতায়) কার্য্যানু-সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাব সহিত ১ নং আসামীর, তাহার সেই সময়কার ৭১।১ নং বেণিয়াটোলাস্থিত দোকানে সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল যে, সে আমার পিতাকে ভালরূপ জানে; তিনি একজন ডাক্তার। তাহার বাটী আমার স্বগ্রাম হইতে দুই মাইল দূবে ঢাকা জিলাব অন্তর্গত দানিয়াপুৎ গ্রামে। সে আমাকে আশ্রয় ও আহারাদি দিয়াছিল। আমি প্রায় দুইমাসকাল তাহাব সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম। কুমারটুলীতে জনৈক ইষ্টক-ব্যবসায়ীর অধীনে আমি একটি কাজেব যোগাড় করিয়াছিলাম। তথায় ফরিদপুর নিবাসী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই লোকটি একটি বারবণিতার

গৃহে থাকিত। তথায় আর একটি বারবণিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমি তাহার ঘরে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। পূর্ণর অনুরোধ ঐ চাকুরীতে ইস্তফা দিলে, সে অন্য স্থলে আমায় আর একটি কার্য্যে বাহাল করিয়া দিল। সেই সময়ে অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে আমি ১ নং আসামী লালমোহনের নিকট ফিরিয়া যাই। লালমোহন মুর্শিদাবাদের কোন এক জন রাজার ষ্টেটে আমার একটি চাকুরীর যোগাড় করিয়া দেয়। প্রায় এক বৎসর পরে নায়েবের সহিত আমার মনোমালিন্য হওয়ায় আমি ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দিই এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। লালমোহনও ঠিক ঐ সময়ে সেখানে গিয়াছিল এবং আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসার পর সে-ও ফিরিয়া আসে। আমি নূতন কার্য্যানুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে যাইতে লাগিলাম। কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় আমি একটি স্ত্রীলোককে আনিয়াছিলাম এবং আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তখন চুরি করিতে লাগিলাম। প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে কলুটোলা থানা হইতে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস যাবৎ কারাবাস করি। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আমি সেই স্ত্রীলোকটির নিকট ফিরিয়া আসি – তাহার নাম সত্যবালা। আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য আমি অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ধার করিতে আরম্ভ করি। প্রায় ৬ মাস পরে হঠাৎ এক দিন লালমোহনের সহিত রাস্তায় দেখা হইল এবং সে আমাকে তাহার সোনাগাছিতে দোকানের কথা বলিলে আমি সেখানে তাহার সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সত্যবালা আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে চিৎপুর রোডে সরোজিনী নামে একটি স্ত্রীলোককে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া বসবাস করিতেছিলাম। এক দিন লালমোহনকে আমি তথায় লইয়া আমার জীবনের ইতিহাস ও

কষ্টের কথা বলিলাম। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া লালমোহন আমায় অভয় মিত্রের ষ্ট্রিটস্থ ২ নং আসামী শচীনন্দনের গদীতে লইয়া যাইয়া তথায় তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেয়। সে নিজেকে এক জন পাটব্যবসায়ী বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে কোনরূপ ব্যবসা করিত না। লালমোহন আমায় বলিল যে, সে শচীনন্দনকে অংশীদারী কারবারের জন্য কতকগুলি টাকা অগ্রিম দিয়াছে। আমি তাহাকে এবিষয়ে কিছু পরামর্শ দিলাম। তৎপরে এক দিন আমি শচীনন্দনের গদীতে বাবুলাল এবং গঙ্গাপ্রসাদ নামে দুই জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখিলাম। তাহারাও আমার নিকট উক্ত কারবারের অংশীদার বলিয়া পরিচিত হইল। সেখানে আমি এক জন কার্য্যকারী অংশীদাররূপে নিযুক্ত হইলাম এবং শচীনন্দন আমায় এই পত্রখানি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিল। সন ১৩২৪ সালের ১লা আষাঢ় তারিখে এই ২ নং পত্রখানা বাবুলাল নামে উক্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি আমায় দিয়াছিলেন। ইহার পরে লালমোহন প্রায় বেশী সময়ই গদীতে থাকিতে আরম্ভ করিল। এক দিন তাহারা আমার নিকট কারবারের জন্য কিছু টাকা চাহিলে আমি ২০ টাকা দিলাম। এক জন মাড়োয়ারীকে ২০ টিন ঘৃত সরাইয়া ঠকান হইয়াছিল এবং সেই টিনগুলি আমাদিগের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। লালমোহন ৬ টিন, শচীনন্দন ৬।৭ টিন পাইল এবং আমি ২ টিন পাইলাম। ইহার জন্য শচীনন্দনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হইলে এই গদী ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর আমি অবগত হইলাম যে, শচীর মা তারক চাটার্জ্জীর লেনের লালমোহনের বাড়ীর এক জন ভাড়াটে বা প্রজা, এবং লালমোহন আমায় অনুযোগ দিল যে, সে কোন ভাড়া দেয় না। পরদিন লালমোহন শরৎচন্দ্র দাস নামে এক জন লোকের সহিত আমার বাসস্থানে আসিয়াছিল এবং আমি উক্ত

শরৎচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলাম। এক দিন শরৎ আমাদিগকে মাটিন কোম্পানীর কর্ম্মচারীর নিকট হইতে টাকা লুঠ করিবার কথা উত্থাপন করিলে আমি অস্বীকৃত হইলাম, কিন্তু লালমোহন ইহাতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার পর ঠকানর অন্য এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল কিন্তু তাহাও বাতিল হইল। তাহার পর ১০।১২ দিন পরে লালমোহন ও শচীনন্দন একসঙ্গে আমার বাসায় আসিয়াছিল এবং শচীনন্দন বন্দুক এবং রিভালবার সহযোগে ডাকাতি করার প্রস্তাব করিল। আমি বলিলাম, তাহারা যদি সে সকল যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। পরদিন তাহারা পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ উপায় স্থির করিয়াছে এবং সেই উপায়টি এই যে, আমরা সকলে মিলিয়া বেশ্যার গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে বিষপ্রয়োগে হত্যা বা অচৈতন্য করিয়া তাহাদিগের সমস্ত অলঙ্কার অপহরন করিব। আমি ইহাতে সম্মত হইলাম এবং শচীনন্দন গঙ্গাধর প্রামাণিকের ঔষধালয় হইতে মর্ফিয়া যোগাড় করার ভার গ্রহণ করিল। পরদিন তাহারা পুনরায় আমার নিকট আসিল। শচীনন্দনের নিকট দুটি শিশি ছোট গুলীতে ভর্ত্তি ছিল। সে বলিল যে, এই গুলী মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ত্রীলোককে উহা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করা হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ সব হাঙ্গামা পোয়ায় কে? ইহাতে লালমোহন স্বীকৃত হইল। তাহার পর তাহারা শিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু শেষে ঐ দলে যোগ দেওয়া স্থির করিলাম। পরদিন সন্ধ্যার সময় তাহারা আমার নিকট আসিল। তখন সম্ভবতঃ সন ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাস; আমি তাহাদের সহিত ফুলবাগানে সরলা নামে এক বেশ্যার নিকট গিয়াছিলাম। মদ আমাদের সঙ্গে ছিল, এবং সেই

মদ আমরা চারজন মিলিয়া পান করিলাম। স্ত্রীলোকটিকে মদ দিবার সময় একবার চারজন মিলিয়া পান করিলাম। স্ত্রীলোকটিকে মদ দিবার সময় একবার এক গ্লাসের ভিতর শচীনন্দন দুইটি গুলী মিশাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতে সামান্য ক্রিয়া দেখা গেল। ইহা দেখিয়া আমি শচীকে আরও বেশী গুলী মিশাইয়া দিতে বলিলাম। উহাতে লালমোহনও সম্মত হইল। রাত্রি প্রায় ১টার সময় ঐ বেশ্যাটি বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল; তবে তাহার জ্ঞানলোপ হয় নাই। সুতরাং আমাদের মতলব ফলদায়ক হইল না। শেষে আমরা চলিয়া আসিলাম। পরদিন রাত্রিতে আরও অধিক গুলী মিশাইয়া সরলাকে মদ্য পান করান হইবে, এই স্থির করিয়া পুনরায় সরলার গৃহে যাইলাম। কিন্তু সে রাত্রিতে সরলা আমাদিগকে গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেয় নাই। পুনরায় আমরা পরদিন রাত্রিতে সরলার নিকট গিয়াছিলাম, আরও অধিক গুলী মিশাইয়া তাহাকে মদ্য পান করাইয়া ছিলাম, কিন্তু সেবারেও আমরা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা শুধু যে সরলাকেই মদের সহিত গুলী মিশাইয়া পান করাইয়াছিলাম, তাহা নহে, আরও ১০।১২টি বারাঙ্গনার উপর গুলী প্রয়োগ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া আমাদের ফিরিতে হইয়াছে। কারণ, ঐ গুলীর প্রয়োগে মনোমত ফল কাহারও উপর পাওয়া যায় নাই।

ক্রমে লালমোহন বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কারণ, এ পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ লালমোহনকেই করিতে হইতেছিল। পরে পরামর্শ করিয়া আর একবার ঐ গুলী প্রয়োগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেবারেও পূর্ব্বেরই মত ফল হইল; অর্থাৎ সেটিও ফলদায়ক হইল না। তাহার পর আমরা পরস্পর মিলিয়া এক দিন এই স্থির করিলাম যে, যখন গুলী মদের সঙ্গে মিশাইয়া বহুবার পান করাইয়া কোন ফল হইল না, তখন এবার

তাহাকে খুব মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাই ভাল। এই উপায়টি উদ্ভাবন করিল লালমোহন, তবে সে আমাদের নিকট প্রস্তাব করিলে আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছি।

ইহার ২ দিন পরে লালমোহন ও শচীনন্দন আমার নিকট আসিয়া আমাকে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে লইয়া গেল। যখন ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে যাই, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় ৮টা। আমরা সকলে দুলালী বলিয়া একটি বেশ্যাকে মনোনীত করিয়া তাহারই গৃহে প্রবেশ করিলাম। কিছু-ক্ষণ আলাপ ও আনন্দের পর আমরা একসঙ্গে মদ্যপান করিলাম এবং আরও একটি গ্ল্যাসে আরও দুটি গুলী মিশাইয়া রাখা হইল। মদ্যপান করিবার কিছুক্ষণ পরে দুলালী বড়ই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, উদ্দাম ও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং আমাদের নিকট তাহার যে ঠিকা টাকা পাওনা ছিল, তাহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন ননীবালা ও অন্য এক জন বেশ্যা আসিয়া আমাদিগকে একটি শূন্য ঘরে বসাইয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিল। সমস্ত রাত্রিটা ত আমাদের সেই ঘরে কাটিল; ভোরবেলা তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে দিয়া আমরা ঐ আবদ্ধ গৃহ হইতে খালাস পাইলাম; খালাস পাইয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সে দিন চলিয়া আসিয়া পুনরায় বৈকালে আমরা বাহির হইয়া আপার চিৎপুর রোডে মানদা নামে একটি বেশ্যাকে পছন্দ করিলাম; অবশ্য তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দিক হইতে হউক বা নাই হউক, তাহার গায়ে যে মহামূল্য গহনাদি ছিল, তাহাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই আমরা মানদাকে পছন্দ করিয়া তাহার ঘরে যাইয়া বসিলাম। কিন্তু সে দিন আমাদের সঙ্গে কোন গুলী ছিল না। আমরা সকলেই যথেষ্ট মদ্যপান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের

মতলব অনুযায়ী কোন কর্ম্মই করি নাই, পরদিন রাত্রিতেও আমরা সকলে মিলিয়া তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু সে রাত্রিতেও পূর্ব্বরাত্রি মত কেবল মদ্যপানেই কাটিল। ঐরূপে পরে আমরা আরও ৪।৫ রাত্রি তাহার নিকট গিয়াছিলাম এবং মদ্যপানও করিতাম। শেষে এক দিন লালমোহন বলিল যে, "আমি এইরূপে কত দিন অর্থব্যয় করিব, তোমাদের কি বল, তোমাদের ত অর্থব্যয় করিতে হইতেছে না, যার পকেটে হাত পড়ে, সেই বোঝে অর্থের কি মূল্য। আমি এরূপভাবেই আমার অর্থ 'ন হোমায় ন যজ্ঞায়' ব্যয় করিতে পারি না।" যখন আমরা দেখিলাম যে, লালমোহন তাহার অর্থব্যয়ের জন্য বড়ই বিরাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন আমরা আমাদের উদ্ভুত উপায়ের সম্যক্ ব্যবহারে কৃত-সঙ্কল্প হইলাম। তখন ১৩২৪ সাল, ভাদ্র মাস। তারিখটা সঠিক আমার স্মরণ নাই, তবে রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় আমরা কয়জনে মিলিয়া আমাদের সেই মানদার গৃহে প্রবেশ করিলাম; প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠিক করিয়াছিলাম যে, শচীনন্দন তাহার কণ্ঠদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিবে, লালমোহন তাহার পা'দুটি খুব কসিয়া ধরিবে এবং আমি তাহার গলার ভিতর কাপড় পুরিয়া দিব। লালমোহন বাবু সাজিল, শচীনন্দন এবং আমি লালমোহনের বন্ধু ও অর্থরক্ষক হইলাম। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মদ খাইতে লাগিলাম। তখন দেখিলাম যে, সেই বাটীতে অন্য একটি গৃহে পুলিস আসিয়াছে। আমরা বাটী হইতে বাহিরে আসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু পুলিস আমাদিগকে আসিতে দিল না, বলিল, "তোমাদিগকে আমাদের এই তল্লাসের সাক্ষী হইতে হইবে।" পুলিস আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল, আমরা সকলেই মিথ্যা নাম দিলাম। শচীনন্দনকে ঐ বাটীর কতক লোক চিনিত বলিয়া সে আমাদের অপেক্ষা কিছু বিলম্বে আসিত। পুলিসের সেই তল্লাসে

কেবল আমিই একা সাক্ষী দিলাম। পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া ঘরখানি, অনুসন্ধান করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রিতে চলিয়া গেল। তাহার পর আমি মানদার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে শচীনন্দন ও লালমোহন তখনও বসিয়া আছে। সে দিন রাত্রিতেও আমরা প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিলাম, তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য-সাধনের কোন কিছুই হইল না। পরে উপর্য্যুপরি আরও দুই রাত্রি আমরা তাহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগকে তাহার বাটির সদর-দরজা হইতেই ফিরিতে হইত, কারণ, তাহার সদর-দরজা সর্ব্বদাই তালা-বন্ধ থাকিত। এইরূপ দেখিয়া লাল-মোহন একটি চাবি ঠিক করিল, চাবিটি জোগাড় করিবার পর আমরা পুনরায় এক দিন সন্ধ্যা ৭টা ৮টার সময় মানদার নিকট যাইলাম। মানদাকে লইয়া একসঙ্গে মদ্যপান করিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় একটি বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমরা তাহাকে আমাদের ঠিক নাম না বলিয়া অন্য নামে পরিচয় দিলাম। মানদা বলিল যে, আমাদের পিতামহের মত বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও পক্ককেশযুক্ত যে ভদ্রলোকটি তাহার নিকট আসিয়াছিল, তিনি মানদার প্রেমের পুরাতন কাঙ্গাল। রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় মানদার সেই পুরাতন বৃদ্ধ খরিদ্দারটি চলিয়া গেল। তখন আমরা আবার মদ্যপান স্থরু করিলাম, রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত মদ্যপান চলিল। তাহার পর শচীনন্দন সহসা উঠিয়া মানদার গলদেশ টিপিয়া ধরিল, লালমোহন তাহার পা'দুটি সবলে ধরিয়া রহিল, আমি মানদার মুখের ভিতর তাহারই পরণের সাড়ী পুরিয়া দিলাম। মানদা ১০।১২ মিনিটের মধ্যে ইহলীলা সংবরণ করিল। তখন আমরা তাহার দেহ হইতে চুড়ি, রুলি, মাকড়ি, তাগা, নেকলেস্ প্রভৃতি একে একে খুলিয়া লইলাম। গহনাদি খুলিবার পূর্ব্বে আমরা মানদার গলদেশ বস্ত্র দিয়া সজোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাতে

সে আর কোনরূপে বাঁচিয়া উঠিতে না পারে। গহনাদি লইবার পর লালমোহনের সেই চাবিটি দিয়া সদর দরজা খুলিয়া চম্পট দিলাম। গহনাগুলি সমস্তই লালমোহনের সঙ্গে রহিল। শচীনন্দন তাহার বাসার দিকে চলিয়া গেল, লালমোহন এবং আমি দুই জনে কলুটোলায় লালমোহনের এক আত্মীয় হরেন্দ্রলাল কর্ম্মকারের দোকানে আসিলাম। যখন হরেন্দ্রের দোকানে আসিলাম, তখন প্রায় ভোর; দোকানে আসিয়া সেখানকার লোকজনের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিলাম; হরেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র গয়া আসিয়া গহনাগুলি কতকাংশ গলাইয়া ফেলিল। বাকী গহনাগুলি লালমোহনই লইয়া গেল। গয়া যে গহনাগুলি গলাইল, তাহা ওজনে প্রায় সাড়ে ১৮ ভরি হইবে; লালমোহনের অনুরোধে হরেন্দ্র কর্ম্মকার ঐ সোনা ৭০৮৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিল; পথে আমাকে দুই শত টাকা দিয়া বাকী সমস্তই লালমোহন লইল। হরেন্দ্রকে লালমোহন বলিল যে, ঐ স্বর্ণ লালমোহনের এক খরিদ্দারের। এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস আমরা চুপচাপ রহিলাম। এক মাস অতিবাহিত হইবার পর আমরা আরও বেশ্যার নিকটে যাতায়াত করিতাম এবং তাহাদের উপরেও ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু কোথাও আমাদের উদ্দেশ্য ফলবান্ হয় নাই। মানদাকে হত্যা করিবার দুই মাস পরেই শচীনন্দন দেশে চলিয়া গেল। শচীনন্দন চলিয়া যাইবার পরেও আমরা কোন কোন বেশ্যার নিকট যাইতাম, কিন্তু আমাদের মনোমত উদ্দেশ্য অনুসরণ করি নাই। এক দিন রাত্রিতে লালমোহন এবং আমি ঢাকাপটীতে সুরবালা নামে এক বেশ্যার নিকট যাইলাম। প্রায় ১৫।১৬ রাত্রি যাতায়াতের পর তাহাকেও হত্যা করিলাম। সেবারে আমি বাবু সাজিলাম এবং লালমোহন আমার কেশিয়ার হইল। হত্যার দিন রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমরা সকলে মিলিয়া

একসঙ্গে মদ্যপান করিলাম, সেই সময় এক জন বাবু মোহিনীনাম্নী তাহার রক্ষিতাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকট আসিল; সুতরাং তাহাদিগকে লইয়াও আমরা রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আরও মদ্যপান করিতে লাগিলাম। প্রায় রাত্রি ২টার সময় মোহিনীকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাবুটি চলিয়া গেল; যখন মোহিনী চলিয়া যায়, সুরবালা আপনার তুগাছি অনন্ত মোহিনীর নিকট দিল। মোহিনী চলিয়া যাইবার পর আমরা ৩ জনে আরও কিছুক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলাম। আমোদ আহ্লাদে কিছুক্ষণ কাটিবার পর লালমোহন সুরবালার গলা টিপিয়া ধরিল, আমি তাহার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া দিলাম, সুরবালা কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া মরিয়া গেল। যখন দেখিলাম, সুরবালা মরিয়া গিয়াছে, আমি তাহার গলায় একখানি কাপড় খুব জোরে বাঁধিয়া দিলাম, পরে সুরবালার আলমারি হইতে তাহার আরও অনেক গহনা লইয়া সরিয়া পড়িলাম। লালমোহনের বাড়ী যাইয়া গহনাগুলি ওজন করাইয়া লালমোহনের নিকটেই রাখিয়া আসিলাম। সুরবালার আলমারি হইতে আমরা যে সব গহনা চুরি করিয়াছিলাম, তাহার সহিত নগদ ২৪৲ টাকা ও ১৬ খানি মোহর ছিল। লালমোহন আমাকে নগদ ১৩৲ টাকা ও ৭ খানি মোহর দিল। দু তিন দিন পরে গহনাগুলি বিক্রীত হইলে, লালমোহন আরও ৪ শত ৫০ টাকা দিল। এই অর্থ পাইবার দুই দিন পরে আমি সরোজিনীকে লইয়া কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পলাইলাম। নবদ্বীপে আমি প্রায় এক মাস ছিলাম, সেই সময় লালমোহনের সহিত আমার চিঠিপত্র চলিত। পরে লালমোহনের কথামত আমি নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং হাড়কাটা লেনে একটি বাসা লইলাম। তাহার পর শচীনন্দনের নিকট হইতে লালমোহন চিঠি পাইল, লালমোহন আমাকে লইয়া শচীনন্দনের

দেশে যাইল ; সেখানে প্রায় ৮।৯ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। সেখানে থাকিবার সময় আমরা আর এক নূতন মতলব স্থির করিলাম যে, দেখিতে হইবে, কলিকাতার বাহিরে আমাদের পূর্ব্ববৎ কোন কার্য্য এরূপভাবে বেশ্যাদের উপর চালাইতে পারা যায় কি না ? শচীনন্দনের নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া লালমোহন এবং আমি নারায়ণগঞ্জে যাইলাম। শচীর জন্য আমরা ৭।৮ দিন অপেক্ষা করিবার পর লালমোহন এবং আমি মুক্তা নামে কোন বেশ্যাকে খুন করিয়া তাহার সমস্ত গহনা আত্মসাৎ করিয়া সকলে মিলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। তখন শীতকাল, ১৩২৪ সাল। লালমোহন তাহার একখানি খাতায় সমস্ত খরচাই লিখিত। ইহার পর যাহাকে খুন করিয়াছিলাম, তাহার নাম কৃষ্ণা। সে বেণেটোলা ও চিৎপুরের মোড়ে থাকিত। সেই খুনের ভিতর আমরা তিন জনেই লিপ্ত ছিলাম। প্রায় এক মাস পূর্ব্বে শচীনন্দন কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং ঐ খুনটি ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে হইয়াছিল। লালমোহন আমাদিগকে সংবাদ দিল যে, কৃষ্ণার মূল্যবান্ অলঙ্কার আছে, কারণ, ঐ স্ত্রীলোকটি লালমোহনের খরিদ্দার ছিল। আমরা তিন জনে মিলিয়া পূর্ব্বের মত সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিলাম। লালমোহন কৃষ্ণার নিকট আমাকে এক জন খুব ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করাইল। আমরা দু'তিন দিন ধরিয়া কৃষ্ণার কালোবরণে যত মোহিত হই বা না হই, তাহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে আমার রক্ষিতা হিসাবে রাখিবার ভাণ করিলাম। যখন কৃষ্ণা দেখিল যে, আমি কৃষ্ণার রূপযৌবনে মুগ্ধ এবং আমি তাহার নিতান্ত অনুরাগী, তখন কৃষ্ণা আমাকে বলিল যে, বরাহনগরে তাহার যে চুড়ি বাঁধা আছে, অন্ততঃ সেগুলি যতক্ষণ না আমি টাকা দিয়া খালাস করিয়া তাহাকে আনিয়া দিতে পারি, ততক্ষণ সে আমার রক্ষিতা হইতে মোটেই রাজি নয়।

লালমোহনের পরামর্শ অনুসারে আমি তাহার চুড়ি খালাস করিয়া দিতে সম্মত হইলাম। পরদিন লালমোহন মনোমোহন সরকার নামে এক ব্যক্তিকে ৫০৲ টাকা দিয়া, কৃষ্ণার চুড়ি খালাস করাইয়া তাহাকে আনাইয়া দিল। যখন মনোমোহন চুড়িগুলি আনিয়া দিল, তখন বেলা সাড়ে ৪টা কি ৫টা হইবে। সেই দিনই বৈকালে আমরা কৃষ্ণার নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণার গায়ে অন্যান্য অলঙ্কারাদির সহিত পূর্ব্বোক্ত চুড়িগুলিও শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণা চুড়িগুলি পাইয়া বড়ই প্রীত; আমরা কৃষ্ণার আনন্দে আনন্দিত হইয়া রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিলাম; সুধু মদ ভাল লাগিল না, তখন মদের সহিত কিছু মিষ্টান্নের অর্ডার হইল। কৃষ্ণা এক ভৃত্যকে ডাকিয়া কিছু খাবার আনিতে বলিল। আমি কৃষ্ণার হুকুম মত ভৃত্যকে লইয়া দোকানে গিয়া দোকানদারকে খুব উত্তম মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যাদি ঠিক ওজন করিয়া দিতে বলিলাম। খাবার আনিয়া কৃষ্ণার হস্তে দিলাম। রাত্রি প্রায় ১টা ১॥০টা পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া মদ্যপানের সহিত ঐ খাদ্যাদি আহার করিলাম; কৃষ্ণাই আমাদিগকে খাদ্যাদি সাজাইয়া দিল, এবং তাহাকে লইয়া একসঙ্গে আমরা খাইতে লাগিলাম। যখন একটু অবসাদ আসিল, তখন আমরা সকলেই শুইয়া পড়িলাম। সেই দিন কৃষ্ণা খুব অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ কৃষ্ণার ভাবগতিক দেখিয়া আমরা সকলেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তার পর সুযোগ বুঝিয়া আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম, লালমোহন তাহার মুখের ভিতর কাপড় দিয়া মুখ চাপিয়া রহিল, এবং শচীনন্দন তাহার পা চাপিয়া ধরিল; কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া কৃষ্ণার জীবন শেষ হইল। আমরা তখন তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া আসিলাম এবং প্রায় রাত্রি সাড়ে ৪টার সময় লালমোহনের দোকানে

যাইলাম। তখনই গহনাগুলি সেখানে ওজন করিয়া, শচীনন্দন এবং আমি দুই জনে তাহার দোকান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরদিন লালমোহন আমাকে প্রায় ১ শত টাকা দিল। কৃষ্ণাকে হত্যা করিয়া আমরা যে ক্ষান্ত ছিলাম, এমন নহে, অন্যান্য বেশ্যার উপরও আমাদের উদ্দেশ্যসাধানের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দুলালী ও আরও কয়েক জনের উপরেও চেষ্টা করিয়াছিলাম। লালমোহন এবং আমি দুইজনে মিলিয়া এক দিন রাত্রিতে চিৎপুর রোডের নগেন্দ্রবালাকেও হত্যা করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলাম। নগেন্দ্রবালা চীৎকার করিলে অন্য লোকজন জমা হইল, তখন আমরা একটা অন্য কারণ দেখাইয়া সেই দিনকার মত তাহাদের নিকট হইতে রেহাই লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম। লালমোহন নগেন্দ্রবালার নেকলেস ছিঁড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু দেখি, সে নগেন্দ্রবালার শয্যার পার্শ্বেই রাখিয়াছিল; পাছে লোকজন তাহাকে ধরিয়া ফেলে, এই ভয়ে। তার পর যাহাকে খুন করা হয়, তাহার নাম ননীবালা, সে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে থাকিত। তখন চৈত্র মাস, সংক্রান্তির কাছাকাছি। লালমোহন, শচীনন্দন এবং আমি তিন জনে মিলিয়াই তাহাকে হত্যা করি। ইহাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা কয়জন মিলিয়া ইহার বাটীতে তিন চার দিন গিয়াছিলাম। যে দিন তাহাকে হত্যা করি, তাহার ঠিক পূর্ব্বদিনে তাহার নিকট আমরা যাইলাম, এবং সেই দিন দিনের বেলায় এক জন গুণ্ডা আমাদের নিকট হইতে একটি মদের বোতল কাড়িয়া লইয়াছিল। ননীবালাকেও রাত্রি ২।৩টার সময় হত্যা করিয়া, সমস্ত গহনা লইয়া আমরা পলাইয়াছিলাম। ননীবালার অঙ্গ হইতে একগাছি চেনহার, সোনার পাতে মোড়া চিরুণী, মাথার সোনার ফুল, এক জোড়া সোনার তাগা, ৮ গাছি চুড়ি, মাথার সোনার টিকলি, দুটি আংটী, দুটি পার্শি ইয়ারিং এবং অন্যান্য বস্ত্র ও জামা তাহার

আলমারি হইতে লইয়া আমরা পলাইলাম। যাইবার সময় কাপড় প্রভৃতি আমি লইলাম ও অলঙ্কারাদি সমস্তই লালমোহন লইল। আমার নিকট একখানি বোম্বাই শাড়ী, তুইটি বডি জামা ও একটি আংটী ছিল, আমি ঐগুলি লইয়া আমার হাড়কাটা লেনের বাসায় আসিলাম! বাকি দ্রব্যাদি লালমোহন তাহার বাসায় লইয়া গেল এবং শচীনন্দন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। পরদিন আমি লালমোহনের নিকট আসিলে লালমোহন আমায় ১ শত টাকা দিয়া আরও দিবে অঙ্গীকার করিল। তার পর শচীনন্দনের নিকট যাইলাম, এবং শচীনন্দনকে লইয়া রামবাগানের সরোজিনীর নিকট যাইলাম। সরোজিনী ননীর হত্যাব্যাপার জানিত। আমি সরোজিনীর হাতে ঋপ্ করিয়া ৫৲ টাকা দিলাম, এবং আরও বলিলাম যে, শচী ও লালমোহন তোমাকে আরও ৫৲ টাকা করিয়া দিবে। পরে যে হত্যাটি করি, সেটি ভাদ্র মাসে, মাণিকতলা ষ্ট্রীটের সুকুমারীকে। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমরা কুমারটুলীর কুসুমকুমারী ও চিৎপুর রোডের হরিমতিকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। লালমোহন এবং আমি দু জনে মিলিয়া আরও তুই এক জনের উপর আমাদের মতলব চালাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আমি এবং লালমোহন নাথের বাগানের শেখপাড়ার চারুবালার নিকট গিয়াছিলাম, তাহাকে খুব মদ্যপান করাইয়া জ্ঞানলোপ করিয়া তাহার অঙ্গ হইতে একজোড়া অনন্ত খুলিয়া লইয়া আসিলাম। একগাছি তাগা লালমোহন লইল; আর একগাছি সে গালাইয়া সোনাটুকু ৭০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া আমাকে টাকাটি দিল। কুমারটুলীতে আমরা আর এক স্থানে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি সেখানে যাইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম, শচীনন্দন এবং লালমোহন তুই জনে মিলিয়া ঘরের

ভিতর যাইয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আমি ইন্‌স্পেক্টার সাহেবকে সমস্ত স্থানই দেখাইয়াছি। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে শচীনন্দন ও লালমোহন কলিকাতা হইতে চলিয়া গেল, কলিকাতার বাহিরে হত্যা করিবে ও তাহাদের আরও সুবিধা হইবে এই আশায়। তাহারা ১০।১২ দিন পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তাহার পর, লালমোহন এবং আমি দুই জনে মিলিয়া কুষ্টিয়ায় যাইলাম, যেখানে সরোজিনী ও তাহার এক জন ভগিনীকে আমরা হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হত্যা করিতে পারি নাই। বিফল মনোরথ হইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর, সুকুমারীকে হত্যা করিবার প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বেই আমরা নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া সুকুমারীকে তাহার প্রেমিক ভোলানাথ দাসের সহিত দেখি। আমরা কিছুদিন নবদ্বীপে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে ভোলানাথ দাস আমাকে এক দিন সুকুমারীর গৃহে লইয়া গেল। পরদিন আমি লালমোহনকে সুকুমারীর নিকট লইয়া আসিলাম। উপর্যুপরি দুই তিন দিন ধরিয়া আমরা সুকুমারীকে দর্শন দিতে লাগিলাম। সুকুমারীর অঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত ছিল; লালমোহন ইহাকে তাহার মনোমত শিকার বলিয়া আমাকে জানাইল, এবং ইহাকে হত্যা করিবে, এইরূপ স্থির করিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে আমি রাজি হই নাই। কিন্তু লালমোহন আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন আমি রাজি হইয়া সুকুমারীকে বলিলাম যে, আমি তাহাকে আমার রক্ষিতা হিসাবে রাখিব। কিছুদিন আমরা আর সুকুমারীর নিকট যাই নাই; ইতিমধ্যে সে তাহার বাসা বদলাইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, সুকুমারী মাণিকতলায় উঠিয়া গিয়াছে।

এ সন্ধান ভোলানাথ দাসই আমাদিগকে আনিয়া দিল। লালমোহন এবং আমি দুই তিন দিন ধরিয়া সুকুমারীর নিকট যাইলাম। দুই তিন দিন ধরিয়া যখন তাহার নিকট যাই, অনাথ গাঙ্গুলী বলিয়া একটি লোক সেই সময় এক দিন আমাদের সহিত তাহার গৃহে গিয়াছিল। যে দিন আমরা সুকুমারীকে হত্যা করি, সে দিন খুব বর্ষা; লালমোহন এবং আমি দুই জনে রাত্রি ৯টার সময় সুকুমারীর গৃহে আসিয়া তাহাকে লইয়া যথেষ্ট মদ্যপান করি। প্রায় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলাম; সুকুমারী ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ ধরিয়া যখন দেখিলাম যে, সে বেশ ঘুমাইয়াছে, তখন লালমোহন তাহার গলা টিপিয়া ধরিল এবং আমি তাহার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া দিলাম। সে বহু চেষ্টা করিয়াও বাঁচিতে পারিল না, শেষে তাহার প্রাণনাশ ঘটিল। তখন আমরা তাহার সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিলাম। পরদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর আমাদের দেশের এক জন কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ বাবুর ঔষধালয়েই আশ্রয় লইলাম। সেইখানে আমার রক্ষিতা সরোজিনী যাইয়া আমায় বলিল যে, লালমোহন ধরা পরিয়াছে। আমি সরোজিনীকে লালমোহনের বাসায় সন্ধান লইতে পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কিছু কিছু সংবাদ দিল। অন্নদা কবিরাজের বাসায় প্রায় দুই মাস ছিলাম। সুকুমারীর হত্যার প্রায় ১০।১২ দিন পরে লালমোহন এক দিন আমায় অন্নদা কবিরাজের বাসায় দেখিয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিল যে, সে জামিনে খালাস আছে। সে আমাকে এ স্থান হইতে পলাইতে বলিয়াছিল। ৫।৬ দিন পরে লালমোহনের সহিত আমার আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন আমি ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে ইন্দ্রমোহন শাহার গদিতে থাকি। তখন লালমোহন আমাকে দেখিয়া বলিল যে, কালীঘাটে একটি খুব ধনী বেশ্যা আছে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমার

সম্মতি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখন লালমোহনের কথায় ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কারণ, লালমোহন তখন জামিনে রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা-বার্ত্তার পর· আমি লালমোহনের সহিত একমত হইলাম। পরদিন লালমোহন অর্থ লইয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে লইয়া কালীঘাটে যাইল; কিন্তু সে দিন সে স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ হইল না, সে বাহিরে গিয়াছিল। প্রায় মাসখানেক পরে আর এক দিন রাত্রিতে লালমোহনের সহিত কালীঘাটে ঐ স্ত্রীলোকটির উদ্দেশ্যে যাইলাম, যাইয়া দেখি যে, স্ত্রীলোকটি ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। আমরা মদ আনিতে বাহির হইলাম, ফিরিয়া আসিয়া আর এক জন বেশ্যাকে ধরিয়া ঐ বেশ্যাটির নিকট পৌঁছিলাম। আমরা দেখিলাম যে, সে দিন আমাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের সঙ্গে সে দিন টাকা না থাকায় একটি আংটী তাহার নিকট জামিনস্বরূপ রাখিয়া আসিলাম। দুই এক দিন পরে আমরা আবার তাহার নিকট যাইয়া প্রথমে আমাদের ঐ আংটী টাকা দিয়া খালাস করিয়া লইলাম। তাহার পর আমরা যামিনীকে আমাদের শিকার বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম। যামিনীর নিকট কিছু দিন যাইতে লাগিলাম, তাহার সঙ্গে মদ্যপানও করিতাম, এইরূপে কিছুদিন যাওয়া আসা চলিল। কিছুদিন পরে অষ্টমী কি নবমী পূজার দিন লালমোহন ও আমি দুই জনে পুনরায় যামিনীর নিকট যাইলাম। সে দিন রাত্রি ১টা ২টা পর্য্যন্ত মদ খাইলাম, যামিনীকেও খাওয়াইলাম, শেষে আমাদের উদ্দেশ্যমত যামিনী ঘুমাইলে তাহাকে হত্যা করিলাম। তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাকৃড়ি, অনন্ত, তাগা, হার প্রভৃতি সমস্ত লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম; আসিয়া দেখি, সদর-দরজা বন্ধ তখন মাটীর দেওয়াল দিয়া উঠিয়া রাস্তায় লম্ফ দিয়া নামিয়া পলাইলাম।·

আমি তাহার চিরুণী, ফুল লইয়াছিলাম; সেগুলি ইন্দ্রমোহন শাহাকে বিক্রয় করিয়াছি। সেইগুলি ত দেখিতেছি এই স্থানে হুজুরের টেবিলের উপর, এইগুলি পুলিস ইন্দ্রমোহন বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিছুদিন পরে লালমোহন আমাকে ৪১৲ টাকা দিল। প্রায় এক মাস দেড় মাস পরে এক দিন লালমোহনকে লইয়া রামবাগানের সুবাসিনীর নিকট যাইলাম। সুকুমারীকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে দুই এক দিন তাহার নিকট গিয়াছিলাম, সেই জন্যই তাহাকে চিনিতাম; সুবাসিনীকে সেই রাত্রেই হত্যা করিলাম। লালমোহন পলাইবার জন্য তাহার সহিত এক-গাছি দড়ি ও কিছু বড় পেরেক লইয়াছিল, কারণ সদর-দরজা তালা বন্ধ থাকিত। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আমরা সুবাসিনীকে হত্যা করিলাম। আমরা তাহার রুলি, তোড়া, বিছা, ইয়ারিং, পার্শি, মাকড়ি এবং অন্যান্য দ্রব্য লইয়া ঐ পেরেক, রজ্জু ও একখানি কাপড়ের সাহায্যে দরজা বন্ধ থাকা সত্বেও পালাইয়া আসিলাম। আমরা ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে চলিয়া আসিলাম, আসিয়া ইন্দ্রমোহন শাহার নিকট ঐগুলি বিক্রয় করিতে দিলাম। ইন্দ্রমোহন পায়ের তোড়া জোড়াটি ৪৪৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থ আমাকে দিল। এ কথা আমি পুলিসকে বলিয়াছি। সেই তোড়া দুটি এই তোড়ারই মত, যাহা কোর্টে দেখিতেছি। তবে সেগুলি এত উজ্জ্বল নয়। এই হারটি দেখিতেছি, সেই বিছাটি, এই ত সেই রুলি জোড়া; ইন্দ্রমোহন আমাকে তখন বলিয়াছিল যে, তাহার বাবু বিপিন-বিহারী শাহা আমার নিকট টাকা পাইবে বলিয়া সেগুলি লইয়া রাখিয়া দিয়াছে, তাহাতে আমি লালমোহনকে সমস্ত বলিলাম; আমি লাল-মোহনকে এ কথা বলিলে, লালমোহন ইন্দ্রমোহনকে ভয় দেখাইল যে, সে তাহাকে ঠকাইবার জন্য তাহার উপর নালিশ করিবে। যাহা হউক, গহনাগুলি আর ফেরত পাওয়া গেল না। আমার সাক্ষাতে বিপিনবিহারী

বাবু পুলিসের নিকট সমস্তই হাজির করিল। শেষে আমরা যে সুবাসিনীকে হত্যা করিয়াছিলাম, এইখানি তাহার ফটো। সুবাসিনীকে হত্যা করিবার প্রায় এক মাস দেড় মাস পরে এক দিন মতি শীল ষ্ট্রীটের উপর দিয়া যাইবার সময় ইন্‌স্পেক্টার মহেন্দ্র বাবু আমায় গ্রেপ্তার করিলেন। গ্রেপ্তার করিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাহাকে অন্য নামে পরিচয় দিলাম। আমাকে ধরিয়া লালবাজার থানায় লইয়া আসিলেন। তাহার পর এক দিন আমায় ইন্দ্রমোহন প্রভৃতি আরও ১০।১৫ জন লোকের ভিতর মিশাইয়া দিলে আমার এক ভাই এবং অন্যান্য সাক্ষী আমাকে চিনিয়া লইল। তখন ইন্‌স্পেক্টার বাবু আমাকে ডেপুটী কমিশনারের নিকট লইয়া আসিলেন, তাঁহার নিকটও আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। কালীঘাটে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমাকে লইয়া যাওয়া হইলে তাঁহার নিকটেও আমি যাহা করিয়াছিলাম, সমস্তই প্রকাশ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার বৃত্তান্ত শুনিয়া সমস্তই আমার কথামত লিখিয়া লইলেন। লিখিয়া আমায় পড়িয়া শুনাইলেন, আমি উহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়াছি। এই বৃত্তান্ত সমস্ত যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলি, তখন এই একটি ভুল করিয়াছি, বলিয়াছি যে, সুরবালাকে কৃষ্ণার পর হত্যা করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, সমস্তই স্বইচ্ছায় এবং আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সতর্ক করিয়া দিবার পর। সুকুমারীর অলঙ্কারের মধ্যে যে দুটি আংটী লইয়াছিলাম, সে দুটি ইন্দ্রমোহনের নিকট বাঁধা দিয়াছি, শেষের দুটি ১০৲ টাকায় তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছি। ঐ আংটী দুটির মধ্যে একটির ভিতর কৃষ্ণলাল মণ্ডল নাম লেখা ছিল এবং আর একটি পাথর-বসানো দুমুখো সাপ পেটার্ণের। ননীর আংটীটি হাড়কাটা লেনের প্রমদার নিকট বিক্রয় করিয়াছি।

সেটিও ত দেখিতেছি এইটি, ইহাতে নরেনের নাম লেখা আছে। আমরা যে সকল স্থানে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছি, সমস্ত স্থানই ইন্‌স্পেক্টর মহেন্দ্রবাবুকে দেখাইয়াছি, কেবলমাত্র স্কুমারীর বাটীটিই দেখানো হয় নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, সমস্তই খাঁটি সত্য। গত কল্যের এজাহারে আমি একটি ভুল করিয়াছি, মানদাকে হত্যা করিবার পর এবং সুরবালাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমি এবং লালমোহন নারায়ণগঞ্জে যাই বাকি সমস্তটাই সত্য।

———

সমাপ্ত